কে তুমি?

বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

দুষ্টের শাসনে যবে দীনের দুর্গতি,
কে তুমি "শ্রীকৃষ্ণ" নাম করিয়া ধারণ,
দীনে রক্ষি কুরুক্ষেত্রে হইয়া সারথী,
দুষ্টে নাশি ধর্ম্মরাজ্য করিলা স্থাপন?
ভক্তিহীন বঙ্গ যবে বিদ্যার গৌরবে,
কে তুমি "চৈতন্য" রূপে হইয়া উদয়
পরাজিয়া পণ্ডিতেরে বিদ্যার প্রভাবে,
হরিনামে প্রচারিলা ভক্তির বিজয়?
ধনলোভী নর এবে ভোগপরায়ণ,
স্ব স্ববুদ্ধি, তর্করত—নাহি ধর্ম্মলেশ,—
"রামকৃষ্ণ" নামে আসি কে তুমি ব্রাহ্মণ,
"কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ"—দিলা উপদেশ?
কে তুমি হইয়া মূর্খ, দানিলা যে নীতি—
সুপ্ত বিশ্ব জাগরিত শুনি সে ভারতী!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ভক্তেরকথোপকথন।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। ইংরাজি ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতায় সেই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। গলার Cancer চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। অধিকাংশ ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন

মাষ্টারকে ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬॥ টার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ডাক্তারকে বল্‌বে, শেষরাত্রে একমুখ জল হয়, কাশি আছে" ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসা করবে, নাইবো কি না?"

মাষ্টার ৭ টার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তার সরকারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার (বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি)। মহাশয়, রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে—ঘুম নেই। এখনও পরমহংস চল্‌ছে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারের একজন বন্ধু ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, শুন্‌তে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখ্‌ছেন, আপনার কি বোধ হয়?

ডাক্তার। As man, I have the greatest regard for him.

মাষ্টার। (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি) ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ করে অনেক দেখ্‌ছেন।

ডাক্তার। অনুগ্রহ!—

মাষ্টার। আমাদের উপর অনুগ্রহ বল্‌ছি; পরমহংসদেবের উপর বল্‌ছি না।

ডাক্তার। তা নয় হে। তোমরা জানো না, আমার actual loss হচ্চে, রোজ রোজ ২।৩ টা call যাওয়াই হচ্চে না। তারপর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর fee নিই না—আপনি গিয়ে fee নেবে কেমন কোরে?

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্ত্তীর কথা হইল। শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন, ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করেছেন।'

মাষ্টার। (ডাক্তারের প্রতি) ম—চক্রবর্ত্তী আপনার এখানে আগে আসিতেন। আপনি বাড়ীতে ডাক্তারী Science এর lecture দিতেন। তিনি শুন্‌তে আসতেন।

ডাক্তার। বটে? লোকটার কি তমো! দেখ্‌লে আমি নমস্কার কর্‌লুম as God's Lower Third? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) সব গুণই আছে; তুমি ও কথাটা mark করেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন'?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে কর্‌লে নিজে ব্যারাম আরাম কর্ত্তে পারেন।

ডাক্তার। ওঃ! তাকি হয় যে, আপনি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, ও cancerএর ভিতর কি আছে—আমরাই আরাম করিতে পারি না—উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম করে আরাম করবেন!

(বন্ধুদের প্রতি) দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা তেমনি সকলে devoteeর মত সেবা কর্‌ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সরলতা ও ঈশ্বরলাভ।)

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা ৩টার সময় আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হয়েছে?

মাষ্টার। আপনি 'হতভাগা ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন', একথা কাল শুনে গিছ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে বলেছিল?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পর?

মাষ্টার। তা ম-চক্রবর্ত্তীকে বলে,'তমোগুণী ঈশ্বর' (God's Lower Third)। এখন ডাক্তার বল্‌ছে, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে। (পরমহংসদেবের হাস্য)।

মাষ্টার। আবার আমায় বল্লে, রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে;

আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা ৮টার সময় বলে, 'এখনো পরমহংস চল্‌ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বল্‌বার যো নাই আমাকে চিন্তা কর, তা আপনিই কর্‌ছে।

মাষ্টার। আবার বলে—'As man I have the greatest regard for him' এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব, আমার ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হলো?

মাষ্টার। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে?' ডাক্তার বল্লে, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু, আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আরো বল্লে,—তোমরা জানো না যে, আমার কত টাকা লোক্‌সান রোজ হচ্চে, দুই তিন জায়গায় রোজ যেতে ভুল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(বিজয়াদিভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দ।)

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন, আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণ ক'রে সবে এসে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এ সময়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন, নরেন্দ্র, ম—চক্রবর্ত্তী, নবগোপাল, ভুপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়, অনেক দেশ তীর্থ দেখে এলেন, এখন কি দেখ্‌লেন বলুন।

বিজয়। কি বল্‌বো! দেখ্‌ছি, যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্য্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখ্‌ছি।

ম চক্রবর্ত্তী। ঠিক বলেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্, ইনিই বসান্।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রাদির প্রতি) দেখ, বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে!

লক্ষণ সব বদ্‌লে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিন্‌তে পারি। বল্‌তে পারি, পরমহংস কি না।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয়। হাঁ, বোধ হয় গিয়াছে।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখ্‌তে এলেম। আবার ঢাকা থেকে —

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়। ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এখানে ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেদার * বল্লে, অন্য জায়গায় খেতে পাই নাই—এখানে এসে পেটভরা পেলুম।

ম-চক্রবর্ত্তী। পেটভরা কি, উপ্‌চে পড়্‌ছে!

বিজয়। (হাত জোড় করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বুঝেছি আপনি কে, আর বল্‌তে হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয়। বুঝেছি।

এই বলিয়া বিজয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য, দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতে লাগিলেন। যাঁহার যেমন ভাব!

শ্রীযুক্ত ম-চক্রবর্ত্তী সাশ্রুনয়নে গাইলেন——

দেখ দেখ প্রেমমূর্ত্তি—

ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।"

---

* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়িলেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত। একজন পরম ভক্ত।

নবগোপাল কাঁদিতে লাগিলেন।

আর একটি ভক্ত গাইলেন—

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি, মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম ;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটিচন্দ্রে কোটি সূর্য্য তারা ;
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর, নর, ঋভু, প্রণমে তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়,
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়।

সেই ভক্তটী আবার গাইলেন,—

ঝিঁঝিঁট—কীর্ত্তন।

(থমকা) চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দলহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ;
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।

(হরি হরি বলে)

মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল।)
(এখন) আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া,
বলরে মন হরি হরি।

(ঝাঁপতাল)

টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি
দূর ভেল জাতি কুলমান;
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান,
(আমি কেনই বা এলাম রে প্রেমসিন্ধুতটে)
ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর,
নাহি যাত আপনা পরান;
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
এয়সাহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই। ভয় নাই)॥

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) কি একটা হয় আবেশে। এখন লজ্জা হচ্চে। যেন ভূতে পায়। আমি আর আমি থাকি না।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও আশ্চর্য্য গণিত]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণ্‌তে গেলে ১। ৭। এই রকম গণা হয়।

নরেন্দ্র। *সব এক কি না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এক দুয়ের পার।

ম-চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হিসাব পচে যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়

* এক দুয়ের—The Absolute as distinguished from the Relative.

না। তিনি শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের পার। হাতে একখান বই যদি দেখি, জ্ঞানী হলেও তাকে রাজর্ষি বলে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে, সে চিঠি পড়ে ৵৫ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে। আর চিঠির কি দরকার?

[অবতারের প্রয়োজন]

বিজয়। সন্দেশ পাঠান হয়েছে, বোঝা গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো! গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে, শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হোলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।

ম-চক্রবর্ত্তী। দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য)।

বিজয়। কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক উদিক ঢুঁ মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার। কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। কেবল তোমার জন্য ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরো কত কি ভাবছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধছে।

ডাক্তার। সকালে সব খবর পেয়েছি।

* * * * *

শ্রীম চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন

শ্রীকণ্টপে 'laughing man' নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন তা হলে, ওটা 'inquire' করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারী কর্ম্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ডাক্তারী কর্ম্ম খুব উঁচু কর্ম্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না নিয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ। কাযটীও মহৎ। কিন্তু টাকা নিয়ে ওসব কায করতে করতে মানুষ নির্দ্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা বাহ্যের রং এইসব দেখা—নীচের কায।

ডাক্তার। তা যদি শুধু করে, তা হলে কায খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ডাক্তারী কাযে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা থাকে, তা হলে খুব ভাল। তা যে কর্ম্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে। অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ। হয় ত কোলাকুলি করে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

ডাক্তার। আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ান সাধুর কায। সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার। আজ গান হবে না

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। একটু গান কর্ না।

নরেন্দ্র গাইতে লাগিলেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল।

> সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে,
> বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, (ও) প্রাণরমণ হে।
> এক তব নাম-ধন অমৃত-ভবন হে,

অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমেষে বিনাশে ;
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে ,
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন,—

আমায় দে মা পাগল করে, আর কায নাই জ্ঞান বিচারে।
(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে)
(ওমা) তোমার এ প্রেমের সুরা, পানে করো মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য ! সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বল্‌ছেন, 'আমায় দে মা পাগল করে আর কায নাই জ্ঞান বিচারে'। বিজয় সর্ব্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই। ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার Science পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির, নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছেন—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত ৮টা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। এই যা ভাবটাব দেখ্‌লে, তোমার Scienceএ কি বলে? তোমার কি সব ঢং বোধ হয়?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যেখানে এত লোকের হচ্ছে, সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না।

(নরেন্দ্রের প্রতি)। যখন তুমি গাচ্ছিলে, 'দে মা পাগল করে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাক্‌তে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি! তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপ্‌লুম, এই ভাব্‌লুম যে, display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) তুমি যে অটল, অচল, সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না —যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হলেই তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু সায়রের দীঘিতে হাতী নাম্‌লে তোলপাড় হয় না, কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বল্লেন, "সখি, তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদ্‌ছিস, কিন্তু দেখ্, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে একবিন্দুও জল নাই।" তখন বৃন্দা বল্লেন, "সখি, তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে, চক্ষে জল উঠছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তো কথায় পার্‌বার যো নাই। (সকলের হাস্য)।

* * * * *

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়, সেই কথা হইতেছিল।

ডাক্তার। তুমি ভাবে পড়েছিলে, আর একজন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল, সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারের কাছে শুনছ। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজো* বাবুর কাছে প্রায় আসতো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটীতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আমি ঢং করে ঐ রকম করি, বাবুর প্রিয়পাত্র হবো ব'লে। সে সেই অন্ধকারে এসে বুটের গোঁজা

---

* 'সেজো বাবু'—রাসমণির জামাতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করিতেন ও শিষ্যের ন্যায় সেবা করিতেন।

দিতে লাগ্‌লো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বল্লে, সেজো বাবুকে বলে দেওয়া যাক্। আমি বারণ কর্‌লুম।

ডাক্তার। এও ঈশ্বরের খেলা, ওতেও লোক শিখ্‌বে।' ক্রোধ কি রকম করে বশীভূত করতে হয়, ক্ষমা কাকে বলে, লোকে শিখ্‌বে।

* * * * *

ইতিমধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

বিজয়। কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।

নরেন্দ্র। Guardian angel এর মত।

বিজয়। ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি। গা ছুঁয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র। আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখিছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি করে বল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

অরণ্যে রোদন।

আমাদের এ জগতে, যাকে হিসাবি কায বলে—তুদিকরাখা কায—সেটা হওয়া বড় শক্ত। যখন যা বাড়তে আরম্ভ করে, বেড়েই চলে। সেই বাড়েতই যে মরণ হবে, তা মনে থাকে না।

মানুষের সম্বন্ধেই যে এ কথা সত্য, প্রকৃতির অন্য বিভাগে সত্য নয়, তা নয়। পেলিয়ণ্টলজিবিৎ (Palæontology) পণ্ডিতেরা ভূগর্ভে এক প্রকার বাঘের কঙ্কাল পান, যাদের একটি দাঁত তলবারের মত (Saber-toothed tiger)। দাঁতটি বেড়ে বেড়ে তলবারাকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বাড়ের অবস্থায় দাঁত খুব কায দিয়েছিল। সে দাঁতের কাছে কোন জন্তু পেরে উঠ্‌তেন না, বা পালাতে পার্‌তেন না। ক্রমে ব্যবহার বেড়ে যেতে দাঁতও বাড়তে লাগ্‌লেন, অবশেষে সেই সারা জাতটা এক বিষম দাঁত নিয়ে মারা পড়্‌ল। দাঁত এমন বাড় বাড়্‌লে যে, চোয়ালের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। কাযেই সারা জাতটা ধ্বংস হল। এখন সাক্ষী আছেন মাত্র কঙ্কাল।

যে পদার্থটা একবার একটা জাতি বা সমাজের উন্নতির কারণ হয়, সেই

পদার্থই আবার সেই জাতি বা সমাজের সর্ব্বনাশ করে। জগতের সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাস এই সত্যের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। যে সকল জাতি বল বীর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে যুদ্ধে এমন পারদর্শিতা লাভ কর্‌লেন যে, সসাগরা পৃথিবী জয় করা তাঁদের অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল, সেই বলবীর্য্য, সেই রণমদ, সময়ে সেই জাতিগুলিকে হীনবীর্য্য, কাপুরুষ, জন্মভূমিরক্ষণে অক্ষম ভেড়ার দলে পরিণত করে। বর্ত্তমান গ্রীস, রোম, স্পেন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যত বীরগুলি, মহাপ্রাণ মনীষীগুলি, যুদ্ধে শরীর পাত করেন; ঘরে থাকে হতভাগাগুলো। এই প্রকার যত যুদ্ধ হয়, তত ভালর সংখ্যা কমে যায়, মন্দগুলোর উপর গৃহস্থালির ভার, বংশরক্ষা প্রভৃতি, পড়ে, কাযেই জাতিটা কেবল নিরেশ, বাতিল, ছাঁটপড়া লোকের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। এত রক্তে উপার্জ্জিত অধিকারগুলো বজায় রাখ্‌তে পারে না; চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে আপনাদের জন্মভূমিটুকুও খোয়াতে বসে।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই সত্যের আর একটি সাক্ষী। পোপের কথা অটুট, অভ্রান্ত, আমাদের দেশের 'বেদবাক্যের' সমান। পোপ এক কলম লিখে দিলেই বা একটা মুখের কথা খসালেই, লোকের পাপ, দুষ্কৃতি, সব মোচন হয়ে যায়। হুহু করে সম্প্রদায় বেড়ে উঠ্‌লো। সারা য়ুরোপ ছেয়ে ফেল্‌লে। কিন্তু তার পর? যার দ্বারা উৎপত্তি, সেই কর্‌লে নিবৃত্তি। বিপরীত দিকে স্রোত ফির্‌ল। পোপের পাপ দূর করবার শক্তি নাই, ও মিছে কথা, এতদিন পৃথিবী ঠকেছে। এখন রোমান ক্যাথলিকের বিপক্ষ কত সম্প্রদায় উঠেছে, পোপের ইহপরলোকব্যাপিনী শক্তি কত খাট হয়ে গেছে।

এই দুনিয়ার ব্যাপার। যা হতে জীবন, তারি হাতে মরণ। তবে এর ভিতর একটা সামঞ্জস্য করা চলে। সময়ে সাবধান হলে, বাড়ের গতিটা ফিরিয়ে দিলে, শ্রীভ্রষ্ট হতে হয় না। তার প্রমাণ বর্ত্তমান জাপান।

এসিয়া খণ্ডের অন্য প্রাচীন জাতি গুলির মত জাপানও কঠিন সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ ছিল। সামাজিক বন্ধন উচ্চ সভ্যতার লক্ষণ ও সোপান। কিন্তু তা হলে হবে কি? ঐ বন্ধনই আবার উদ্বন্ধন প্রসব করে। উচ্চ সভ্যতার প্রারম্ভে আমাদের জাতির সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সামাজিক উৎকর্ষ লাভে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, কিসে প্রত্যেক ব্যক্তিটি সমাজশরীরে ঠিক ঠিক

অবসরের কায করতে পারবে—কিসে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে না, এই চিন্তাতেই সব বড় মাথা গুলো লেগেছিল। ফল হল, দাঁতন করা থেকে সন্তানোৎপাদন পর্য্যন্ত যাবতীয় কায বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার মত মানুষের জীবন নিয়মিত হল। যত দিন জাতীয় জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ ভাবে বিধিনিষেধের বশে আসে নি, তত দিন বেশ চললো। যেই বশীভূত হয়ে গেল, জাতটা হয়ে দাঁড়াল ঘড়ি, মনুষ্যত্ব চলে গেল। বিধি নিষেধ গুলির ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য ও মানে ভুলে গেল, তারা হয়ে দাঁড়াল চোবের বেড়ী। জাপান ব্যাপারটা সময়ে বুঝতে পাবলে, সামাজিক বন্ধন শিথিল করে, ঐ শক্তিটে অন্য পথে চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল আমরা এখনো বুঝতে পারছি না।

আজকাল য়ুরোপের একটি প্রধান ভাবনা কিসে অধিক লোকে বিবাহ করে, আর যৌবন থাকতে থাকতে করে। য়ুরোপে বিবাহটা দিন দিন এত দামি বড়মানষি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, অধিকাংশ লোকেই দুর্ম্মূল্য পদার্থ বলে বিবাহের কাছে ঘেঁসতে চায় না। যখন টাকা কড়ি জমে, (জমতে জমতে যৌবন ফুরিয়ে যায়) তখন বিবাহ করে। আমাদের দেশে ঠিক উল্টা ভাবনা। কিসে লোক একটু বেশী বয়সে বিবাহ করে, এবং কিছু অন্ন সংস্থানের পর। য়ুরোপে প্রতীকারের নানা চেষ্টা হচ্ছে। ফ্রান্স প্রভৃতিতে গভর্ণমেণ্টও উদ্যোগী হয়েছেন। আমাদের দেশে যে কিছুই হচ্ছে না, তা বলতে পারি না। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে হচ্ছে যে, সে না হবারই মধ্যে। আমাদের মনে হয়, তার কারণ বিষয়টা ঠিক ঠিক না বুঝা। কোথায় রোগ ঠিক না ধরতে পারা।

বাড়ের মুখে পাকে না। বাড শেষ হলেই, পুরুষ্টু হলেই, পাকে। যত দিন কোন একটা জিনিষ পূর্ণতা পায় না, অর্থাৎ যতদিন তার অবয়বগুলি এখনও বাড়ছে, সম্পূর্ণতা পায়নি, ততদিন সে জিনিষটির পরিপক্কতা হয় নি। পরিপক্কতা হলে তবে সে জিনিষটীর ঠিক ঠিক জনন শক্তি হয়, অর্থাৎ তার দ্বারা উৎপাদিত জীব, সেই জাতিসুলভ অবয়ব, গুণ প্রভৃতির পূর্ণতা লাভ করতে পারে। নতুবা নয়। চারা গাছে ফল ধরলে ফলগুলি ভেঙ্গে দিতে হয়। তা না হলে গাছও খারাপ হয়ে যায়, আর ফল ত ভাল হয়ই না। ছেলেদের দাঁত বেরুলেই কি বুঝতে হবে যে, তারা যা তা খাবার উপযুক্ত হল? না দাঁত গুলি শক্ত হলে তবে শক্ত জিনিষ খেতে দেওয়া উচিত?

কিন্তু কি পোড়া কপাল, এই সামান্য কথাটা আমাদের দেশে লোকে এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌লে না। মেয়েদের ঋতু হলেই, আমাদের পণ্ডিতেরা বুঝ্‌লেন, তাদের গর্ভধারণসামর্থ্য হয়েছে, অমনি গর্ভাধান কর্‌তে হবে, আর দেরী সয় না। প্রসবক্রিয়া যে যন্ত্রের সাহায্যে হয়, তাকে পেলভিস্ (pelvis) বলে, এবং তার মধ্যেই গর্ভ থাকে। সেই যন্ত্রটি যখন পূর্ণতা লাভের পথে প্রথম পা দেয়, তখন প্রথম ঋতু হয়। এ দেশে অন্ততঃ ১৯.২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এ যন্ত্রটি পূর্ণাবয়ব হয় না। তা ছাড়া ১৯।২০ বৎসর বয়স না হলে সন্তান-পোষক অবয়ব গুলিও (mammary glands) পূর্ণতা পায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ১৪ ১৫ বৎসর বয়স থেকেই মেয়েরা মা হতে সুরু করে। কুড়িতে ত বুড়ি হয়ে যায়! সুতরাং আমরা দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, অধ্যবসায়হীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের অনন্যাধার হব, তার আর আশ্চর্য্য কি? চারা গাছের ফল, কচি কাঠের তক্তা, কোথায় কাযের হয়ে থাকে? কাযেই আমরা যা কর্‌তে যাই না কেন, অলক্ষ্মী তার আগে আগে! এদিকে বিশমোল্লায় গলদ যে! অপুরুষ্ট, ভাঙ্গা, পৌনে মানুষে কোন কায কর্‌তে পারে কি?

যাঁরা আপনাদের ও দেশের হিত কর্‌তে চান, তাঁদের এ রোগের প্রতীকার ছাড়া প্রথম কর্ত্তব্য আর কিছু আছে কি?

আরণ্যক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রম।

(কনখল।)

গত ১৫ই অগ্রহায়ণের উদ্বোধনে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই আশ্রমের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাববশতঃ অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত—কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আলমোড়া, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত প্রবুদ্ধভারতে এবং বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে তাহা অন্বেষণ করিবেন।

আলোচ্য তিন মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৮ জন সাধু ও গৃহস্থ রোগী চিকিৎ-

সিত হন। তন্মধ্যে—অধিকাংশ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অল্পসংখ্যক রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান।

এই তিন মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের Judicial Serviceএর একজন মেম্বরের নিকট হইতে ৬৮৸০ মণ আটা, ১।০ মণ চাউল, ২।০ মণ ডাল, /।০ সের লবণ, /২ সের সাগু, /১ সের এরারুট, ১ টিন বার্লি এবং কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। মিরাটের P. C. Ghosh & Co. এবং কানপুরস্থ ডাক্তার হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি এলোপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। দেবাচনস্থ পণ্ডিত ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। মাদ্রাজের ডাক্তার M. B. N. পূর্ব্বে ১০০টী ম্যালেরিয়া জ্বরের বটিকা পড়তা দরে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিনামূল্যে আর ১০০টী বটিকা দিয়াছেন। উদ্বোধনের গ্রাহক পানিহাটীর জমীদার বাবু ৺বিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রমের সাহায্যার্থে ৫৲ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি ঔষধ ব্যতীত আর সবই খরচ হইয়া গিয়াছে। আশ্রম এবং আমরা আর অন্য সর্ব্বসাধারণ সকলেই এই সকল মহানুভবগণের সহৃদয়-ভাব জন্য অতিশয় কৃতজ্ঞ। আশা করা যায়, অন্যান্য মহাত্মা—ইঁহাদের পথানুসরণ করিয়া সাধু ও দরিদ্র দুঃখ নিবারণে সহায়তা করিয়া ভগবানের কৃপাভাজন হইবেন ও দেশের যথার্থ হিতসাধন করিবেন।

জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে হৃষীকেশ নামক সাধুদের তপোভূমে এইরূপ আর একটী আশ্রম খোলা হইয়াছে। এই স্থান হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে শীতকালে ভারতের নানাস্থান হইতে সাধুগণ সমবেত হইয়া কুটীর বাঁধিয়া—৮ মাস সাধন ভজন করেন। ইঁহাদের মাধুকরী ভিক্ষার জন্য এখানে কয়েকটী অন্নসত্র আছে, কিন্তু পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারের কোন উপায় নাই। আশ্রমের তহবিলে অতি অল্পই অর্থ আছে। অতএব আশা করা যায়, এই মহৎকার্য্যের জন্য ভারতের আপামর সাধারণ সকলেই যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। এমন কি, এই সৎকার্য্যের জন্য এক পয়সা দান পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা,—

সম্পাদক, উদ্বোধন।

বাগবাজার, কলিকাতা।

আমরা জানি, বিচারের বিশেষ মূল্য কিছু নাই, হৃদয়ই বিশেষ প্রয়োজন। হৃদয়ের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নহে। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মত রাস্তা সাফ করিয়া দেয় মাত্র--গৌণ ভাবে উপকারক। বুদ্ধি চৌকীদারের ন্যায়—কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য চৌকীদারের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়--অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্য্যও তৎটুকু। যখন এইরূপ বিচারাত্মক পুস্তক তোমরা পাঠ কর, তখন একবার উহা আয়ত্ত হইলে তোমরা ত চিন্তা করিয়া থাক—ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচারশক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই ইহার হাত পা ও নাই। হৃদয়—ভাবই বাস্তবিক কার্য্য করে, উহা বিদ্যুৎ অথবা তদপেক্ষা দ্রুতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিক দ্রুতগমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই, তোমার হৃদয় আছে কি? যদি তাহা থাকে, তবে তুমি তাহা দিয়াই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার এতটুকু ভাব আছে, তাহাই প্রবল হইবে, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উন্নত হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সমুদয় অনুভব করিতে পারে। বুদ্ধি তাহা করিতে পারে না। 'বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।'

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস আ কেম্পিসের ঈশা অনুসরণ পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি ইহার উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই ইহার উপর ঝোঁক দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক। বিচার না করিলে আমরা নানা বিষম ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি উহা নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারভিত্তিতে আর কিছু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটী গৌণ সাহায্যমাত্র, কোন কার্য্যকর নহে—প্রকৃত সাহায্য হয়—ভাবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি তুমি তাহা কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি একজন মহা বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধির ঢিবি হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ

শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকত কথা মাত্র বলিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। ভাবই জীবন, ভাবই বল, ভাবই তেজ—ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বর প্রাপ্ত হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন ভাব তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহা তোমাদের স্মরণ থাকা আবশ্যক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটী বিশেষ কাযের শিক্ষা, কারণ, বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলেই মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতেই হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্য্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন শাস্ত্র সত্য বলিতেছে, তাহা কি করিয়া জানিতে পার? তুমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাক বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, তুমি আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি। তাহাতেই তুমি আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের ঐশ্বরিক আত্মা, তাঁহাদের ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ। যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বরও নাই, কখনই হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই আদর্শই অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর তুমি স্বরূপতঃ তাহাই আছ। কেবল উহা জ্ঞাত হও। আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে, কখন ভাবিও না। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই এক মাত্র পাপ যে, আমি দুর্ব্বল বা অপরে দুর্ব্বল।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

২য় প্রস্তাব।

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটী গল্প পাঠ করিব—এক বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। অবশ্য গল্পটী প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটী সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটী অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমি কি গোত্র, তাহা বলুন।'

তাহার মাতা বিবাহিতা রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা রমণীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা ত দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, 'আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, সেই অবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, আমি সুতরাং তোমার পিতার নাম এবং তুমি কি গোত্র, তাহা জানি না, কিন্তু আমার নাম জবালা।' বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিল—সেখানে তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইল—সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পিতার নাম কি এবং তুমি কি গোত্র?' বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরলাভে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করিলাম—আমি তোমাকে শিষ্য করিব।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম সত্যকাম।

এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গো প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, 'এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে গমন কর—যখন সর্ব্বশুদ্ধ সহস্র গো হইবে, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইবে।' সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গোদলের মধ্যে একটী প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, 'আমরা এক্ষণে এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।' সত্যকাম বলিল, 'বলুন প্রভু।' বৃষ বলিল,

'উত্তর দিক্ ব্রহ্মের এক অংশ, পূর্ব্বদিক্ দক্ষিণ দিক্ পশ্চিম দিক্ও তাঁহার এক এক অংশ। চারি দিক্ ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরো কিছু শিক্ষা দিবেন।' তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতিমারূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নি চয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে অগ্নি হইতে একটী বাণী শুনিতে পাইল—'সত্যকাম!' সত্যকাম বলিল, 'প্রভু, আজ্ঞা করুন'। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এইরূপ একটী গল্প আছে—সামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন। অগ্নি বলিলেন, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটী হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।' একটী হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম, এই অগ্নি, যাহার তুমি উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুতও এক অংশ। মদ্গু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।' একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।' তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল, গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' বালক গুরুকে ব্রহ্মসম্বন্ধে আরো উপদেশ দিবার জন্য কহিল। তিনি বলিলেন, 'তুমি ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বেই জানিয়াছ।'

এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া—বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল আর সকলে কি শিখাইল—এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতেই এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা আরো অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উত্থিত। শিষ্য বরাবরই সত্যসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যাহা ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা বহির্দ্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে—কর্ম্মজীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ধর্ম্ম হইতে

কার্য্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সর্ব্বদা অন্বেষিত হইতেছে; আর এই সকল গল্পপাঠে আমরা ইহা দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাঁহাদের দৈনিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের যে সকল জিনিষের সঙ্গে সর্ব্বদা সংস্পর্শে আসিতে হইত, তাহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন! অগ্নি—যাহাতে তাঁহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাঁহারা ব্রহ্মের একাংশরূপে জ্ঞাত হইতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী উপাখ্যানটী সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয়। ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম কার্য্যবশতঃ কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটী একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িল। যখন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস তুমি কিছু খাইতেছ না কেন? তখন বালক বলিলেন, আমার মন বড় অসুস্থ, তজ্জন্য কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; এমন সময়ে তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উঠিল, 'প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হও।' তখন তিনি বলিলেন, 'প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ ও সুখস্বরূপ, তাহা আমি জানি না।' তখন অগ্নি আরো বলিতে লাগিলেন। 'এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য্য তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, যিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন ও সুখী হন। যিনি দিক্ সকলে বাস করেন, আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।' এখানেও আমরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারের কথা পাইতেছি। যাহা তাঁহারা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেছিলেন, যে সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদিগেরই একটী উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে নাশ করিয়া ফেলে না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে। উহা ব্যক্তিকে বিনাশ করে না, উহাকে ব্যাখ্যা করে—উহা আমিত্বকে বিনাশ করে না, কিন্তু প্রকৃত আমিত্ব কি, তাহা বুঝাইয়া দেয়। উহা এরূপ বলে না যে, জগৎ বৃথা, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু বলে যে,

জগৎ কি, তাহা বুঝ, যাহাতে উহা তোমাকে আঘাত করিতে না পারে। সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে বলে নাই যে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল কিন্তু, ইহাই বলিয়াছিল যে, যে চৈতন্য সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরও রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে সমস্তই আর একরূপ ধারণ করিল। যে অগ্নি পূর্ব্বে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা এক নূতনরূপ ধারণ করিল ও প্রকৃত পক্ষে ভগবান হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী আর একরূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর একরূপ ধারণ করিল, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ সকলই আর একরূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তখন পরিজ্ঞাত হইল। কারণ, আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই—সমুদয় বস্তুতে ভগবান দর্শন করা, তাহারা যেরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না দেখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।

তার পর আর একটী প্রস্তাব আছে, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। 'যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম; তিনি রমণীয় ও জ্যোতির্ম্ময়। তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।' এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষ প্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ, ইহা কথিত হয় যে, উহা সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার জ্যোতি। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে, এবং সূর্য্য চন্দ্র তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্ সকলের কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মতের কথা বলিব। হয়ত উহা তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু পঞ্চালরাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি জান, লোকের মৃত্যু হইলে তাহারা কোথায় যায়?' 'তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে?' 'তুমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না কেন, খালিই বা হয় না কেন?' বালক বলিল, 'না, আমি ও সকল কিছুই জানি না।' সে তখন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকটও সেই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, 'আমিও জানি না।' তখন তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, 'এই জ্ঞান

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই কেবল উহা জানিতেন আর সেই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।' তখন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নি উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্নদরের পদার্থ। এই পৃথিবীই সেই অগ্নিস্বরূপ। সংবৎসর উহার কাষ্ঠস্বরূপ, রাত্রি উহার ধূমস্বরূপ, দিক্‌সকল উহার শিখাস্বরূপ। কোণসকল উহার বিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিরূপ আহুতি দিয়া থাকেন, যাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎই সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন। 'হে গৌতম, মনুষ্যশরীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি'। আমরা এখানেও আবার ধর্ম্মকে কার্য্যে পরিণত করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে নামাইয়া সংসারের ভিতর আনা হইতেছে, দেখিতেছি। আর এই সকল রূপক গল্পের ভিতর এই এক তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের হিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার জন্য প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানবপ্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।—যদি ঈশ্বরোপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাও, বেশ, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর নরদেহরূপ মন্দির ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়ের সময়ে কর্ম্মকাণ্ড এত জটিল ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে আর উহার ভিতর একটী গভীর অর্থ দিয়া। অতি প্রাচীনকালে এই সকল যাগ যজ্ঞাদি ছিল, কিন্তু এখন জ্ঞানীরা আসিলেন। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা তাহার স্থলে কিছু দিলেন।

অগ্নিতে হবন কর, ইহা উত্তম, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে, বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমার

মন্দির; যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া থাক—কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত, চেতন মনুষ্যদেহ রহিয়াছে এবং এখানে পূজা অন্য অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূজা হইতে শ্রেয়স্কর।

এখানে আর একটী বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশই বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তবে তোমাদের কাছে উহা পাঠ করি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে অর্চ্চি, তৎপরে দিন, ক্রমান্বয়ে শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয় মাসে গমন করে। ঐ মাস সকল হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্য্যলোকে, সূর্য্যলোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করে। সেখানে একজন অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহার নাম দেবযান। যখন সাধু ও জ্ঞানীদিগের মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্ব স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন, এ সকল বাজে কথা মাত্র। এই চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহারই বা অর্থ কি? হিন্দুদের মধ্যে এক ধারণা ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে—ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধূমে গমন করে, পরে রাত্রি, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষ, তৎপরে দক্ষিণায়ণ ছয় মাস, তৎপরে বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, তথা হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। তথায় দেবতাদের খাদ্যরূপ হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন তথায় বাস করিয়া থাকে। আর কর্ম্মফল শেষ হইলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয়, তৎপরে বায়ু, তৎপরে ধূম, তৎপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথায় শস্যক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্যের খাদ্যরূপে পরিগৃহীত অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরূপে পরিণত হয়। যাহারা খুব সৎকর্ম্ম

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং তু পাপং অন্তগতং তে দৃঢ়ব্রতাঃ দ্বন্দ্ব-মোহনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে। ২৮।

মূলানুবাদ। যে সকল পবিত্রকর্ম্মা ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়, সেই সকল দৃঢ়ব্রত (মহাত্মাগণ) দ্বন্দ্বমোহবিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥২৮॥

ভাষ্য।—কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তস্ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রং আত্মভাবেন ভজন্তে ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে—যেষাং তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ যথোক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ ভজন্তে মাং পরমাত্মানং দৃঢ়ব্রতাঃ এবমেব পরমার্থতত্ত্বং নান্যথেত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতাইত্যুচ্যতে। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। তাহারা কে যাহারা এই দ্বন্দ্বমোহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমাকে যথাশাস্ত্র জানিয়া আত্মভাবে ভজনা করে? এই অপেক্ষিত বিষয়ের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যে সকল ব্যক্তির পাপ "অন্তগত" সমাপ্তপ্রায় (অর্থাৎ) ক্ষীণ হইয়াছে (তাহারা কেমন) "পুণ্যকর্ম্মা" পবিত্র (অর্থাৎ) বিশুদ্ধ হইয়াছে চিত্তশুদ্ধিকারণ কর্ম্ম যাহাদের, তাহারাই পুণ্যকর্ম্মা, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ যথোক্ত দ্বন্দ্বমোহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ আমাকে আত্মভাবে ভজনা করে (তাহাদের কি প্রকার হইয়া থাকে?) "দৃঢ়ব্রত" এই আত্মাই পরমার্থতত্ত্ব, ইহার কোন প্রকারে অন্যথা হইতে পারে না, এই প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান যাহাদের আছে, তাহারাই দৃঢ়ব্রত বলিয়া উক্ত হয়। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥

অন্বয়। মাং আশ্রিত্য যে জরামরণমোক্ষায় যতন্তি (যতন্তে) তে তৎ-কৃৎস্নং অধ্যাত্মং ব্রহ্ম অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ২৯।

মূলানুবাদ। আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জরা ও মরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য যত্ন করে তাহারা সেই প্রত্যাগাত্মস্থিত অখণ্ড ব্রহ্ম ও সকল প্রকার কর্ম্মের স্বরূপ জানিতে পারে। ২৯।

ভাষ্য। জরামরণমোক্ষায় জরামরণমোক্ষার্থং মাং পরমেশ্বরমাশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্ ব্রহ্মপরং তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং সমস্তং অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ কর্ম্ম চ অখিলং সমস্তং তদ্বিদুঃ। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। জরা ও মরণ হইতে মোক্ষ পাইবার জন্য পরমেশ্বর আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ) আমাতেই চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক যাহারা যত্ন করিয়া থাকে তাহারা সেই সকল ভূতের উপাদান পরব্রহ্মকে অধ্যাত্ম (অর্থাৎ) প্রত্যগাত্মভাবে এবং নিখিল কর্ম্মস্বরূপে জানিতে সমর্থ হয়। ২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং যে বিদুঃ তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালেঽপি চ মাং বিদুঃ। ৩০।

মূলানুবাদ। অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমার স্বরূপ যাহারা (শাস্ত্রানুসারে) জানে, তাহারাই প্রয়াণকালে সমাহিত হৃদয়ে আমার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। ৩০।

ভাষ্য। সাধীতি সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতং চ অধিদৈবং চ অধিভূতাধিদৈবং অধিভূতাধিদৈবেন সহ সাধিভূতাধিদৈবং চ মাং যে বিদুঃ সাধিযজ্ঞং চ সহ অধিযজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং যে বিদুঃ প্রয়াণকালেঽপি চ মরণকালেঽপি চ মাং তে বিদুঃ যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। সাধিভূত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ, "সাধিভূতাধিদৈব" অধিভূত ও অধিদৈব (এই অর্থে) অধিভূতাধিদৈব (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে) অধিভূতাধিদৈবের সহিত বিদ্যমান (এই অর্থে) সাধিভূতাধিদৈব (এই শব্দটী ব্যবহৃত) এবং "সাধিযজ্ঞ" (অর্থাৎ) অধিযজ্ঞের সহিত বিদ্যমান, (এইভাবে) আমাকে যাহারা জানিতে পারিয়াছে, তাহারা প্রয়াণকালে (অর্থাৎ) মরণকালেও আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। ইতি ৩০।

(ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু জ্ঞানবিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।)

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যানুবাদের জ্ঞানবিজ্ঞানযোগনামক সপ্তম অধ্যায়।

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।—কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়। হে পুরুষোত্তম! কিং তদ্ ব্রহ্ম? কিং অধ্যাত্মং? কিং কর্ম্ম? কিং চ অধিভূতং প্রোক্তং কিং (বা) অধিদৈবং উচ্যতে? হে মধুসূদন অত্র দেহে কঃ অধিযজ্ঞঃ কথং বা (স চিন্তনীয়ঃ) প্রয়াণকালে চ (ত্বং) নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়োঽসি। ১—২।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন হে পুরুষোত্তম সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? কাহাকে অধ্যাত্ম কহা যায়? কি কর্ম্ম? কাহাকেইবা অধিভূত বলা হইয়াছে? অধিদৈবই বা কাহাকে বলা যায়? কাহাকে অধিযজ্ঞ বলা যায়? সেই অধিযজ্ঞকে কি প্রকারে ভাবিতে হইবে? হে মধুসূদন, প্রয়াণকালে নিয়তাত্মা (সাধক) গণ কেমন করিয়া তোমাকে জানিতে পারে? ১—২।

শ্রীভগবানুবাচ।—অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মং উচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ৩।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাহার বিনাশ নাই, তাহাই সেই পরব্রহ্ম, স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা যায়, যাহা দ্বারা ভূতনিচয়ের উৎপত্তি হয়, সেই বিসর্গ (অর্থাৎ দেবতাগণের প্রীতির জন্য দ্রব্যবিসর্জ্জন) কে, কর্ম্ম সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত করা যায়। ৩।

ভাষ্য। এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় (শ্রীভগবানুবাচ) 'অক্ষরং" ন ক্ষরতীতি পর আত্মা "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ওঁকারস্য চ "ওঁ" ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণাবিশেষণাদগ্রহণং পরমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণি অক্ষরে-উপপন্নতরং বিশেষণং তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে আত্মানং দেহং অধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্ম-

শব্দেনাভিধীয়তে। "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ" ভূতানাং ভাবঃ তস্য উদ্ভবঃ তংকরোতীতি— ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতবস্তূৎপত্তিকরইত্যর্থঃ। "বিসর্গঃ" বিসর্জ্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদেঃ দ্রব্যস্য পরিত্যাগঃ—স এব বিসর্গ-লক্ষণোযজ্ঞঃ "কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" কর্ম্মশব্দিত ইত্যেতৎ এতস্মাদ্ধি বীজভূতাদ্‌বৃষ্ট্যাদি-ক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি উদ্‌ভবন্তি। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই সকল প্রশ্নের যথাক্রমে নির্ণয় করিবার জন্য (ভগবান্ বলিলেন) "অক্ষর" যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহাই (অক্ষর শব্দের অর্থ) পরম আত্মা "এই অক্ষরের শাসনানুসারে হে গার্গি (চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ পায় ও তাপ প্রদান করে)" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও (অক্ষর শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা) তাহা সিদ্ধ হইতেছে, এখানে অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রণবেরও গ্রহণ হইতেছে না। (কারণ) ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্লোকে যে অক্ষর শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে "পর" এই বিশেষণ নাই, এখানে কিন্তু "পর" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এই জন্য এ স্থানে অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রণব গ্রহণ হইতে পারে না। "পরম" এই বিশেষণটি নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষরেই উপপন্নতর হয়। সেই পরব্রহ্মেরই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্মভাবে স্থিতিকেই স্বভাব কহা যায়, ইহাই "স্বভাব" অধ্যাত্ম উক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ আত্মাকে অধিকৃত করিয়া প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমার্থ বস্তু পর্য্যন্ত সকল পদার্থকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। "ভূতভাবোদ্ভবকর" ভূত (অর্থাৎ) পৃথিবী প্রভৃতি যে "ভাব" (অর্থাৎ) বস্তু তাহাই ভূতভাব এই শব্দটীর অর্থ—সেই ভূতভাবের "উদ্ভব" (উৎপত্তি) ভূতভাবোদ্ভব, তাহাকে যে করে, তাহার নাম ভূতভাবোদ্ভবকর "বিসর্গ" এই শব্দটীর অর্থ বিসর্জ্জন অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের তৃপ্তির উদ্দেশে যে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যাগ, তাহাই বিসর্গ শব্দের অর্থ—এই বিসর্গই ভূতভাবোদ্ভবকর, অর্থাৎ (অদৃষ্টের উৎপাদন দ্বারা) ভূতনিচয়ের উৎপাদক। সেই বিসর্গ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ যজ্ঞ; এই যজ্ঞই কর্ম্মসংজ্ঞিত; অর্থাৎ কর্ম্মশব্দের দ্বারা যজ্ঞই অভিহিত, এই যজ্ঞরূপ বীজ হইতে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ বিবিধ ভূতনিচয়ই উৎপন্ন হয়। ৩।

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

অন্বয়। ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্, পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্, হে দেহভৃতাং বর, অত্র দেহে অহমেব অধিযজ্ঞঃ। ৪।

মূলানুবাদ। বিনশ্বর বস্তু মাত্রই অধিভূত, (আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী) পুরুষই অধিদৈবত, হে প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠ! এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। ৪।

ভাষ্য। অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্যভবতীতি কোঽসৌ ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশী ভাবো যৎকিঞ্চিৎ জনিমদ্ বস্তু ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি পুরিশয়নাদ্বা পুরুষ আদিত্যান্তর্গতঃ হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ সোঽধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা "যজ্ঞোবৈ বিষ্ণু" রিতি শ্রুতেঃ। স হি বিষ্ণুরহমেবাত্রাস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ যজ্ঞোহি দেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণোভবতি দেহভৃতাং বর। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। অধিভূতমিত্যাদি শ্লোকের (তাৎপর্য্য এই যে) প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অধিভূত কহা যায় (সে কি?) "ক্ষর" যাহা বিনষ্ট হয়, তাহাই ক্ষর, এমন যে "ভাব" তাহাই অধিভূত, অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, এমন সকল বস্তুই অধিভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। "পুরুষ" যাহাদ্বারা জগৎ সকলই পরিপূরিত অথবা যিনি দেহরূপ পুরে বিরাজমান, তিনিই পুরুষ। (তিনি কে?) সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সকলপ্রাণীর সকলইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভ, সেই পুরুষই অধিদৈবত (শব্দের দ্বারা অভিহিত হন)। "অধিযজ্ঞ" সকল যজ্ঞের উপর আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতার আছে, সেই বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ শব্দের দ্বারা অভিহিত; শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট আছে যে;—বিষ্ণুই যজ্ঞ, সেই বিষ্ণু আমিই, এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে বিদ্যমান আছি। দেহের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এইজন্য যজ্ঞ। (অর্থাৎ যজ্ঞের ফল দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে) সুতরাং তাহা দেহাধিকরণ (সুতরাং যজ্ঞাভিমানিনী দেবতাও দেহে থাকেন) হে দেহভৃদগণের শ্রেষ্ঠ। ৪।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥

অন্বয়। অন্তকালে চ মাং এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। ৫।

মূলানুবাদ। মরণসময়ে কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি শরীর পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৫।

ভাষ্য। অন্তকালে ইতি। অন্তকালে চ মরণকালে মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রযাতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি নাস্তি ন বিদ্যতেঽত্রাস্মিন্ অর্থে সংশয়ো যাতি বা নবেতি। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। অন্তকালে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অন্তকালে" মরণ কালে আমাকেই (অর্থাৎ) পরমেশ্বরবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে করিতে "কলেবর" শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রয়াণ করে (অর্থাৎ) গমন করে (লোকান্তরে) সে "মদ্ভাব" বৈষ্ণব তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে কোন সংশয় (অর্থাৎ বৈষ্ণব পদ পায় কি না এই প্রকার সন্দেহ) বিদ্যমান নাই। ৫।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয় অন্তে যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ সন্ তং তং এব এতি। ৬।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, মরণ কালে যে যে ভাববিশেষকে স্মরণ করিয়া জীব দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাববিশেষের ভাবনার অভ্যাসবশে সে সেই ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে (পরলোকেও)। ৬।

ভাষ্য। ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ কিং তর্হি যং যং বাপি যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরংশ্চিন্তয়ন্ ত্যজতি পরিত্যজতি অন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং তং তমেব স্মৃতং ভাবং এব এতি নান্যং কৌন্তেয় সদা সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিতঃ তস্মিন্ ভাবঃ তদ্ভাবঃ সভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়া অভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ সন্। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। আমার বিষয়েই যে এই নিয়ম, তাহা নহে তবে কি?—(ইহারই উত্তর এই হইতেছে যং যং বাপি ইত্যাদি) যে যে ভাব অর্থাৎ দেবতাবিশেষকে স্মরণ করিয়া অন্তে অর্থাৎ প্রাণবিয়োগকালে কলেবরকে (জীব) পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, "সদা" সর্ব্বদা "তদ্ভাবভাবিত" হইয়া

সে সেই দেবতাবিশেষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দেবতার প্রতি ভাব (এই অর্থে) তদ্ভাব (শব্দটী ব্যবহৃত)। তদ্ভাব যাহা দ্বারা "ভাবিত" অনবরত স্মৃতির বিষয়ী হইয়া অভ্যস্ত হয়, সেই তদ্‌ভাবভাবিত। ৬।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাং অনুস্মর যুধ্য চ, ময়ি অর্পিত মনো-বুদ্ধিঃ অসংশয়ঃ (সন্) মাং এব এষ্যসি। ৭।

মূলানুবাদ। সেই কারণে সকলসময়ে আমাকে স্মরণ করিতে থাক এবং যুদ্ধও কর। আমার উপর মনঃ ও বুদ্ধিকে সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৭।

ভাষ্য। যস্মাদেবমন্ত্যাভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাং অনুস্মর যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্ম্মং কুরু ময়ি বাসুদেবে অর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতং এষ্যসি আগমিষ্যসি অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। যে কারণে এই প্রকার মরণকালের ভাবনা দেহান্তর প্রাপ্তির প্রতি কারণ, এই জন্যই সকল কালেই আমার স্মরণ করিতে থাক এবং যথাশাস্ত্র যুদ্ধও কর। (কারণ) যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম। যাহার মনঃ ও বুদ্ধি বাসুদেব আমাতে অর্পিত হইয়াছে, সেই তুমি "ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধি" হইয়া আমাকেই যেমন স্মরণ করিবে, তদনুসারে প্রাপ্ত হইবে, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৭।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন ন অন্যগামিনা চেতসা অনু-চিন্তয়ন্ দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি। ৮।

মূলানুবাদ। হে পার্থ, অনন্যপরায়ণ ও অভ্যাসযোগযুক্তমনে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে (সাধক) সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮।

ভাষ্য।—অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ভূতে একস্মিন্ তুল্য-

প্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরানন্তরিতোঽভ্যাসঃ স চাভ্যাসো যোগস্তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং যোগিনশ্চেতস্তেন চেতসা নান্যগামিনা ন অন্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নান্যগামি তেন নান্যগামিনা পরমং পুরুষং দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং যাতি গচ্ছতি—হে পার্থ অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্ ইত্যেতৎ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ—আরও (বক্তব্য এই যে) চিত্তসমর্পণের বিষয়ভূত একমাত্র আমাতেই একাকার চিত্তবৃত্তির যে আবৃত্তি অথচ যাহার মধ্যে অন্য কোন্ বিলক্ষণ বৃত্তির উদয় না হয়, সেই আবৃত্তিই অভ্যাস (শব্দের প্রতিপাদ্য)। সেই অভ্যাসই যোগ, এই প্রকার অভ্যাসযোগেতেই যোগীর যে চিত্ত ব্যাপৃত থাকে, তাহাকেই অভ্যাসযোগযুক্ত চিত্ত বলা যায়। সেই চিত্ত অনন্যগামি (ও হওয়া চাই)। যদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে সংলগ্ন হওয়া যাহার স্বভাব, সেই চিত্তকে অন্যগামি কহে; যে চিত্ত এ প্রকার নহে, তাহাই নান্যগামি চিত্ত। সেই নান্যগামি এবং অভ্যাসযোগযুক্ত চিত্তের সাহায্যে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে (সাধক) তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। যঃ তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণং অচিন্ত্যরূপং সর্ব্বস্য ধাতারং অণোরণীয়াংসং পুরাণং কবিং অনুস্মরেৎ। ৯।

মূলানুবাদ।—(অবিদ্যারূপ) অন্ধকারের বহির্ভূত, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অচিন্ত্যরূপ, সকল জগতের বিধাতা, অণু হইতেও অণুতর, সকল জগতের শাসিতা সেই পুরাতন কবিকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকে। ৯।

ভাষ্য। কিং বিশিষ্টং পুরুষং যাতীতি উচ্যতে। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং পুরাণং চিরন্তনমনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারং অণোঃ সূক্ষ্মাদপি অণীয়াংসং সূক্ষ্মতরং অনুস্মরেৎ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারং অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যতে ইতি অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং আদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং তং অনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। ৯।

ধর্ম্ম।

(বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

আমরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যখন মনে করি, কেহ আমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, আর যদি সেই অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে অমনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যদি কোন অত্যাচারী সুখে আছে দেখিতে পাই, অমনি বলি,—"ধর্ম্ম কি নাই"! ধর্ম্ম যে প্রতিশোধ আমাদের শত্রুকে দমন করেন না,—এই নিমিত্ত আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি, "ঘোরকলি", "অধর্ম্মেরই জয়!"—এই বলিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে আবার যিনি একটু বিজ্ঞ, তিনি ভাবেন ও মনকে শান্তি দেন যে, একদিন না একদিন ধর্ম্ম, তাহার শত্রুকে শাস্তি দিবেন। যাহার সহিত কোন কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, পাছে কার্য্যস্থলে তাহার দ্বারা প্রতারিত হই, এই নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের ভয় দেখাই। কিন্তু নিজে যদি কাহাকেও শাস্তি দিতে পারি, তখন আর ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারীর দণ্ডের নির্ভর না করিয়া আপনিই দণ্ডবিধানকর্ত্তা হই এবং দণ্ড দিয়া গৌরব করিয়া থাকি যে, পাপীর প্রতি শাস্তি বিধান করিয়া বড়ই পুণ্য কার্য্য করিয়াছি। পরের বেলা যে, ধর্ম্মের দোহাই দি, সেই ধর্ম্মকে অধিক সময় আপনারা উপেক্ষা করি।—এমন কি ঘৃণা করি বলিলে, অত্যুক্তি হয় না।

পুরাণে শুনিতে পাই, রাজা যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করিলে দৈববাণী হয়, "পাণ্ডুরাজ, তোমার এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল।" দৈববাণী শুনিয়া পাণ্ডুরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন, ভাবিলেন,—ধার্ম্মিক সন্তান পৃথিবীর কোন্ কার্য্যের হইবে? ধার্ম্মিক বা অকর্ম্মণ্য এক কথা—এই তাঁহার ক্ষোভের কারণ। ধার্ম্মিক পুত্র রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়, এরূপ ধারণা সাধারণের। কিন্তু ভারত যুদ্ধে, তাঁহার ভীমার্জ্জুন পুত্রদ্বয় দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবীরগণ পরাজিত হইত না, কৃষ্ণসহায়ে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" হইয়াছিল।

এরূপ ধারণার কারণ এই, অনেক সময় ভীরু ব্যক্তিকে আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করি। [illegible] কাহারও কথায় থাকেন না, কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে সহ্য করেন, সকলেরই নিকটে বিনয়ী নিরীহ গোবেচারা,—ধূর্ত্ত শঠ ব্যক্তি বার বার তাঁহাকে প্রতারিত করে, তবু কাহাকেও তিনি কিছু বলেন না, এরূপ ব্যক্তি অকর্ম্মণ্যই বটে; এরূপ ব্যক্তির সকল কার্য্যের ভিত্তি ভয়।

তিনি ভয়ে শত্রু দমনের চেষ্টা করেন না। অনেক সময়ে যে প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার কারণ লোভ—যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে সে তাঁহাকে লাভের আশা দিয়াছিল; সেই লাভের আশায়, প্রতারককে তিনি অর্থদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানমগ্ন কিছুতেই থাকেন না; সদাই ভাবেন, না জানি কি করিতে কি হইবে। এরূপ ব্যক্তি ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন; সত্যই জগতের কোন কার্য্যই ইহাঁর দ্বারা হয় না।

কিন্তু যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনি মহাবীর, তিনি অসীম সাহসী, তিনি বিপুল কর্ম্মক্ষম। ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ দয়া। দয়া কখনও স্থির থাকিতে দিবে না, নিয়ত কর্ম্মে নিবিষ্ট রাখিবে। দয়াবান ব্যক্তি দুর্ব্বলপীড়ন দেখিতে পারিবেন না। শত শত্রু উপেক্ষা করিয়া, দুর্ব্বলের রক্ষার চেষ্টা পাইবেন। পরের রক্ষার নিমিত্ত অনায়াসে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, অনায়াসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন। ইনি অত্যাচারীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন না, ইহার কারণ ভয় নহে, মার্জ্জনা। ভয়ে চালিত হইয়া কখনও কখনও আমরা ক্ষমাশীল হই। পুরাণে তাহার একটী অদ্ভুত উদাহরণ—অর্জ্জুন, রণস্থলে যুদ্ধ করিতে চাহেন না। গীতায় দেখা যায় যে, অর্জ্জুন বলিতেছেন, এ সমস্ত আত্মীয়গণকে কিরূপে বধ করিব? ইহাদের বধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন করাই ভাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের এ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে "মূর্খের মত আচরণ করিতেছ"—বলিয়া তিরস্কার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, গীতা পাঠে অনুভব হয়, অর্জ্জুন তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হন। শঙ্কায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, মহা অস্ত্রধারী, মহা রথীবৃন্দ বিপক্ষ পক্ষে দর্শনে, তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইতে চাহেন। ভগবান উপদেশ দ্বারা, সেই ঘোর তমঃ দূর করিয়া, তাঁহাকে গাণ্ডীব ধরান। ভগবান যোগদৃষ্টি দানে তাঁহাকে দেখান যে, যে সমস্ত বীরপুরুষ তাঁহার বিপক্ষ, তাঁহারা সকলেই মৃত, কেবল নিমিত্ত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র, ভগবানের কার্য্য ভগবান করিয়াছেন। গীতার মর্ম্ম এই যে, বীর ব্যতীত ধর্ম্মের অধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতীয় উন্নতির মূলে ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ব্যতীত কেহ কখনও কোন জাতির নেতা হন নাই। স্বার্থশূন্য ব্যক্তির দ্বারা চালিত না হইয়া, পৃথিবীতে কখনো কোন কার্য্য হয় নাই। ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন সাংসারিক কোন কার্য্যই হয় না। ধর্ম্মমূলক না হইলে,

পৃথিবীতে বিপুল বাণিজ্য স্থাপিত হইত না। কখনও কোন অধার্ম্মিক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, দেখা যায়, কিন্তু প্রায়ই সে অর্থ তাহার ভোগে আসে না। নানা কষ্টে, নানা ভয়ে, নানা অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অর্থ উপার্জ্জন হয়, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন যক্ষের ন্যায়, তাঁহার কোন কার্য্যেই আসে না। অসৎ বৃত্তির দ্বারা কদাচ কেহ ধনাঢ্য হয় বটে, কিন্তু শত শত ব্যক্তিকে অসৎ পথে গিয়া কারাবাসে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। Policy (কৌশল) যাহার অর্থ আমরা প্রতারণা বুঝি, বস্তুতঃ তাহা প্রতারণা নয়, পণ্ডিতেরা বলেন, সততা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল নাই।

গুরু ধার্ম্মিক হইতে উপদেশ দেন, সারবান গ্রন্থে ধর্ম্মের অশেষ ব্যাখ্যা; তবে কি নিমিত্তে আমরা ধর্ম্মপথে চলি না? অধর্ম্মের কতকগুলি আশু প্রয়োজন আছে। এক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মিথ্যা কথা বলা কি ভাল? বন্ধু কৌতুকচ্ছলে উত্তর করেন, মিথ্যা কথা ভাল নয় বটে, কিন্তু যদি সত্য গোপন করিতে চাও, তাহা হইলে মিথ্যা কথা অপেক্ষা সত্য গোপন করিবার আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। সমাজ হীনদশাপন্ন হওয়ায় বাল্যকাল হইতে মিথ্যায় প্রয়োজন হইয়াছে, মানব-জীবনে, বিশেষ বাল্যাবস্থায় পদে পদে অপরাধ। অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্ত বালক মিথ্যা কথা কহে। পিতামাতা বা শিক্ষক মিথ্যাবাদী বালককে সুচতুর বলিয়া আদর করে। ইতিপূর্ব্বে শিশু কোন আবদার করিলে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভুলান হইত; শিশু তখনই শিখিয়াছে যে, মিথ্যা বড় সহজ উপায়। শিশু যখন কোন বস্তু চাহিয়াছিল, তাহাকে বলা হইয়াছিল, "হুস, কাগা নিয়ে গেছে।" যদি শিশুর নিকট কৌতুক করিয়া কোন দ্রব্য চাওয়া হয়, সেও আধ আধ স্বরে বলে, "হুস্ কাগা!" আমরা, শিশুর কৌশলে হাসিয়া ঢলিয়া পড়ি। শিশুও মনে ভাবে, আমি কি সুকৌশলী! বালক দেখিতে পায়, মাতা পিতার সহিত, পিতা মাতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতা সহিত মিথ্যা কথা কয়। পিতা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছুক হইলে বালককে বলিয়া দেয়, "বলগে, আমি বাড়ী নাই।" বালক মিথ্যার বিশেষ আদর করিতে শিখে এবং সেই কোমল হৃদয়ে যে দাগ পড়ে, তাহা আর ইহজন্মে উঠে না। সমাজ জানে, বালককে শিষ্ট করিবার উপায়, ভয় প্রদর্শন। জুজু হইতে সুরু করিয়া, বরাবর ভয়ই প্রদর্শন করা হয়; সুতরাং বাল্য-জীবনে ভয় অধিকার করিলে, উচ্চ বৃত্তি সমস্ত দমিত হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তির

আধার সাহস ; যাহার পদে পদে আশঙ্কা, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইবে ? যাহা মন্দ, তাহা মন্দ বলিয়া ঘৃণা করিতে শেখে না, কেবল ভয়ের দ্বারা মন্দ কার্য্য করিতে বিরত হয়। যৌবনে, যখন আশু ভয়ের কোন কারণ না থাকে, তখনই সেই কুকার্য্যে রত হয়। সে যতদূর শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে জানে যে, চুরী করিব না কেন ? মার খাইব। কুস্থানে গমন করিব না কেন ? বাবা তাড়াইয়া দিবে। তাড়নার ভয়ে কুকার্য্য করে না, কিন্তু কুকার্য্যের রুচি বাধা পাইয়া আরও প্রবল হইতে থাকে। সচরাচর দেখা যায়, শিষ্ট শান্ত ছিল, যেই পিতৃহীন বা অভিভাবকহীন হইল, অমনি মহা কুচরিত্র হইয়া উঠিল। এখন তার ভয় নাই, তবে দুষ্কর্ম্ম করিবে না কেন ? বাল্যাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার ফল ইহা ভিন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু যদি কুকার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিত, যদি উপদেশ শ্রবণে ও আদর্শ দর্শনে, বাল্যাবধি ধর্ম্মানুরাগী হইতে দীক্ষিত হইত, যদি বুঝিতে পারিত যে, মানবজীবনে ধর্ম্মই একমাত্র সহায়, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত শত বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে হয় না, ধর্ম্ম অবলম্বনে মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে অভিভাবকহীন হইলেও তাহাকে কেহ কুপথগামী করিতে পারিত না। বাল্যকালে মিথ্যা প্রবঞ্চনা না শিখিলে সত্যাশ্রয়ী হইত, আর যিনি সত্যাশ্রয়ী, তাঁহার তুল্য জগতে নির্ভীক কে ? সভ্যজাতির ভিতর ভীরু অপেক্ষা গালি নাই এবং ভীরু বা মিথ্যাবাদী একই কথা। যিনি বাল্যাবধি গুরুজন উপদেশে সত্যব্রত, তিনি যে অশেষ গুণের আধার হন, সন্দেহ নাই। পাছে মিথ্যা বলিতে হয়, এই জন্য তিনি কুৎসিত কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন। আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টকে, তাঁহার কোন এক বন্ধু রবিবারে, শীকার করিতে যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "অন্ত রবিবারে, শীকার করা তো প্রথা নয়।" বন্ধু উত্তর করিলেন, "এখানে তো পাদ্রী নাই, তবে যাইতে দোষ কি ?" রুসভেল্ট, তাহাতে হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ভাই, অত সাত পাঁচ ভাবিয়া, গোপনে শীকার করিতে যাওয়া অপেক্ষা না যাওয়াই নিরাপদ।" সত্যাশ্রয়ী সর্ব্বদাই এরূপ নিরাপদ সত্য।

বালককালে মিথ্যাশিক্ষার সহিত একরূপ ব্যবসায়ী ধর্ম্মশিক্ষাও বালক পাইয়া থাকে। সকলের মুখেই শোনে, ধর্ম্মপথে থাকিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ধন হয়, জন হয়, মান হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম, কাহারও নিকট ধন, জন, মান

বা সাংসারিক উন্নতি দান করিতে অঙ্গীকৃত নন। এই ব্যবহারিক ধর্ম্মশিক্ষা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণ হয়। সংসার দৃষ্টে অনেক সময় বোধ হয়, বুঝি, অধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। দেখা যায়, শঠ, ছল, মিথ্যাবাদী, কপট মকদ্দমায় জয়ী হইল, পরের সম্পত্তি হরণ করিয়া বিষয় পাইল। জুয়াচুরি করিয়া, বাবুয়ানা করিতেছে। যে পরপীড়ক, তাহাকে সকলে ভয় করে। এ দিকে আবার ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দাতা নানা ক্লেশে ধনোপার্জ্জন করে, দরিদ্রের দুঃখমোচনে রত থাকিয়া অর্থ রাখিতে পারে না, পরের হিত করিতে গিয়া অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে উদ্‌বাস্ত হয়, রুগীর শুশ্রূষা করিয়া স্বয়ং রোগগ্রস্ত হয়। যিনি ব্যবসায়ী ধর্ম্ম শিখিয়াছেন, এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মে। তিনি মিথ্যা কথা কন না, প্রতারণা করেন না, কৈ, ঘরে বসিয়া ধর্ম্ম তো তাঁহাকে অর্থ দেন না। অনেক ব্যক্তি, যাহাদের তিনি উপকার করিয়াছেন, প্রায়ই তাহারা তাঁহার নিন্দা করে। পরোপকার করিয়া কই তিনি জগতে মান্য গণ্য হইলেন? তাঁহার পল্লীর শত শত ব্যক্তি ধনাঢ্য অধার্ম্মিকের বশীভূত, তাঁহার বশীকৃত কেহই নয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক অধার্ম্মিক ব্যক্তির সাত পুত্রই জীবিত। তবে ধার্ম্মিক হইয়া তাঁহার কি ফল ফলিল? আত্মীয় বন্ধুরা তাহাকে উপহাস করে, অনেকেই বোকা বলে। ইনি সত্য কথা কহিয়া মকদ্দমায় হারিয়াছেন,—ইহাতে যার পরে লাঞ্ছনার এক শেষ! তবে আর কেন তিনি ধার্ম্মিক থাকিবেন? এতদিন মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, এইবার সতর্ক হইয়া চলিবেন। আশু কতক ফলও ফলে। তিনি যে মিথ্যা কথা শিখিয়াছেন, লোকে তাহা সহজে জানিতে পারে না। লোকের বিশ্বাস-পাত্র হইয়া অনেককে ঠকাইতে সক্ষম হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারেন যে, প্রতারণায় অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছে। কখন কোন্ জুয়াচুরী ধরা পড়িবে! যে সকল কার্য করিয়াছেন, ইহকালেই তার সাজা আছে। সমস্ত কথা প্রকাশ হইলে, জেল নিশ্চিত। একটা মিথ্যা ঢাকিবার জন্য মিথ্যার জাল বিস্তার করিতে হইয়াছে। আগে কেহ ডাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় সহজে তাঁর সম্মুখীন হইতে পারেন না। দিবসে হাস্যমুখে, অন্তরের ছুরি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। রজনীযোগে, উপাধানে মস্তক রাখিলেও পূর্ব্ববৎ নিদ্রা আসে না। যে সকল গলদ হইয়াছে, [illegible] গলদ

আশ্রয় করিয়া লুকাইতে পারিবেন, এই চিন্তায় অর্দ্ধেক রাত্রি জাগরিত থাকিতে হয়। এখন আর সে শান্ত মেজাজ নাই, ভাল কথা কহিলে রেজার হন। অসৎ ব্যক্তির সাহায্যে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। অসৎ ব্যক্তি না হইলে তাঁহার অসৎ কার্য্যে সাহায্য দান কে করিবে? কিন্তু যাহাকে অসৎ জানেন, তাহার উপর কার্য্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই অসৎ ব্যক্তি সত্যই কি তাঁহার সাহায্য করিবে? কিম্বা তাঁহার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে? নানা দুশ্চিন্তা—তথাপি ফিরিবার উপায় নাই,—কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, চাকর বাকর, আত্মীয় স্বজন এমন কি, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও মনের গুণে অসৎ বিবেচনা করেন। দিবসে দুশ্চিন্তা, রাত্রে দুঃস্বপ্ন—তাহার জীবন হলাহলময় হইয়াছে। যে অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া, অধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছেন, সেই অর্থ তাঁহার পুত্রকেও পর করিয়াছে।

কতদিনে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইবে,—তাঁহার পুত্রের এই চিন্তা। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন, কেবল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তাঁহাকে যত্ন করিতেছে। চক্ষের উপর দেখিয়াছেন যে, যে ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পাপপথে বিচরণ করিতেছিলেন,—সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুকালে, অজ্ঞানাবস্থায় যখন মুখে মক্ষিকা প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাঁহার সেই অজ্ঞান অবস্থার প্রতি কেহ লক্ষ্য না রাখিয়া তালা-চাবি দিতে ব্যস্ত। যে যেখানে যা পাইতেছে, তাহা সরাইতেছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে শ্মশান ভূমেতে লইয়া গেল, এদিকে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, যেসকল বস্তু তাহার নিকট জিম্মা ছিল সে গুলি লইয়া পলায়ন করিল। সৎকার করিয়া আসিয়াই দুই পুত্রে লাঠা লাঠি বাঁধিল। অর্দ্ধেক বিষয় উকীল কৌন্সিল খাইল। আবার দেখেন, যে লোক জুয়াচুরী করিয়া বাবুয়ানা করিতেছিল, এতদিনে তাহার জাল ধরা পড়িয়াছে,—নিশ্চয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইতে হইবে—কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী সম্পত্তি পাইয়া উপপতির বাঁদী হইয়াছে। তাঁহার ভাগ্যে যে ঐ একরূপ ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত নয় কেন? কিন্তু তথাপি পাপের মমতা ছাড়ে না, ছাড়িবার যোও নাই—দুষ্কর্ম্ম চাপা দিবার নিমিত্ত দুষ্কর্ম্ম করিতে হইতেছে। অর্থলোভে আবার নূতন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জীবন অশান্তিময়, কিন্তু লালসাও সেইরূপ বলবতী! ইহকালের সাজাই যথেষ্ট, ইহার পর পরকাল আছে! এ[illegible]লের ভয় মহানাস্তিকেরও দূর হয় না। ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপী যতই

দিন দিন হীনবল হইতে থাকে, শরীরের ধ্বংস অবস্থা যতই দিন দিন বুঝে যে, চরমকালের আর বেশী বিলম্ব নাই, ততই সে দিন বিভীষিকা দর্শন করে এবং ব্যবসায়ী ধর্ম্ম লোককে অধঃপাতে প্রেরণ করে।

কিন্তু যে মহাত্মা ধর্ম্মের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য উপাসনা করেন, যিনি ধর্ম্মের নিকটে ধর্ম্মপ্রত্যাশী আর অপর প্রত্যাশা কিছুই রাখেন না, জগতে একমাত্র তিনিই ধন্য! রোগ শোক, দুর্ঘটনা, মনুষ্যজীবনে অনিবার্য্য, কিন্তু এরূপ দুঃখ জগতে নাই, যাহাকে সেই ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিকে বিকল করিতে পারে। শান্তিময় ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া, তাঁহার হৃদয় শান্তিময় করিয়াছে, শত্রুর রক্তাক্ষিমূর্ত্তে তাঁহার চক্ষে পলক পড়ে না! দুর্জ্জন পীড়নে তাঁহাকে তাপিত হইতে হয় না।—ধর্ম্মবলে রোগ-শোকে অধীর নন—রাগক্রোধেও তিনি ভীত হন না; সকল অবস্থায় সর্ব্বসময় তাঁহার শান্তি! তিনি যমজয়ী, তাঁহার মৃত্যুভয় নাই।

এ ধর্ম্ম লাভ কিরূপে হয়? এ মহারত্ন কিরূপে অর্জ্জন করা যায়? সদ্‌গুরুর উপদেশ, ও সদসদ্বিচার। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পাপ বড় মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নয়নসম্মুখে অবস্থান করে। একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে কত যন্ত্রণা দিবে, তাহা সে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে অনুভূত হয় না। পাপের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া, শিক্ষা করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়েই মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই পরমার্থ,—একটু মানসিক যন্ত্রণায় আর কি আসিয়া যাইবে!—যাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত না হইয়াছে,—অন্তর্দাহ যে কি কঠোর নরক,—তাহা সে বুঝিতে পারে না। অন্তর্দাহের কথা শুনিয়াছে মাত্র, প্রবল ইন্দ্রিয় কখনও অন্তর্দৃষ্টি করিতে দেয় নাই। সুতরাং পাপের তাড়না, কলুষিত মনের গ্লানি, দণ্ডের আশঙ্কা, যে কত দূর দুঃসহ, তাহা কিরূপে জানিবে! হিতাহিত জ্ঞান যে কত তীব্র শূল জাগরণে, শয়নে, স্বপনে বিদ্ধ করে, তাহা ইন্দ্রিয়াসক্ত মূঢ় বোঝে না,—এই নিমিত্ত ধর্ম্মে অনাস্থা।

হে ধর্ম্ম, তোমায় এত দিন ভয় করিয়াই আসিয়াছি, [illegible]তে পারি নাই যে, তুমি পরম বন্ধু। তোমাকে আমার সুখের বিরোধী জানিতাম। তুমি মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার করিতে নিষেধ কর,—এই নিমিত্ত তোমায় শত্রু ভাবিয়াছি; তুমি সদাচার, নিষ্ঠাবান, ও কর্ত্তব্যরত হইতে উপদেশ দাও, এই নিমিত্ত তোমায় ঘৃণা করিয়াছি; তুমি অলস হইতে নিষেধ কর, তুমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে নিষেধ কর, তুমি পরের অনিষ্ট করিতে নিষেধ [illegible] নিমিত্ত

তোমার বাতুল ভাবিয়াছি। তুমি ধন জন, গৌরব সম্পদ অনিত্য বলিতে শিখাও, তুমি সুখ দুঃখে সমভাবে থাকিতে বলো, মানব-জীবনে দুঃখ অনিবার্য, ইহাই প্রচার করিয়া থাক। দুঃখে অন্তর মার্জ্জিত হয়, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে, সে কারণ সুখ দুঃখ উভয়কে উপেক্ষা করিতে তুমি পরামর্শ দাও।—আমি নির্ব্বোধ, বিবেকহীন,—সারগর্ভ কথা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব,—অতএব ও সকল কথার কথা জানিয়াছিলাম। তুমি যে স্বাস্থ্যদাতা, বলদাতা, সাহসদাতা, ধৈর্য্যদাতা, শান্তিদাতা—এতদিন তোমায় চিনি নাই,—হে শান্তিময়, হে নিরঞ্জন, হে মঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার করি। জানিয়াছি, প্রার্থনা করিলে তুমি হৃৎপদ্মে আসিয়া বোসো। হে ধর্ম্ম, যে প্রার্থনা তোমার প্রিয়, সেই প্রার্থনা আমায় শিক্ষা দাও, তোমার মোহন মূর্ত্তি দেখিবার আমায় চক্ষু দাও, তোমায় উপাসনা করিবার বল দাও!—হে ধর্ম্ম, তোমায় একমাত্র বান্ধব জানিয়া যেন আমার জীবন লীলা সংবরণ হয়।

হিন্দুবিবাহ ও সার এড্‌উইন আর্ণলড।

সার এড্‌উইন আর্ণল্ডের নাম এদেশের অনেকের নিকট পরিচিত। তাঁহার ইংরাজী কবিতায় লিখিত বুদ্ধদেবচরিত, ভগবদ্গীতা, কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা তিনি যে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহা অনেকেই বোধ হয় জানিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রে 'ভারতে বিবাহ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার ভারতীয় সমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে কোন হিন্দু বিধবার স্বত্বাধিকার লইয়া যে আপীল হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুবিবাহের অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সচরাচর পড়ে না। আপন্ড বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি হি[illegible]র উল্লেখ করিয়া পরিশেষে কতকগুলি বিষয়ে যে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড় সারগর্ভ।

ইনি বলেন, "হিন্দুদের বর সচরাচর কন্যাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করে না। তাহাদের পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকের অনুমোদনে এবং ঘটকের সহায়তায় ইহা সম্পাদিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রথা তাহাদের খুব উপযোগীই হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, কেহ কেহ বলিবেন, আমাদের

পাশ্চাত্য স্বাধীন নির্ব্বাচনপ্রথা হইতে ইহা অধিকতর উপযোগী। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে এবং তালিকা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যদেশে সুখী দম্পতীর সংখ্যা অধিক। পাশ্চাত্য প্রথার বিবাহে যে সকল বিসদৃশ ভ্রান্তি, হঠাৎ নির্ব্বাচন ও তজ্জনিত প্রবল নৈরাশ্য দেখা যায়, প্রাচ্যপ্রথার বিবাহে সংসারাভিজ্ঞ সুচতুর ব্যক্তিগণের সাবধান নির্ব্বাচনে তাহা ঘটিতে পারে না। প্রেমের তরুণ স্বপ্নে যে বিচার অসম্ভব, তাঁহারা সেই বিষয়বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া, অবস্থার উপযোগী যতদূর সম্ভব, উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা বিবাহবন্ধনকে একটা তুচ্ছ বিষয় বিবেচনা করেন বলিয়া যে এরূপ করেন তাহা নহে। বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা ও উহার গভীর অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিধানের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন আর বাস্তবিকও আপাতদৃষ্টিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, একটী অল্পবয়স্কা বালিকা, যে স্বামীকে পূর্ব্বে কখন না দেখিয়াই বিবাহিত হইয়াছে, সে অল্পবয়সে স্বামীর মৃত্যুর জন্য রমণীজীবনের সর্ব্বস্ব সুখ হারাইল - ইহা অতি নিষ্ঠুর প্রথা, কিন্তু হিন্দুদের চক্ষে একবার এই বিষয় বিচার করিয়া দেখ। বিবাহিতা হইবামাত্রই সেই কন্যার ভার তাহার স্বামীর পরিবারবর্গ লইয়া থাকেন। এই কারণেই ভারতে স্ত্রীজাতীয় ভিক্ষুক নাই বলিলেই চলে। বিকলাঙ্গী, উন্মত্তা বা অন্য কোনরূপ দোষগ্রস্তা ব্যতীত সকল কন্যারই বিবাহ হইয়া থাকে আর যতক্ষণ তাহার স্বামীর গৃহে একমুষ্টিও অন্ন থাকে, ততক্ষণ তাহাকে উপবাস করিতে হয় না। পতির এরূপ অকালমৃত্যুকে পত্নীর পূর্ব্বজন্মকৃত কোন পাপের ফল বলিয়া বিবেচনা করা হয়। পতিগৃহে থাকিয়া পতির অনুধ্যানে জীবনযাপন করিলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। হিন্দুবিধবারা তাহাই করিয়া থাকেন। যদি ভারতের সকল বিধবা বিবাহ করেন, তবে প্রথম বা দ্বিতীয় পতির পরিবারবর্গ কখনই বিবাহবন্ধনকে এত তুচ্ছ ভাবিবেন না আর আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সমাজসংস্কারকগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিতেন তাহা হইলে ভারতে দশ বৎসর যাইতে না যাইতে ১৬০ লক্ষ বিধবা দ্বিতীয় বার পতি হারাইয়া পথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেন। আমি যে প্রাচ্য প্রথা আমাদের প্রথা অপেক্ষা অধিকতর বিচারসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিতেছি, তাহা নহে। যে সকল ব্যক্তি বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া অথচ উদার হৃদয়ের প্রেরণায়

আমাদের প্রাচ্য ভ্রাতা ভগিনীগণের সম্বন্ধে একটা হঠাৎ মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তিতে বাধা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ মানবের অতি প্রাচীনকাল হইতে দৃঢ়নিবদ্ধ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার সময় সাবধানতা ও সহানুভূতি শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট হইবে।"

ডিগ্‌বী ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

আজকাল অনেক ইউরোপীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন। সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর ভারতহিতৈষী ডিগ্‌বীমহোদয়—'সমৃদ্ধ ব্রিটিশশাসনাধীন ভারত (Prosperous British India) নামে একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সরকারী কাগজপত্র দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশশাসনে ভারতের অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টও ঘটিয়াছে। ইনি যে শুধু পুস্তকে ভারতের ভৌতিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ব্রিটিশশাসনের কি প্রভাব, তাহাও এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহাঁর পুস্তক হইতে কতকাংশের অনুবাদ দেওয়া গেল। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, ভারতের উপর ইহাঁর কতদূর সহানুভূতি এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণের, বিশেষতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ইহাঁর কতদূর শ্রদ্ধা। ইনি বলেন, " * * উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে জষ্টিস রাণাডে সমুদয় জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই ভারত আত্মসম্মান বজায় রাখিয়াছে। কেবল পরলোকগত ভারতীয় ধর্ম্মবীরগণের নাম করিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহাঁরা সকলেই বাঙ্গালী। ইহাঁরা সমগ্র জগতে পরিচিত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সমগ্র জগতের তুলনায় বোধ হয় যেখানে আধ্যাত্মিকতা অধিক, সেই দেশের কোটি কোটি অধিবাসিগণের ভিতর ইহাঁরা ত মুষ্টিমেয়। ভারতকে এই বিষয়ে অথবা অন্য বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার সুযোগ মোটেই দেওয়া হয় নাই। ইউরোপ যখন মার্টিন লুথারকে প্রসব করিল, তখন সমগ্র জগতের লোক তাঁহাকে একজন ধর্ম্ম-

সংস্কারক বলিয়া জানিতে পারিল। ঠিক সেই সময়েই ভারতও তাঁহার ধর্ম্মবীর প্রসব করিলেন। (সমগ্র জগতে তাঁহাকে তাদৃশরূপ না জানিলেও) শত শত লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। গত শতাব্দীতে যে সকল মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয়, রবার্ট ব্রাউনিং ও জন রাস্কিনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারাও বঙ্গদেশের সেই নিরক্ষর রামকৃষ্ণের তুলনায় কেবল অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন মাত্র। তিনি, আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি, তাহার কিছুই পান নাই অথচ এমন গভীর তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান যুগের কেহই দিতে পারেন নাই এবং সংসারক্লিষ্ট, মর্ত্ত্য জীবের নিকট ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

সিষ্টার নিবেদিতা।

(লণ্ডনে।)

উদ্বোধনের পাঠকগণের সিষ্টার নিবেদিতার কথা অবশ্যই স্মরণ আছে। ইনি একজন উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ রমণী। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাগবাজারে প্রায় দেড় বৎসর অবস্থান করিয়া হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ, হিন্দুরমণীর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া হিন্দুভাবে বালিকাগণকে অনেক দিন শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। প্লেগের প্রথম আক্রমণের সময় কিরূপে নিঃস্বার্থভাবে কলিকাতার নানাস্থানের বস্তি পরিষ্কার করাইয়াছিলেন, তাহাও সাধারণে অবগত আছেন। 'কালীপূজা' বিষয়িনী অনেকগুলি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে কি গূঢ় রহস্য আছে। তাহার পর প্রায় দুইবৎসরের উপর আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া হিন্দুরমণীদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-জাতির যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন এবং হিন্দুভাবে বালিকা-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে লণ্ডনে 'হিন্দুরমণীর শিক্ষা ও আদর্শ' বিষয়ে

এক বক্তৃতা দেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সেই সভায় সভাপতি হন।

সভাপতি মহাশয় বলেন, 'মিস নোব্‌ল ভাবতে শিক্ষাপ্রদান কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশের প্রতি তাঁহার খুব অনুরাগ। শিক্ষা-বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি বরাবরই খুব উদার। গভর্ণমেণ্ট নিজে যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা কখন গোপন করেন নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া জোর করিয়া ভারতীয় প্রজাগণকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে বেসরকারী সকল সম্প্রদায়কেই গভর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। মিস নোব্‌ল হিন্দুবালিকাগণকে, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মের আদর্শের উপর কোন আক্রমণ না করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে চান। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ অনেক সময়ে আমাদের সর্ব্বাংশে অনুকরণ করিতে চাহে, ইহাই ঐ শিক্ষার এক মহাদোষ। অতএব মিস নোব্‌ল যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং তিনি উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার প্রস্তাব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির বিরোধী নহে।'

মিস নোব্‌ল বলেন, 'শিক্ষা কোন রূপ বোতলে ভরিয়া ঔষধ গেলানর মত নিয়মিত মাত্রা হিসাবে দেওয়া যায় না। হিন্দুরমণীর পক্ষে তাহাদের শিক্ষার প্রধান অংশ তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রভাব। কোন জাতির শিক্ষাসম্বন্ধে কোন প্রণালী উপদেশ করিতে গেলে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের অবস্থা ও আভ্যন্তরিক জীবনের পর্য্যালোচনা আবশ্যক। আমি অল্পদিন ধরিয়া (দেড় বৎসর) বাঙ্গালা রমণীর বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। আমি যে শুধু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাবের উপর অনুরক্ত, তাহা নহে, আমি হিন্দুধর্ম্মের ভালমন্দ সর্ব্বাংশের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন। অতএব আমি হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিতে চাহি না। সমুদয় লইয়া হিন্দুজাতি সর্ব্বোচ্চ সভ্যজাতি, আর জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজেই সুন্দর শিক্ষার উপ-যোগী অবস্থা বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যরমণীর এত প্রভেদ যে, কোন ইংরাজমহিলা যদি হিন্দুরমণীকে যথার্থ শিখাইতে চান, তবে তাঁহাকে অবশ্য আপনাকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।

'পাশ্চাত্য প্রদেশে রমণীরা অনেকে রাজ্ঞী হইয়াছেন ও কর্ম্মিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন; অপর দিকে প্রাচ্যপ্রদেশে রমণীর মধ্যে অনেকে মহাসাধু হইয়াছেন। এই ভেদ কেবল রমণীর ভিতর আবদ্ধ নহে, কিন্তু ভারতীয় ব্যক্তিগণের আভ্য-

স্বরিক, সত্য, সরলতাময় জীবনের প্রত্যেক অংশে এই ভেদ বর্ত্তমান। হিন্দু যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই নীতিময় হইয়া যায়। জগতে যত সুন্দর জিনিষ আছে, হিন্দুগার্হস্থ্যজীবনের ন্যায় সুন্দর জিনিষ বোধ হয়, কিছুই নাই। ভারতীয় রমণীর আদর্শ, প্রেম নহে, কিন্তু ত্যাগই তাঁহাদের আদর্শ। এই আদর্শে আঘাত না করিয়া আমি হিন্দুরমণীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্য্যকরীভাব শিক্ষা দিতে চাই।'

(মান্দ্রাজে।)

ইণ্ডিয়ান মেশন্ বলেন,—"পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু নাস্তিক হইয়া যাইতেছে এবং তাহার অতীত ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের সত্য ও সনাতন অংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন ইহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেছেন। কতকগুলি পাশ্চাত্য নরনারী প্রাচ্য-জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া প্রাচ্যজাতির অনেকগুলি আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণ করিতেছেন। এই বিনিময়ের জন্য আমরা দুঃখিত নহি। যে গুলি বিনষ্ট হইতেছে, আর যে গুলির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেগুলির বিনাশ হউক। প্রকৃতির সকল শক্তিই তাহাদের বিরোধী। জীবন্ত ও বিকাশশীল বস্তুর বিকাশে সহায়তা করি আইস। যদি আধুনিক হিন্দুগণের মধ্যে কেহ এত স্থূলদর্শী হন যে, সূক্ষ্ম হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার ভাল না লাগে, তিনি পাশ্চাত্য জড়বাদে আপনার মনের মত জিনিষ পাইতে পারেন। কিন্তু আবার যদি কোন নরনারী জড়বাদে বিরক্ত হইয়া ঋষিদের ধর্ম্মেই কেবল শান্তি পান, তাঁহাদিগকেও সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের আত্মার ক্ষুৎপিপাসা মিটাইতে উৎসাহ দেওয়া উচিত—তাঁহারাও যাহাতে আপনাদের উপযোগী বিশ্বাস পোষণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। মিস নোব্‌ল অথবা যিনি রামকৃষ্ণমিশনসম্প্রদায়ের সিষ্টার নিবেদিতা বলিয়া পরিচিত, তিনি সম্প্রতি মান্দ্রাজ মহাজন সভায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি সাধারণভাবে হিন্দুজীবন ও হিন্দুচিন্তার আলোচনা করেন ও বিশেষভাবে প্রোফেসার জে, সি, বোসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোচনা করেন। তাঁহার কতকগুলি মত আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারকগণের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হইবে। তিনি বলিয়াছেন, 'ইহা লোকে অনেক দিন বুঝিয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশকে তোমাদের অনেক শিক্ষা দিবার আছে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিবার তোমাদের কিছুই নাই।'

"ইংরাজরমণীর নিম্নলিখিত ধারণাগুলি দেখিয়া কি সংস্কারকগণ চমকিত ও ভীত হইবেন না ? 'অনেকের ধারণা, ভারতীয় রমণীগণ মূর্খ ও অত্যাচার-পীড়িত। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিতে পারি যে, ভারতীয় রমণীগণ অবশ্য অত্যাচারপীড়িত নহেন। যে সকল দেশ নূতন সভ্য হইয়াছে, সেই সকল দেশে রমণীগণের উপর যত অত্যাচার হয়, ও যত ঘৃণিতভাবে অত্যাচার হয়, ভারতে তত নয়। আর ভারতীয় রমণীর সুখসচ্ছন্দ, তাহাদের সামাজিক প্রাধান্য ও উচ্চ চরিত্র, ভারতের জাতীয়সম্পত্তির শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। ভারতীয় রমণীগণ মূর্খ বলিলে আরো অধিক অন্যায় কথা বলা হয়। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা না হইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রমণীই লিখিতে পারেন আর অনেকেই পড়িতে পারেন না, কিন্তু তাই বলিয়াই কি তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিতে হইবে ? যদি তাই হয়, তবে মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ এবং যে সকল গল্প, সকল জননী ও পিতামহী শিশুগণকে শিখাইয়া থাকেন, তাহারাও শিক্ষার উপাদান নহে। আর—পাশ্চাত্য উপন্যাসাবলিই এবং সংবাদপত্রসমূহই প্রকৃত সাহিত্য ও শিক্ষার উপাদান ! এ কথা কে স্বীকার করিবে ?'

"আর আমাদের যুক্তিবাদী বন্ধুগণ—যাঁহাদের নিজেদের যুক্তির উপর খুব বিশ্বাস, কিন্তু যাঁহারা কোনরূপ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের শক্তিসম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারাই বা এ কথায় কি বলিবেন ? 'ভারত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তোমাদিগকে বিজ্ঞানালোচনায় অত্যধিক সহায়তা দেয়, এমন একটী বিষয় আছে,—অপরোক্ষজ্ঞান শক্তি।—তোমরা কখন লোককে ব্রহ্মের বিষয় শিক্ষা করিতে উপদেশ দাও নাই, তোমরা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানিতে উপদেশ দিয়াছ—যাহাতে মন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তুর সহিত একীভূত হইয়া যায়। এইরূপে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অনুমান বা বিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রতিভা সর্ব্বত্র এইরূপেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া থাকে।' "

সমালোচনা।

The Vedanta and its relation to modern Thought. Vol 1. by Pundit Sitanath Tattabhushana (বেদান্ত ও আধুনিক চিন্তার সহিত উহার সম্বন্ধ, ১ম ভাগ, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত।)

সীতনাথ বাবু কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বেদান্তসম্বন্ধে যে কয়েকটী বক্তৃতা দেন, সেইগুলি একত্র করিয়াই এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। সীতানাথ বাবু বেদান্তের বিশেষ অনুরাগী। তিনি স্বাধীনভাবে প্রকৃত বেদান্ত বা উপনিষদের ভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ তিনি কতকটা যেন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছেন। সীতানাথ বাবু নিজে অনেকস্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান সাধনলভ্য ও সেই কথার প্রমাণস্বরূপে অনেকস্থলে শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকস্থলে উপনিষদ্‌কে মতবিশেষ বলিয়া যেন ধারণা থাকাতে প্রাচীনকালের শঙ্করাদি বৈদান্তিকগণও যেমন উহাকে কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিয়াছেন, সীতানাথ বাবুরও সেই ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পুস্তকের শেষ অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, সীতানাথ বাবু বাধ্য হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে একমাত্র সত্য মনে করিলেও এক একবার যেন তাঁহার মনে চকিতের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদকেই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব এই সকল বিভিন্ন মতের সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বাদ কেবল মত নহে—সাধকের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। শঙ্করের মায়াবাদ শুধু বিচারের দিক্ দিয়া বুঝা যায় না—সাধনের আলোকে এই মায়াবাদতত্ত্ব অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সীতানাথ বাবু বলেন, একত্ব ও বহুত্ব এক সময়েই থাকিতে পারে—এই বিশ্বাস তাঁহার অতিরিক্ত দার্শনিক আলোচনার ফল। সহজজ্ঞানে ও সাধন অবলম্বন করিলে বুঝা যায়, যখন একজ্ঞান হয়, তখন বহুজ্ঞান থাকে না।

যাহা হউক, সীতানাথ বাবুর পুস্তকে ইহা প্রকাশ পাইতেছে, ব্রাহ্ম-সমাজ ঘোর যুক্তিবাদী হইলেও কিরূপে ধীরে ধীরে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেছেন। ইনি বলেন, 'রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর চরিত্রে ও জীবনে খুব উন্নত হইলেও বেদান্তের কোন কোন মতে মত দিতে না পারায়—এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। ইহাতে তাঁহার নিজের বিশেষ ক্ষতি না হইলেও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। কারণ, যখন কেশব বাবু আদি সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার দলের মধ্যে বিজাতীয় ভাবের আতিশয্য হইল। শেষ জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও উদাহরণে আপনার ভ্রান্তি

বুঝিয়াছিলেন ও পুনর্ব্বার বেদান্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ইহা নিজমুখে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সে বিষয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবার কেশব বাবুর সমাজের সহিত পৃথক্ হইয়া বেদান্তের চর্চ্চা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিলেই হয়, কিন্তু কিছুদিন হইল, ইহার কতকগুলি সভ্য বেদান্তচর্চ্চা করিতে রীতিমত আরম্ভ করিয়াছেন।' বলা বাহুল্য,—ইহাঁরা আর কেহ নহেন, সীতানাথ বাবু স্বয়ং এবং তাঁহার কতকগুলি সহযোগী। ইহাঁরা দিন দিন বেদান্তচর্চ্চায় আরো অধিক মনোনিবেশ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

সীতানাথ বাবু উদারপ্রকৃতি। তিনি ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্যত্রও যথা থিওজফিক্যাল সোসাইটী ও রামকৃষ্ণ মিশনে নিরপেক্ষ ভাবে বেদান্তের চর্চ্চা দেখিয়া আনন্দিত। আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি একবার মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

বাবু কিশোরীলাল জৈনী কৃত তাম্বুলবিহার। ইহা যে কেবল তাম্বুলের সহিত সেব্য তাহা নহে, তামাকের সহিত অতি উপাদেয়। সুগন্ধ ও সুস্বাদজনক। ইহার কৌটাও অতি সুন্দর। মূল্যও খুব সস্তা—চারি আনা মাত্র। ঠিকানা নং ১১৯। ৪, পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব।

আগামী ২রা চৈত্র রবিবারে কলিকাতার সন্নিকটে, ভাগিরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড়-মঠ ঠাকুরবাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব হইবে। তথায় সেই দিবসে উক্ত মঠের অধ্যক্ষ যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং যাবতীয় শ্রেণীর আবালবৃদ্ধ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে মহোৎসবে যোগদান করিয়া সকলকার আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

করিয়াছিল, তাহারা সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে আর যাহারা খুব অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচ জন্ম হয়, এমন কি, তাহাদিগকে কখন কখন শূকরজন্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শূন্যও হয় না।

আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি আর পরে হয়ত আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলির অপেক্ষা যেন কিছু অধিক স্পষ্ট বোধ হয়, কিন্তু এই সকল উক্তির সার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বৃথা। মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি আছেন —তাঁহারা ব্রহ্মানুভব করিতে এখনও পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম্ম আবার ফলকামনায় কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানাস্থান দিয়া যাইয়া স্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপে দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাঁহাদের শুভ কার্য্যের শেষ না হয়, ততদিন তাঁহারা তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটী মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নামরূপ আছে, তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ তথায় নামরূপ রহিয়াছে। অনন্ত স্বর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র যেমন এই পৃথিবী কখন অনন্ত হইতে পারে না, কারণ, যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি—কালে, স্থিতি—কালে এবং বিনাশও—কালে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির—সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতা ভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমানও খ্রীশ্চিয়ানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আরবের মরুতে জল একটী অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এইজন্য মুসলমানেরা স্বর্গকে সর্ব্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করে। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়ত স্বর্গকে শুষ্ক স্থান ভাবিব, ইংরাজেরাও তাহা ভাবিবেন। সংহিতায় এই স্বর্গ অনন্ত, মৃত ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া থাকে। তাঁহারা তথায় সুন্দর দেহ লাভ

করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত তাহাদের পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা সর্ব্বাংশে এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন করিয়া থাকে। এই জীবনে সুখের যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে, সব চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার যাহা কিছু সুখকর অংশ, তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু মানুষ যাহাই ভাবুক না কেন, ইহা খুব সুখের কথা বটে, কিন্তু সুখকর ও সত্য সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। বাস্তবিক চরমসীমায় না উঠিলে সত্য কখন সুখকর হয় না। মনুষ্যস্বভাব বড় স্থিতিশীল। মানুষ কোন বিশেষ কার্য্য করিতে থাকে, আর একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মন নূতন চিন্তা আসিতে দিবে না, কারণ, উহা বড় কষ্টকর।

অতএব আমরা দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে, এই সকল স্বর্গ, যেখানে মানুষ যাইয়া পিতৃলোকদের সহিত বাস করে, তাহা কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ, নামরূপাত্মক বস্তু মাত্রেই বিনাশশীল। যদি সাকার স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে, উহা লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিবে, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদয় হইয়াছে যে, এই সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে আর স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্ম্মের ফলভোগের স্থান মাত্র; আর এই ফল ভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। একটী কথা ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য্যকারণ-বিজ্ঞান জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি সবই আন্তরিক অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কিনা, আমি বলিব, ইহা আগে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে দর্শনরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কথা বলিত। পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত কথা

কহিত, পশুগণ কহিত, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিষ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দ্বারা বা ন্যায়বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিম্বা আধুনিক কালের যেমন প্রথা, অপরের মস্তিষ্ক-প্রসূত কতকগুলি বিষয়সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তাঁহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাও করেন নাই, তাঁহাদিগকে উহা আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ইহার সার ছিল সাধন—প্রত্যক্ষানুভূতি, আর চিরকালই তাহা থাকিবে। ধর্ম্ম চিরকালই একটী প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান থাকিবে। মতবাদের ধর্ম্ম কখন হইবে না। প্রথমে অভ্যাস, তার পর জ্ঞান। আত্মাগণ যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা এই উপনিষদেই বর্ত্তমান দেখিতেছি। যাহারা ফলকামনা করিয়া কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহারা সেই সৎ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই ফল নিত্য নহে। কার্য্য-কারণ-বাদের ধারণা এখানে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ, কথিত হইয়াছে যে, কার্য্য কারণের অনুসারেই হইয়া থাকে। কারণ যাহা, কার্য্যও তাহাই হইবে। কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্য্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্য্যও নিত্য হইবে। কিন্তু সৎকর্ম্মকরা রূপ এই কারণগুলি অনিত্য—সসীম, সুতরাং তাহাদের ফলও কখন নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর এক দিক্ দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে যে, যে কারণে অনন্ত স্বর্গ হইতে পারে না, অনন্ত নরকও সেই কারণেই হওয়া অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব বদ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি। তথাপি এই সারা জীবনটাও অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সান্ত কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কার্য্যরূপ সান্ত কারণ দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল, তাহা হইতেই পারে না। যদি আমি সারা জীবন সৎকর্ম্ম করিয়া অনন্ত স্বর্গলাভ করি, তাহাতেও ঐ দোষ হইল। পূর্ব্বে যে সকল পথের কথা বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত, যাঁহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আর এক পথ আছে। ইহাই মায়াবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—'সত্যকে অনুভব করা', আর উপনিষদ্ সকল এই সত্যানুভব কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতেছেন।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্য্যই—আত্মা হইতে

প্রভুত চিন্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল, জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, সেই প্রভুকে স্বর্গনরক সকল স্থলে দেখ। মৃত্যুতে এবং জীবনে তাঁহাকে দেখ। আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, আত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ হইতে লাগিল, তখন আমি স্বর্গেই যাই, নরকেই যাই বা অন্যত্র যাই, কিছুই আসিয়া যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি, অথবা স্বর্গেই যাই, তখন কিছুই আসিয়া যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থ নাই, কারণ, আমার পক্ষে সব জায়গা সমান ও সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র আর স্বর্গে নরকে বা অন্যত্র আমি কেবল ভগবানের সত্তা অনুভব করিতেছি। ভালমন্দ বা জীবনমৃত্যু কিছুই দেখিতেছি না।

বেদান্তমতে মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া যায় আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অন্যায় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি এখানে নানা বিঘ্নবাধা বিপদ্ দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়, যে ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপের দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সেই কেবল বলিতে পারে, আমি এই জীবন সম্ভোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী। এখানে আমি ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদেতে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্ত্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গের অবতারণা। বেদেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তির কথা এই পাওয়া যায়—পুনর্জ্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধালাভ করা। প্রথম হইতেই নির্গুণের ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাবই খুব জড়ভাবাত্মক, আর ঐ ভাব কেবল মানুষের ন্যায় সগুণ ঈশ্বরবাদেই সম্ভব হয়—যিনি আমাদেরই ন্যায় একজনকে ভাল বাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত

হইতে পারে। সংহিতায় ঈশ্বর এই রূপ ছিল। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে: ইহার সহিত নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই নির্গুণের ধারণা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্ব্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লোক, অন্ততঃ জগতে যাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নির্গুণবাদের উপর বিরক্ত কিন্তু আমার এই সগুণবাদ অতিশয় হাস্যাস্পদ, অতিশয় নিম্নভাবাপন্ন, অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি, অতিশয় ভগবন্নিন্দাকর বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে রূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে—চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে—ভগবানকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্‌টী—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর?—যে ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ যাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানে না অথবা যে ঈশ্বর জ্ঞাত? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে বিনাশ! তিনি কেন নিজে আসিয়া, কি করিতে হইবে, আমাদের বলিয়া না দেন? তিনি কেন ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেক লোক সন্তুষ্ট। আমাদের কি নীচতা!

অপর পক্ষে, নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি; তিনি একটী তত্ত্বমাত্র। সগুণ নির্গুণের মধ্যে প্রভেদ এই;—সগুণ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানববিশেষ মাত্র, আর নির্গুণ ঈশ্বর—মানুষ, পশু, দেবতা এবং আরো কিছু যাহা আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত—উহা সমুদয় ব্যক্তির সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরো অনেক। 'যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে,' নির্গুণও তদ্রূপ। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখি নাই, তুমিও দেখ নাই। এই চেয়ার খানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তৎপরে তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ার খানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া

'আমি আছি', 'আমি আছি', বলিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে তুমি বল, 'আমি আছি', সেই মুহূর্ত্তেই তুমি সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে—জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না দেখিতে পার—যদি না তাঁহাকে ঐ যে লোকটা বাস্তায় মোট বহিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে, তাহার ভিতর না দেখিতে পার? 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।' তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ, দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমি সমুদয় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' তুমি এই সব। কি অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু। ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ইহা পূর্ব্বাপরচলিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে, যিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতেরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের পদধূলি লেহন করি ও তাঁহাদিগকে পূজা করি, তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একখানি ছাড় দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে পারিব। এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়! এই সকল স্বর্গবাদ আর কি? কেবল পুরোহিতদের দুষ্টামীমাত্র।

অবশ্য নির্গুণবাদে অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের হস্ত হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়—উহাতে মন্দির, চর্চ্চ প্রভৃতি সব উড়িয়া যায়। ভারতে এক্ষণে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরা জহরত রহিয়াছে। যদি লোককে এই নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় শিখান যায়, তাহাদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে ইহা পৌরোহিত্যের ভাব ছাড়িয়া দিয়া শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও তাহাই—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোনরূপ মন্দিরে কোন রূপ প্রতিমা বা কোন রূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরস্পর বিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমরা খাঁটি প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা। কিন্তু এইখানে তোমাকে উপাসনা করার চেয়ে আর কি অধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে? আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভব

করিতেছি, আর জানিতেছি তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই, কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির—গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতেছ আর সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুকে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য তির্য্যগ্ জাতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহলস্বরূপ। যদি আমি তাহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহূর্ত্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—সমুদয় পদার্থই আমার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে।

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাযের উপাসনা। মতমতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ কথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নহে। তাহারা তাহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতামহ তস্য পিতামহ ২০০০০ বৎসর পূর্ব্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি আবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এই সকল কথার বিচারে ব্যস্ত। কথাটা এই, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাঁহাদের মতে ইহাই কাযের কথা—আর আমাদের মত কার্য্যকরী নহে। বেদান্ত বলেন, সকলেই আপনার নিজ নিজ পথে চলুক, ক্ষতি নাই, ইহাই কিন্তু আদর্শ। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নহে, কিন্তু উহারা সত্যের সোপানমাত্র, সত্য নহে। ঐ সকলে সুন্দর মহৎ ভাব সকল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন, 'বন্ধো, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারাজগৎ যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তিনি জগতে সর্ব্বদাই বিরাজিত। তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া। তিনিই জগতের নিত্যসাক্ষী। সমুদয় বেদ যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'তে সদা বর্ত্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনিই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি

যদি তোমাতে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতে না, সমুদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাশি—শূন্য—বলিয়া প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্তি পাইতেছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে—ইহাতে ত ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের সকলেই মনে করিবে, 'আমি ঈশ্বর—যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল—ঈশ্বরের আবার পাপ কি?' প্রথমতঃ, এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যারূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে,' অপর পক্ষে ঐ আশঙ্কা নাই? লোকে আপনা হইতে পৃথক্ স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা কেবল ভয়ে কাঁপিতে থাকে আর সারা জীবন এইরূপ কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? তুমি ত অপর পক্ষকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছেন, এবং যাঁহারা নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় লোক হইয়াছেন?—মহা কর্ম্মিগণ—মহা চরিত্রবলশালিগণ? অবশ্যই নির্গুণ সাধকদের মধ্য হইতে। ভয় হইতে চরিত্রবান পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? অবশ্যই ইহা কখনই হইতে পারে না। 'যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরের হিংসা করে, সেইখানেই মায়া। যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মময় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।'* তখন সবই তিনি অথবা সবই আমি—তখন আত্মা পবিত্র হইয়া যায়। তখনই, কেবল তখনই আমরা প্রেম কাহাকে বলে, বুঝিতে পারি। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা—মুক্তভাব—হইলেই তবে প্রেম আসে। তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্ব্বে নহে।

অতএব এই মতে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, এ কথা বলা উচিত নয়, যেন অপর মতে কখন লোককে অন্যায় দিকে লইয়া যায় না, যেন উহাতে সমস্ত জগৎকে রক্তপ্লাবনে ভাসাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লোককে পরস্পর পৃথক্ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না। আমার

যদি উপধাভূত ঋকারেরও ইত্ব প্রাপ্তি হয়, তবে 'মাতৃ' এবং 'পিতৃ', শব্দের ঋকার, দীর্ঘ হইবার কালীন 'র'পরাবশিষ্ট হইয়া হইলেও ত ইত্ব প্রাপ্ত হইবে? সেই হেতুই সেখানে (ঋত ইদ্ধাতোঃ সূত্রে) 'ধাতু' শব্দ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই 'মাতৃণাম্, 'পিতৃণাম্' শব্দ ধাতু না হওয়াতে, ইত্ব প্রাপ্তি হইবেনা।

এই প্রকারে তবে সমর্থতা প্রযুক্তই পূর্ব্ব ণ'কারের সহিত 'অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে; কিন্তু পরের 'ণ' কারের সহিত গ্রহণ হইবে না। কারণ, যদি পরের ণ কারের গ্রহণ হইত, তবে অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণই অনর্থক হইত। উবত্রপরঃ এইরূপ সূত্র বলা হইত। অর্থাৎ 'ঋ স্থানে কোন আদেশ হইতে, যখন তাহা, অচ্ প্রত্যাহারের অন্তর্গতই হইবে, তখন, সন্দেহনিবারক অথচ নিকটবর্ত্তী 'চ কারের সহিত অচ্ প্রত্যাহারকে অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী পরস্থিত অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণ অনাবশ্যক বলিয়া কখনও তাহা গৃহীত হইত না।

ভাষ্যমূল।—অস্মিংস্তর্হি ণ্ গ্রহণে সন্দেহঃ। অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয় ইতি। অসন্দিগ্ধং পরেণ ন পূর্ব্বেণ ইতি। কুত এতৎ। সবর্ণেহণ্ গ্রহণং তপরংহ্যর্থং। *।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূর্ব্ব 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার গ্রহণ সিদ্ধ হইলেও, তবে "অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ১। ১। ৬৯। (১) এই সূত্রে, সন্দেহ হইবে?

এই স্থলে পরের 'ণ' কারের সহিতই যে 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহা কি প্রকারে হইবে?

বার্ত্তিকানুবাদ।—সূত্রকার পাণিনি, সবর্ণ সংজ্ঞাতে পরের 'ণ'কারেরই সহিত 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু, তিনি 'উরণ্' সূত্রে, 'ত'পর বিশিষ্ট করিয়াছেন। *।

ভাষ্যমূল। যদয়মুরণ্ দিত্যকারে তপরকরণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ পরেণ ন পূর্ব্বেণেতি।

ভাষ্যানুবাদ।– যেহেতু এই "উরণ্"।৭।৪।৭। (উপধাভূত ঋবর্ণ অর্থাৎ হ্রস্ব ঋ, দীর্ঘ ঋ এবং প্লুত ঋ৩ স্থানে, ঋং অর্থাৎ কেবলমাত্র হ্রস্ব ঋ হয়, বিকল্পে,

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

টত্ত্ পরে আছে এমন শাস্ত্র বিষয় হইলে) সূত্রে, 'ঋ'কার গ্রহণ করিতে, তপর অর্থাৎ 'ঋৎ' এইরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতেই আচার্য্য (পাণিনি) ইহা জানাইয়াছেন যে, "অণুদিৎ * * *" সূত্রে, সবর্ণ সংজ্ঞাগ্রহণে, পরের 'ণ' কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে, পূর্ব্বের 'ণ'কারের সহিত হইবে না। কারণ, যদি পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার হইত, তবে 'ঋ'বর্ণ তাহার মধ্যে পতিত হইত না, সুতরাং 'ঋ'কারের সবর্ণ সংজ্ঞাও হইত না, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত তিন প্রকারের ঋকারেরও গ্রহণ হইত না। 'উরৃৎ' সূত্রে, 'ত'পরবিশিষ্ট না করিয়া কেবল ঋকারান্ত অর্থাৎ 'উরৃ' এইরূপ সূত্র করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইত।

ভাষ্যমূল।—ইণ্গ্রহণেষু তর্হি সন্দেহঃ অসন্দিগ্ধং পরেণ ন পূর্ব্বেণ। কুত এতৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে 'ইণ্' প্রত্যাহার সমূহ গ্রহণে সন্দেহ হইবে?

এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, পরের 'ণ'কারের সহিতই 'ইণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে; কিন্তু পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত হইবে না।

ইহা কিরূপে হইবে?

শ্লোকাংশমূল।—য্বোরনুক্ত পরেণেণ্ স্যাৎ।

শ্লোকাংশানুবাদ।—'য্বোঃ' অর্থাৎ যেখানে (পাণিনি) 'ই'কার এবং 'উ'-কারের গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্যত্র, পরের 'ণ'কারের সহিতই 'ইণ্' প্রত্যা-হারের গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যত্রেচ্ছতি পূর্ব্বেণ সংমুগ্ধ্য গ্রহণং তত্র করোতি য্বোরিতি। তচ্চ গুরু ভবতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। তত্র বিভক্তিনির্দ্দেশে সংমুগ্ধ্য গ্রহণে-ইর্দ্ধচতস্রো মাত্রাঃ। প্রত্যাহারগ্রহণে পুনস্তিস্রোমাত্রাঃ। সোঽয়মেবং লঘীয়সা ন্যাসেন সিদ্ধে সতি যল্লঘীয়াংসং যত্নমারভতে তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ পরেণ ন পূর্ব্বেণেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যেখানেই আচার্য্য, পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত সংমর্দ্দন করিয়া 'ইণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেখানেই 'য্বোঃ' (১) এই রূপ পাঠ করিয়াছেন। তাহা ('য্বোঃ' এইরূপ পাঠ, 'ইণ্' এইরূপ পাঠ অপেক্ষা) গুরুও হইয়া থাকে।

ইহা ('য্বোঃ' এইরূপ গুরু অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রাবিশিষ্ট পাঠ) কিরূপে, পর 'ণ'কারের সহিত 'ইণ্' প্রত্যাহার গ্রহণের জ্ঞাপক হইল?

সেই স্থলে ('ই'কার 'উ'কার স্থলে), বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলে ('যোঃ' এই রূপ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিবচনের রূপ গ্রহণ করিলে) 'ই'কার 'উ'কা সংমর্দ্দন করিয়া গ্রহণ করাতে অর্দ্ধ কম চারি মাত্রা অর্থাৎ সাড়ে তিন মাত্রা হইবে।

আর পক্ষান্তরে প্রত্যাহার (ইণ্) গ্রহণে, তিন ('ইণঃ'এর ইকারে এক মাত্রা, 'ণ'কারে অর্দ্ধ, 'অ'কারে এক এবং বিসর্গে অর্দ্ধ মাত্রা, এই সমুদায়ে তিন মাত্রা) হইবে। সুতরাং উহা, এইরূপ লঘুতর প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও যে, গুরুতর যত্ন আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আচার্য্য ইহাই জানাইতেছেন যে, 'ইণ্' গ্রহণ পরের 'ণ'কারের সহিতই হইবে, পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত নহে।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনর্বর্ণোৎসত্তাবিবারং 'ণ'কারো দ্বিরনুবধ্যতে। এতজ্ জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ভবত্যেষা পরিভাষা ব্যাখ্যানতোবিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহা-দলক্ষণমিতি। অণুদিৎসবর্ণং পরেণাণ পূর্ব্বেণাণ্ গ্রহণং পরেণেণ্ গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—পুনঃ বক্তব্য এই যে, অন্য দুইটী অসমান বর্ণ কি উৎসর্গের ন্যায়ই হইয়াছিল যে, এই 'ণ'কারটাকেই কেবল দুইবার অনুবন্ধ (লোপ)-বিশিষ্ট করা হইয়াছে ?

আচার্য্য পাণিনি এইটী জানাইতেছেন যে, "ব্যাখ্যান দ্বারা কোন সূত্রের বা বিষয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি (ব্যুৎপত্তি) হইয়া থাকে ; সন্দেহ হইলেই যে অলক্ষণ হইবে, তাহা নহে," (১) এইরূপ পরিভাষা হইবে। অতএব আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিব যে, "অণুদিৎ সবর্ণস্যচাপ্রত্যয়ঃ" এই সূত্রের 'অণ' ভিন্ন যাবতীয় 'অণ্' প্রত্যাহার, পূর্ব্বের 'ণ কারের সহিত গ্রহণ হইবে, আর যাবতীয় 'ইণ' প্রত্যাহার, পরের 'ণ'কারের সহিতই হইবে।

সূত্রমূলম্।—ঞ ম ঙ ণ ন্। ৭। ঝ ভ ঞ্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যমূল।—কিমর্থমিমৌ মুখনাসিকাবচনাবুভাবনুবধ্যেতে। ন ঞকার এবানুবধ্যেত।

(১) পূর্ব্বে অন্যান্য দেব ঋষিকৃত ব্যাকরণে যাহা প্রসিদ্ধ ছিল, এবং পাণিনি যাহা জ্ঞাপক নিয়ম দ্বারা সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভাষ্যকার পতঞ্জলি, স্বকীয় মহাভাষ্যে সুন্দর সুস্পষ্ট সুশৃঙ্খলরূপে, পরিভাষাকারে সন্নিবেশ করিয়া-ছেন। তাহারই প্রথম পরিভাষা এই যে,—"ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্।" এই পরিভাষা নাগেশভট্ট, তদীয় পরিভাষেন্দুশেখরে, বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যানুবাদ।—এই পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রে, এই ('ম্' এবং 'ঞ্') দুইটী মুখ-নাসিকাবচন (অনুনাসিক বর্ণ), অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হইয়াছে; কেনইবা কেবল-মাত্র পরসূত্রস্থ (ঝ ভ ঞ্) ঞকারটীই অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হয় নাই?

ভাষ্যমূল।—যানি মকারেণ প্রত্যাহারগ্রহণানি হলো যমাং যমি লোপ ইতি। সন্তু ঞকারেণ। হলো যঞাং যঞি লোপ ইতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারপরয়োরপি ঝকারভকারয়োর্লোপঃ প্রসজ্যেত। ন ঝকারভকারৌ ঝকারভকারপরৌ স্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি একমাত্র পরের 'ঞ'ই অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হয়, তবে 'ম'কারের সহিত, "হলো যমাং যমি লোপঃ"(১) প্রভৃতি সূত্রে, যে সকল প্রত্যাহার করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

কেন, হউক না সেখানেও 'ঞ'কারের সহিতই প্রত্যাহার, "হলো যঞাং যঞি লোপঃ" এইরূপই সূত্র হইবে?

এইরূপ হইতে পারে না। (তাহা হইলে) ঝকার ভকার পরে থাকিলেও ঝকার ভকারের (অসঙ্গত রূপে) লোপ প্রসঙ্গ হইবে?

তাহাও হইবে না, যেহেতু, ঝকার এবং ভকার, ঝকার এবং ভকারান্ত শব্দের পরে কুত্রাপি নাই। সুতরাং কেবলমাত্র 'ঞ'কে অনুবন্ধ করিলে, এ স্থলে কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—কথং পুমঃ খয্যম্পর ইতি। এতদপ্যস্তু ঞকারেণ পুমঃ খয্যঞ্পর ইতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারপরেহপি হি খয়ি রুঃ প্রসজ্যেত। ন ঝকারভকারপরঃ খয়স্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—"পুমঃ খয্যম্পরে" ।৮।৩।৬। (অম্ পরে আছে এমন খয্ পরে থাকিলে, পুম্ শব্দের স্থানে রু হয় অর্থাৎ 'ম'কার স্থানে রু হয়) এই সূত্রে, 'অম্' প্রত্যাহার কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

ইহাও ঞকারেরই সহিত প্রত্যাহার হউক, "পুমঃ খয্যঞ্পরে" এইরূপ সূত্র হইবে।

এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে 'ঝ'কার এবং 'ভ'কার পরে আছে, এমন 'খয্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও (অসঙ্গত রূপে) 'রু' প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইবে।

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

হইলই বা তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ 'ঋ'কার কিম্বা 'ভ'কার পরে আছে, এমন 'খয়্' প্রত্যাহারান্তর্গত কোন বর্ণ নাই। সুতরাং এ স্থলে 'ঙু'র প্রসঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যমূল।—কথং ঙমোহ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যমিতি। এতদপ্যস্তু ঞকারেণ ঙঞো হ্রস্বাদচি ঙঞুণ্নিত্যমিতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারয়োরপি হি পদান্তয়োর্ঝকারভকারাবাগমৌ স্যাতাম্। ন ঝকারভকারৌ পদান্তৌ স্তঃ। এবমপি পঞ্চাগমাস্ত্রয় আগমিনো বৈষম্যাৎ সংখ্যাতানুদেশোন প্রাপ্নোতি। সন্তু তাবদ্যেষামাগমানামাগমিনঃ সন্তি। ঝকারভকারৌ পদান্তৌ ন স্ত ইতি কৃত্বা আগমাবপি ন ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি 'ম্'কার অনুবন্ধ না করা যায়, তবে "ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্ ।৮।৩।৩২।' (হ্রস্বের পরে যে 'ঙম্', সেই 'ঙম্' অন্তে আছে এমন যে পদ, তাহার পরস্থিত অচের, নিত্য 'ঙমুট্' আগম হয়, যথা,—সুগণ্ণীশঃ) সূত্রে, 'ঙম্'এর গ্রহণ কিরূপে হইবে?

কেন; এখানেও পরবর্ত্তী 'ঞ'কারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে। আর 'ঙঞো হ্রস্বাদচি ঙঞুণ্নিত্যম্' এইরূপ সূত্র হইবে।

এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পদান্তস্থিত ঝকার এবং ভকার আগম হইতে থাকিবে।

তাহা হইবে না; কারণ পদের অন্তে ঝকার কিম্বা ভকার, কুত্রাপি নাই।

এইরূপ করিলেও পাঁচটী বর্ণের আগম হইবে, (ঙ, ণ, ন, ঝ, ভ), আর আগমী হইবে তিনটী (ঙ, ণ, ন,); সুতরাং সমান বর্ণ না হওয়াতে, বৈষম্য হেতু, "যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্ ।১।৩।১০। (১) সূত্রানুসারে, সমানসংখ্যক (আগমাদি) আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা?

হউক না কেন সেইরূপ, যে সকল আগমবিশিষ্ট বর্ণের আগমী বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাদিগেরই আগম প্রাপ্ত হইবে। ঝকার এবং ভকার পদান্তবিশিষ্ট নাই, এই করিয়াই ঝকার এবং ভকারের আগমও হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অথ কিমিদমক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎ। ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরম্। অশ্নোতের্বা সরোহক্ষরম্। অশ্নোতে-

(১) সমানসম্বন্ধীয় যে বিধি, তাহা যথাসংখ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ যে যে বর্ণ স্থানে যে যে বর্ণ আদেশ হইবে, তাহাদের উভয় পক্ষের সম্বন্ধই যদি সমান হয়, তবে সমানসংখ্যক আদেশ বা আগমাদিবিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

র্বা পুনরস্নমৌণাদিকঃ সরন্ প্রত্যয়ঃ। বর্ণং বাহুঃ পূর্ব্ব সূত্রে বা অথবা পূর্ব্ব-সূত্রে বর্ণস্যাক্ষরমিতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এই বিচার্য্য হইতেছে যে, যে সকল অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে বা হইবে, সেই অক্ষর কাহাকে বলে ?

যাহার ক্ষর অর্থাৎ বিনাশ নাই, তাহাকে 'অক্ষর' বলিয়া জানিবে বা।

যাহা ক্ষয় হয়না অথবা ক্ষরণ (ভ্রষ্ট) হয়না, তাহাকে 'অক্ষর' বলে।

অথবা অশ্ (ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ, স্বাদিগণীয়) ধাতুর উত্তর সরন্ প্রত্যয় করিয়া 'অক্ষর' হইয়াছে।

অথবা পক্ষান্তরে অশ্‌ধাতুর ব্যাপ্তি অর্থে ঔণাদিক সরন্ প্রত্যয় করিয়া, অশ্নুতে অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় সর্ব্বত্র যাহা, তাহাই 'অক্ষর'।

কিংবা পূর্ব্ব সূত্রে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাকরণে বর্ণকে অক্ষর বলা হইয়াছে।

অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব (ব্যাকরণস্থিত) সূত্রে, বর্ণেরই অক্ষর সংজ্ঞা করা হইয়াছে। (এখানে তাহাও স্বীকৃত হইতেছে)।

ভাষ্যমূল।—কিমর্থমুপদিশ্যতে। বা

অথ কিমর্থমুপদেশঃ ক্রিয়তে। বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তদর্থমিষ্টবুদ্ধ্যর্থং লঘ্বর্থঞ্চোপদিশ্যতে ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কিজন্য উপদেশ করা হইয়াছে ?

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, অক্ষরসমূহ, বৈয়াকরণগণ কর্ত্তৃক, কেন ব্যাকরণে উপদেশ করা হইয়াছে ?

বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরসমূহের জ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষরসমূহ মিলিত হইয়া যে বাক্য হইয়া থাকে, সেই বাক্যের এবং বাক্যের বিষয়সমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বাক্যের বিষয় স্বরূপ শাস্ত্রের জ্ঞান হয় ; যে বাক্যে (পদে), ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তজ্জন্য অর্থাৎ শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য, ইষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ অভীপ্সিত পদ পদার্থ জ্ঞান হওয়ার জন্য এবং লঘু উপায়ে, অর্থ বোধ হইবার জন্য, বর্ণসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল। সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্র-তারকবৎপ্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ। সর্ব্ববেদপুণ্যফলাবাপ্তিশ্চাস্য জ্ঞানে ভবতি। মাতাপিতরৌ চাস্য স্বর্গে লোকে মহীয়েতে ॥

ইতি শ্রীমদ্ ভগবৎ পতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে দ্বিতীয়মাহ্নিকম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে অক্ষরের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সেই যে এই অক্ষরসমাম্নায় এবং বাক্‌সমাম্নায়, তাহা ব্যাকরণ দ্বারা সূত্রাবদ্ধ করায়, পুষ্পিত অর্থাৎ পুষ্প যেমন শোভা সুগন্ধি দ্বারা লোকের নিকট মনোহর হয়, সেইরূপ মনোহর। ফলিত অর্থাৎ পুষ্প যেমন পরিণামে শোভা সুগন্ধি পরিত্যাগ করিয়া জীব-ভোগ-পুষ্টিকর-ফলাকার ধারণ করে, সেইরূপ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রদ্বারা শব্দের তাৎপর্য্য জ্ঞান হইলে, আর পদলালিত্যের দিকে দৃষ্টি না থাকিয়া চরমলক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং বিমল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হইতে থাকে। চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রতিমণ্ডিত অর্থাৎ চন্দ্র এবং তারকাসমূহ যেমন অনাদি কাল হইতে প্রতিকল্পেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, বাক্‌ব্যবহারও সেইরূপ অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। আর সেই বর্ণসমূহেই বেদমন্ত্রসমূহ রহিয়াছে বলিয়া, সেই বর্ণসমূহকেই 'বেদরাশি' জানিতে হইবে।

যে হেতু বর্ণসমূহের সমষ্টিই বেদ, সেই হেতু সর্ব্ববেদ অধ্যয়নজনিত পুণ্যফলও কেবলমাত্র এই বর্ণের জ্ঞানেই হইয়া থাকে। আর উহার (বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির) মাতা পিতাও স্বর্গলোকে পূজিত হন ॥

শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতব্যাকরণমহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় আহ্নিক সম্পূর্ণ।

বৃদ্ধিরাদৈচ্‌ ॥ ১ ॥

বৃদ্ধিঃ। ১। আৎ। ১। ঐচ্‌। ১।

সূত্রানুবাদ।—আৎ অর্থাৎ আকার এবং ঐচ্‌ অর্থাৎ ঐকার, ঔকারের, বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

ভাষ্যমূল।—কুত্বং কস্মান্ন ভবতি। চোঃ কুঃ পদস্যেতি। ভত্বাৎ। কথং ভসংজ্ঞা। অয়স্ময়াদীনি ছন্দসীতি। ছন্দসীত্যুচ্যতে। ন চেদং ছন্দঃ। ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি। যদি ভসংজ্ঞা বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্‌ গুণ ইতি জশ্‌ত্বমপি ন প্রাপ্নোতি। উভয়সংজ্ঞান্যপি ছন্দাংসি দৃশ্যন্তে। তদ্যথা। স সুষ্টুভা স ঋকতা গণেন। পদত্বাৎ কুত্বম্‌। ভত্বাৎ জশ্‌ত্বং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্‌,' এই সূত্রের অন্তবর্ণ 'চ' কারের স্থানে, কুত্ব (কবর্গ) অর্থাৎ 'ক'কার কিংবা 'গ'কার কেন হয় না? চোঃ কুঃ। ৮। ২

৬০। (চবর্গস্থানে কবর্গ হয়, ঝল্ পরে থাকিলে কিংবা পদান্তে বর্ত্তমান থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'আদৈচ্' এর 'চ' কার ত পদের অন্তস্থিতই হইয়াছে ?

এই স্থলে, 'চ' কারের ভসংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া, পদসংজ্ঞার অভাব প্রযুক্তই কবর্গ হইবেনা।

কি প্রকারে 'চ' কারের 'ভ' সংজ্ঞা হইল ? (১)

অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি। ১।৪।২০। (অয়স্ময়াদিগণপঠিত শব্দ, বেদে ভসংজ্ঞা হইয়া থাকে।) এই সূত্রানুসারে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের 'চ'কারও 'ভ'-সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়াছে।

তাহা কিরূপে হইল ? কারণ, 'অয়স্ময়াদীনি' সূত্রে ত 'ছন্দসি' অর্থাৎ বেদে 'ভ' সংজ্ঞা হয়, এই কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ত বেদ নহে ?

সূত্রসমূহও ছন্দ অর্থাৎ বেদের ন্যায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদে যে সমস্ত পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে, সূত্রসমূহেও সেই সমস্ত পদ প্রাপ্ত হয়, এবং এইজন্যই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বেদের ন্যায়, 'ভ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল বলিয়া ক-বর্গ হইল না।

যদি 'ভ' সংজ্ঞাই হইল, তবে 'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ' এই দুই সূত্র, যেখানে একত্রীকৃত করিয়া পাঠ করা হইয়াছে, সেখানেও 'চ' কার স্থানে জকার হইবেনা (১), কারণ, ঝলের স্থানে জশ্ও পদান্ত হইলেই হয়। যেহেতু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের চকার পদান্ত হয় নাই, 'ভ' সংজ্ঞা হওয়াতে, সেই হেতুই জশ্ত্বও প্রাপ্তি হইবেনা, সুতরাং 'চ' স্থানে 'জ'ও হইবে না।

কেন হইবেনা ? যেহেতু, ছন্দসমূহ উভয় (পদ ও ভ) সংজ্ঞাবিশিষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, ছন্দে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় যে, "স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন" এই মন্ত্রে 'ঋচ্' শব্দের 'চ'কার, পদত্ব মানিয়া "চোঃ কুঃ" সূত্রানুসারে, 'ক'কার হইয়াছে, কিন্তু সেই 'ক'কার, পুনঃ 'ভত্ব' মানিয়া 'জশ্ত্ব' (গকার) হয় নাই। সেইরূপ এই (বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ) স্থানেও পদত্ব মানিয়া 'জশ্ত্ব' (চকার স্থানে জকার) হইয়াছে; কিন্তু 'ভত্ব' মানিয়া 'চ'বর্গ স্থলে 'ক'বর্গ (চ স্থানে ক) হইবে না।

(১) ঝলাং জশোঽন্তে। ৮।২।৩৯। পদান্তে বর্ত্তমান 'ঝল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার স্থানে 'জশ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ হয়। যেমন,— বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ, সেইরূপ, আদৈচ্ + অদেঙ = আদৈজদেঙ্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, কালী,* শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার ইত্যাদির কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক; ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে।

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল, শারদীয়া দুর্গা-পূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন, কেননা, তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া—কণ্ঠদেশে Cancer। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমার-বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী কাঞ্চন-ত্যাগ পথ-প্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুক কৃপাসিন্ধু। দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাঁহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, 'আর কাহারো সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবে।'

* কালী—এখন আমেরিকায় আছেন। আর একটী অন্তরঙ্গ—শরৎ। তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্ম মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। অসুখটা খুব হাল্‌কা হ'য়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে? তা' হ'লে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব'ল্‌বো. তিনি যা ভাল হয়, তাই ব'ল্‌বেন্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, পূর্ণ * দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্চে।

মাষ্টার (কালীর প্রতি)। কালী বাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্‌তে।

কালী। এই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ডাক্তারের ছেলেটী বেশ। একবার আস্‌তে বোলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দু এক জন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা কচ্ছিলাম, দশটায় আস্‌বে বলে, দেড়ঘণ্টা ব'সে। ভাব্‌লুম, কেমন আছেন, কি হ'লো!

ডাক্তার (বন্ধুর প্রতি)। ওহে, সেই গানটা গাওত।

বন্ধু গাইলেন,—

> কর তাঁর নাম গান,
> যত দিন রহে দেহে প্রাণ।

যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ করে হে আলো;

---

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। ঠাকুরের আর একটী অন্তরঙ্গ।

স্রোত বহে প্রেমপীযূষবারি, সকল জীবসুখকারী হে।

করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্য বলিতে কি পারি;

যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।

উচ্চে, নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে;

অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,

এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,

নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ ক্লেশ হে।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। গানটী খুব ভাল নয়? ঐ খানটী কেমন? "অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর, ই সদা সবে জিজ্ঞাসে।"

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার, খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার। (সস্নেহে) অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছো ত? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী কর্‌তে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি।

মাষ্টার। তা বেশ মহাশয়!

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এখানেই হ'ক, আর সেখানেই হ'ক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খাবে।

মা কালীর কথা পড়িল।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের উচ্চহাস্য)।

মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম। (মাষ্টারের হাস্য)

পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতে লাগিল।

ডাক্তার। ভাব ত দেখ্‌লুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তাহা বেশী হলেও কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতিঃ! ও যে reflected light!

মাষ্টার। পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুব্‌লে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুব্‌লে মানুষের অনিষ্ট হয় না, বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দুচারিটী রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ডাক্তার, চক্রবর্ত্তীর 'অহঙ্কার' এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে, অহঙ্কার কিছু দিনের মধ্যে আর থাক্‌বে না। তাঁর কাছে বস্‌লে জাবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়ীতে। যখন বিদায় লন রাত তখন ৮।৯টা হবে। বিদ্যাসাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে নিজে এক একবার বাতি ধরে এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোড় করে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি রকম মত?

মাষ্টার। সে দিন খুব ভক্তি করেছিলেন। তবে কথা কয়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাবটাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আপনারি মতের মত।

ডাক্তার। হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও সব ভালবাসি না। মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি সেই সে দিন আপনাকে বলছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়রে দিঘী বড়, তাতে হাতী নাম্‌লে জল বেশী নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নাম্‌লে তার কিছু কর্‌তে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা।'

ডাক্তার। I don't deserve the compliment. ভাব আর কি?

feelings—ভক্তি আরও অন্যান্য feelings. বেশী হলে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার। Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম করে—কেউ পারে না, কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিসটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখ্‌লাম। Stebbing বলেন, human mind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক্ বা ঈশ্বর আলাহিদা বসে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful তিনি একটী বেশ উপমা দিয়েছেন—theory of light. "Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful."

ডাক্তার। হাঁ; আর দেখেছো, Stebbing, Darwinism মানে, আবার Godও মানে!

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংসদেব) দেখ্‌ছি কালীরই উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁকে পরব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীষ্টান যাঁকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

"তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটী গামলা ছিল, তাতে রং ছিল। কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হলে তার কাছে কাপড় ছোপাতে যেতো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কর্‌তো, 'তুমি কি রঙ্গে ছোপাতে চাও?' লোকটী যদি বল্‌তো, সবুজ রং, তা হলে কাপড়খানি গামলার রঙ্গে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত, ও বল্‌তো, 'এই নাও তোমার সবুজ রঙ্গে ছোপান কাপড়!' যদি কেহ বল্‌তো, লাল রং, তা হলে সেই এক গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লালে ছোপান কাপড়।' সেই এক গামলার রঙে সবুজ, লাল, নীল, হলদে সব রঙের কাপড় ছোপান হোতো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক বল্লে, বাবু, আমি কি রং চাই বল্‌বো? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রং দাও। (সকলের হাস্য) সেইরূপ পরম-

হংসদেবের ভিতর সব ভাব আছে, সব ধর্ম্মের সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝ্‌বে?

ডাক্তার। All things to all men! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার। পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝ্‌বে? তাঁর মুখে শুনেছি, সূতার ব্যবসা না কর্‌লে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বোঝা যায় না। Painter না হলে painter এর art বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীরভাব। Christ এর ন্যায় না হলে Christ এর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা বলেছিলেন তাই, 'Be perfect as your Father in heaven is perfect'.

* * * * * *

ডাক্তার। আচ্ছা, তাঁর অসুখের তাদারক তোমরা কিরূপ কর?

মাষ্টার। প্রত্যহ এক একজন superintend করেন, যাঁদের বয়স বেশী। কোন দিন গিরীশবাবু, কোন দিন রামবাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালীবাবু, এই রকম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা হইয়াছে। দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছে। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ বেশ ভাল আছি।'

ক্রমে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

(পণ্ডিত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে! ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা কর্‌লে আমার একটী অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হলে তাকে খড় কুটো মনে হয়।

"বামনারাণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিল, হঠাৎ সেই অবস্থাটা হলো। তার পর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি বল্‌ছো, তাঁকে তর্ক করে কি বুঝ্‌বে, তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝ্‌বে! তোমার তো জা'র তেঁতে বুদ্ধি।' আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমার পা টিপ্‌তে লাগ্‌লো।

ডাক্তার। বামনারাণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়। সত্য হিন্দু কি না।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) ডাক্তার কিন্তু 'শাঁক ঘণ্টার নাই'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের * সঙ্গে দেখা হয়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন'! এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হলো। বল্লুম যে, 'তোমার এ কি রকম কথা! তুমিতো বড় ছ্যাঁচড়া। যা সব রাত দিন চিন্তা ক'র্‌ছো আর কাযে কর্‌ছো, তাই তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে।' তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হলো, ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হলো। আমি আবার নাচ্‌লুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন! আমি বল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখ্‌বেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? 'গোপাল, গোপাল', যা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার। 'গোপাল', 'গোপাল' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) একটী স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত। পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে হরিনামের মালা। সকলে

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যের সহিত বেনেটোলার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত ৺অধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে এই একবার দর্শন করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস কোরে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে পরম ভক্ত, এরা কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখ্ত, কোন কারিগর বল্‌ছে, 'কেশব', 'কেশব'! আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম কর্‌ছে 'গোপাল, 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বল্‌ছে, 'হরি', 'হরি', 'হরি,' তার পর কেউ বল্‌ছে, 'হর', 'হর!' কাযে কাযেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে কর্‌তো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বল্লে, কেশব! কেশব,' তার মনের ভাব 'এ সব (খদ্দের) কে?' যে বল্লে, 'গোপাল' 'গোপাল', তার অর্থ এই যে, আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, এরা গরুর পাল, গরুর পাল (সকলের হাস্য)। যে বল্লে, 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে, 'যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি' (সকলের হাস্য)। যে বল্লে, হর', 'হর'—তার মানে এই যে তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল। (সকলের হাস্য)।

"সেজো বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু (সকলের হাস্য।) তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলে বল্লে, 'মহাশয়! আগে যা পড়েছি, সে সব পড়া বিদ্যা, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে, সব থু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে!' তাই বল্‌ছি, বই পড়্‌লে পণ্ডিত হয় না।

[ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আর জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে, 'রামে রাম,' 'রামে রাম' এই সব বল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে আসে, এমন সময়ে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

"ছেলে বেলাই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ১১ বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখ্‌লুম। সব্বাই বলে, বেহুঁস হয়ে গিছ্‌লুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যখন ঠাকুর পূজা কর্‌তে যেতুম, হাতটা

অনেক সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্‌তো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা থাকতো, সে আমার কাছে আস্‌তো না, বল্‌তো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[Free will or God's will ?]

('যন্ত্রারূঢ়')

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, মা আমি যন্ত্র- তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর—তুমি ঘরণী, আমি রথ—তুমি রথী, যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি, নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্রধার কলসী নিয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগ্‌ল, বলে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বল্লেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসীমাত্র। আমি ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, কিন্তু এদিকে তো এত বিজয়কে ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি।

ডাক্তার। তার পর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)। আমি কি কর্‌বো? সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুঁস হয়ে যাই। নিজে কি করি, কিছুই জান্‌তে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় কর্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু কর্‌তে পারি? তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর, তা হলে তোমার Science সায়েন্‌স সব ছাই পড়েছ।

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হলে কি এত আসি? এই দেখ, সব কায ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, আর এখানে এসে ছয়ঘণ্টা সাতঘণ্টা ধরে থাকি।

['ন যোৎস্যে'—ভগবদ্গীতা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে কোরো না, তুমি

একটা বড় মানুষ, আমায় মানছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটী কথা আছে,—মানুষ কি ক'র্‌বে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো।

ডাক্তার (excited)। তুমি কি মনে কর্‌ছো, অমুক সাড' তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মান্‌বো? অমুক সাডকে আমি কি মানি? একজন ক্যাপ্টেন্ মেনেছে বলে আমিও পায়ে পড়্‌বো? তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি মানতে বলেছি গা?

গিরীশ ঘোষ। উনি কি আপনাকে মানতে বলেছেন?

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কি বল্‌ছো, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি বল্‌ছি। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি কর্‌বে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বল্লেন, আমি যুদ্ধ করতে পার্‌বো না, জ্ঞাতিবধ করা আমার কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ বল্লেন, অর্জ্জুন! তোমার যুদ্ধ কর্‌তেই হইবে। কৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে রয়েছে!*

"শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল—তাদের মতে অশ্বত্থগাছে যে পাতা নড়্‌ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটী পাতাও নড়্‌বার যো নাই।

[LIBERTY OR NECESSITY ; FREE WILL OR GOD'S WILL ?]

ডাক্তার। যদি সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলাচ্চেন, তাই বলি। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার। যন্ত্র তো বল্‌ছো, হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো, সবই ঈশ্বর।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই যা মনে করেন, করুন। কিন্তু তিনি করান তাই করি—a single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

---

* ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।

(INFLUENCE OF MOTIVES)

ডাক্তার। Free Will তিনিই দিয়েছেন ত। আমি মনে কর্‌লে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে পারি, আবার না কর্‌লে না কর্‌তে পারি।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকার্য ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার। কেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে কর—

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে ভাল লাগে বলে।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) মনে কর, একটী ছেলে পুড়ে যাচ্চে, তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্যবোধে—

গিরীশ। ছেলেটীকে বাঁচাতে আপনার আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান, আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া (সকলের হাস্য)।

('জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা')

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম করতে গেলে আগে একটী বিশ্বাস চাই,—সেই সঙ্গে জিনিসটী মনে করে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কার্যে প্রবৃত্ত হয়। মাটীর নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই, ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তার পর খুঁড়ে। খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তার পর ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকমে ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে, আর সাজ্‌তে সাজ্‌তে আনন্দ।

ডাক্তার। কিন্তু আগুন heatও (উত্তাপও) দেয়, আর lightও (আলোও) দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) কর্‌তে গেলে কেবল যে আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়! Duty (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন?

গিরীশ। তবে সরস (সকলের হাস্ত)।

মাষ্টার। বেশ dilemma, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়্লো।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) সরস—নচেৎ duty কেন করবেন ?

ডাক্তার। এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পোড়া স্বভাবে টানে। (হাস্ত)। যদি inclinationই হলো, তবে free will কোথায় ?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একবারে বল্‌ছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদুর যায়, তার ভিতর free। দড়ি টান্ পড়্‌লে আবার—

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও বলেছিল। (ছোট নরেনের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে ?

(ডাক্তারের প্রতি) "দেখ, ঈশ্বর সব করছেন, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সেতো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো ? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছো, আলু, বেগুন সব তাতে দিয়েছ ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান ক'রছে, আমি নড়্‌ছি, আমি লাফাচ্চি। ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্চে না ; হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান, জ্বলন্ত কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়েনা চড়েনা।

"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয় ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাক্‌বে ; ততক্ষণ আমি সৎ কায করেছি, আমি অসৎ কায করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্ত বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় কর্‌লে, সৎপথ ধর্‌লে, তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। 'তিনি একমাত্র

কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা,' এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত। একথা আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) Free Will কেমন করে আপনি জান্‌লেন?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it।

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি, আমরা বোধ করি যে, আমরা পরতন্ত্র) (সকলের হাস্য)।

* * * * * *

ডাক্তার। Dutyর ভিতর দুটো element আছে,—(১) Duty বোলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stageএ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেবেলায় দেখ্‌তুম, পুরুত সন্দেশে পিঁপড়ে হলে বড় ভাবিত হতো। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা করে আনন্দ হয় না—(হাস্য) প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে আনন্দ হয়, বলা বড় কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায় থাকে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[অহৈতুকী ভক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (ডাক্তার) যা বল্‌ছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। 'মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, তবু মহেন্দ্র সরকারকে দেখ্‌তে ভাল লাগে'—এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয়, তা কি কর্‌বো?

"অহল্যা বলেছিলেন, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না।

"নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব কর্‌তে

লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, নারদ! 'আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও।' নারদ বল্লেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোরো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' রাম বল্লেন, 'আর কিছু বর লও।' নারদ বল্লেন, আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে 'শুদ্ধাভক্তি।'

"এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখ্‌তে চায়, আর কিছু—ধন, মান, দেহসুখ—চায় না। এর নাম শুদ্ধাভক্তি।

"আনন্দ একটু হয় বটে কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম—তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও, তাই আস,—ঐটুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে। বালকের মত যাচ্চে, কোন ঠিক নাই, হয় তো একটা ফড়িঙ ধরছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছো? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কার্যে মতি না হয়।

"আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি মা মা বলে এমন কাঁদ্‌তুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বাড়বার* জন্য আর আমার 'পাগলামি' সারবার জন্য তারা একজন খাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর, চোক ভাল। আমি মা মা বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লুম, 'দাদা, দেখবে এসো, ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে, আর সব লোককে বলে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা বলে কাঁদ্‌তুম, কেঁদে কেঁদে বল্‌তুম, মা! রক্ষা কর, মা! আমায় নিখাদ কর, মা, যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।

(ডাক্তারের প্রতি)। তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব। নিষ্কামকর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা

---

* বাড়বার—অর্থাৎ পরীক্ষা করবার।

করে, তার, আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায়। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম কর্‌তে চেষ্টা করলে শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশান সত্ত্ব গুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার কর্‌বো, এই অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই—একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম কর্‌তে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না! বড় কঠিন।

সকলেরই কর্ম্ম করতে হবে; দু একটী লোক কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে পারে। দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে রজোমিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ হয়।

সাধারণ লোকে এই শুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না; হেম আমায় বলেছিল, 'কেমন ভট্টাচায্য মহাশয়, জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। কেমন ?'

কামিনীকাঞ্চন ও ভক্তিবিশ্বাস।

(স্বামী ত্রিগুণাতীত।)

সাংসারিক পরিচয়ে কামিনীকাঞ্চনের প্রাধান্য; পারমার্থিকে, ভক্তি-বিশ্বাসের বিশেষ প্রাধান্য। পারমার্থিক পরিচয়ে কামিনীকাঞ্চন কোনও মতেই উল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; সাংসারিক পরিচয়ে ভক্তিবিশ্বাসের উল্লেখ কিছু যে নিন্দনীয় তাহা নহে। ইহার পরিচয় দুই দিনের জন্য এবং দু-দশ জনের নিকট, কিন্তু উহার পরিচয় অনন্তকালের জন্য এবং সর্ব্বত্র। কামিনীকাঞ্চনের সামর্থ্য অতি সামান্য; ভক্তিবিশ্বাসের বল অসীম। কামিনী-কাঞ্চনের ধর্ম্ম চঞ্চল, ভক্তিবিশ্বাসের ধর্ম্ম স্থির। কামিনীকাঞ্চনের অসদ্ব্যব-হারই প্রায় সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য, সদ্ব্যবহার খুবই কম, ভক্তি-বিশ্বাসে অসদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা কুত্রাপি কিছুই নাই, সদ্ব্যবহারই সমস্ত। একে, প্রায়ই নরকগামী করায়; অপরে নিশ্চয়ই মোক্ষধামে লইয়া যায়। একটী যেন দানবের সৃষ্ট, অপরটী ("যেন" নয়,) সত্যই ঈশ্বরের প্রদত্ত। একটী, সম্রাটকেও পথের ভিখারী করিতে পারে, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীকেও রসাতলে প্রেরণ করিতে

পারে। অপরটী, অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যকেও সেই জগদীশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় করাইতে পারে ; এবং চাই কি, এই মর্ত্ত্যেই স্বর্গধাম আনয়ন করিতে পারে। এখন, আপনার চাই কি ? কি চাই, বলুন। উইয়ের ঢিবির ন্যায় যদি মাটিতে মাটি মিশাইয়া দিতে চান, অগ্রেরটীকে গ্রহণ করুন। আর যদি ঐ অনন্ত আকাশের ন্যায় নিত্যে নিত্য স্থাপন দেখিতে চাহেন, পরবর্ত্তীর উপাসনা করুন। যদি বারুদের ঘরে প্রবেশ করিতে চান, যান- ঐ নরকের দ্বারস্বরূপ কামিনীকাঞ্চনের উপাসনা করুন, আর যদি মণিকোটায় বাস করিতে চান, আসুন—এই কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ভক্তি-বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করুন। যদি পুঁটী মাছের ন্যায় অল্পজলে ফর্‌-ফর্‌ করেন, যদি জোনাকের ন্যায় অতি ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র আলোক ভাল বাসেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রের চর্ম্মজালকে অতি স্পর্শপ্রিয় করুন, এই বাহ্যিক নেত্রদ্বয়কে বিস্ফারিত করুন, মানব-মস্তিষ্ককে আধুনিক ও পার্থিব জ্ঞানে পূর্ণ করুন, কিন্তু মনকে অভিমানাদির দ্বারা আরও সিক্ত করুন, কবিরা সকল সত্যের উপর যে আধ্যাত্মিক সত্য, সে সত্য জানিবার পথে কণ্টক দিয়া, সকল জ্ঞানের উপর যে আত্মজ্ঞান সেই জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, কামিনীকাঞ্চনের আভায় মুগ্ধ হউন। আর যদি বৃহৎ মৎস্যের ন্যায় অগাধ জলে গম্ভীরভাবে বিচরণ করা আপনার স্বভাব হয়, যদি আপনি কৌস্তুভমণির ন্যায় নিত্য ও স্থির আলোকপ্রিয় হন, তাহা হইলে পার্থিব ও চঞ্চল চর্ম্মসুখকে বিসর্জ্জন দিন, বহির্দৃষ্টির বোধ দ্বারা জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করুন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে আধ্যাত্মিক আলোচনা দ্বারা বর্দ্ধিত করুন, মলিন মনকে সদসৎ বিচারাদির দ্বারা মার্জ্জিত করুন, বরিয়া একমাত্র পরম সত্য-বস্তুর প্রয়াসী হইয়া ভক্তি-বিশ্বাসের মাহাত্ম্য আস্বাদন করুন। দেখুন, কামিনীকাঞ্চনরূপ মায়া ও মোহমদিরায় উন্মত্ত হইবেন ? না—ভক্তিবিশ্বাসরূপ আনন্দ ও অমৃতরসে বিহ্বল হইবেন ? যদি প্রথমটীর নিকটে যান, থাকুন এখানে, শোকে, তাপে, দুঃখে, পীড়ায়, চিন্তায়, নিরাশায় খাক হইয়া যাইতে থাকুন, অবশেষে জীবদ্দশায়ও, আপনার ভিতর আর কিছুই পদার্থ থাকিবে না ; সকলে তখন সাংঘাতিক ব্যারামগ্রস্ত ঘেটকের ন্যায় আপনাকে অতি অপদার্থ, নিষ্প্রয়োজনীয় এবং ত্যজ্য বলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয়টীকে গ্রহণ করেন, আসুন—শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়া বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান প্রভৃতিতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, উত্তরোত্তর পরমসুখী হউন, জীবদ্দশায় ত এইরূপ হইবেনই ; অবশেষে মরিয়া যাইলেও, কত লোকে এখানে (স্বর্গের কথা ত ছাড়িয়াই দিন) পুষ্পচন্দন লইয়া আপনার চিত্র পূজা করিবেন, এবং আপনাকে কেবলমাত্র স্মরণ করিয়াই জীবনে কত শান্তি লাভ করিবেন।

ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রমাণ? এস, উভয়ে যুদ্ধ করি—ইহাই প্রমাণ। দ্বৈতবাদ হইতে সমুদয় জগতে এই গোল আসিয়াছে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ সকলে না গিয়া প্রশান্ত উজ্জ্বল দিবালোকে আইস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? এই আলোকময় ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখে, ইহার প্রত্যেক বস্তু আমাদের। আপন বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখন এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবে তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলির মধ্যে তোমাদের সেই অংশটী অবশ্যই মনে আছে, তিনি কিরূপে উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, উপরে নিম্নে প্রেমচিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিলেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া গেল। যখন সেই ভাব তোমাদের আসিবে, তখনই তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আসিবে; সমুদয় জগৎ এক ব্যক্তি হইয়া গেল—তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের দিকে আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলিও তোমার, কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ উভয়ই। মানুষ—অনন্তস্বরূপ নির্গুণ মানুষও—আপনাকে সগুণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, এই ব্যাপার। আমরা আমাদের কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নিয়মকে পদদলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে? স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত স্বত্ব। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও। তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের ন্যায় অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেখ! দৃশ্য উভয় স্থলেই সমান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য! একজন ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া—আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ দারিদ্র্যকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই

পার্থক্য হয়? কারণ, একজন মুক্ত, অপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দরিদ্রতা সত্য নহে, ইহা কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্য অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক ব্যক্তি জানে, ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা,—তাহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এই দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেদ্য নিয়মস্বরূপ, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি,ততক্ষণ ভিক্ষুকমাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় জগৎ সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে কাল্পনিক জীবগণের নিকট পর্য্যন্ত সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কোন কালে এই সাহায্য আসিল না। তথাপি ভাবিতেছি এই বারে সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে লাগিল।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে, তোমরা সর্ব্বদাই বৃথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখন পাও নাই; যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ, তথাপি কি আশ্চর্য্য, তুমি সর্ব্বদাই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদিগের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে। দেখিবে, উহা সর্ব্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে দল রহিয়াছে, খানিক পরে আর সে দল নাই। সর্ব্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই তাহা করিতে পারে না। আমাদের জীবনও তদ্রূপ, কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাট্‌স্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়,' বলিয়া ঢুঁড়িয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ, তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহাচীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন

না, কারণ, তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা আর এই রাজার অন্বেষণ রূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই আমবা—সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারি। এই সব ভূতের ব্যাগার ছাড়িয়া দাও, দিয়া জগতে খেলা করিতে থাক।

তখন আমাদের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ জগৎ ক্রীড়াস্থানরূপে পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমর-গুঞ্জিত পূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বে এই জগৎ নরককুণ্ড ছিল, তখন তাহাই স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। বদ্ধের দৃষ্টিতে ইহা এক মহাযন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ, স্বর্গ অন্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্ব্বত্র বিরাজিত। পুনর্জ্জন্মাদি যাহা কিছু হয়, সবই এখানে হইয়া থাকে। দেবতারা সকলেই এখানে—তাঁহাবা মনুষ্যাদর্শের অনুসারে কল্পিত। দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্ম্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। কর্ম্মরূপ ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহাব চতুর্দ্দিকে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমবাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং ইহাই ইহার যথার্থ কার্য্যকারিতা। আমরা মুক্ত হইয়াছি বলিয়া উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে, সেই খানেই থাকিবে, তবে তফাত হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব্ব দৃশ্য সমস্তই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটী কেবল আমাদের প্রকৃতির এক দিক্, অপর দিকে মুক্তি সর্ব্বদা বিরাজিত, আর আমরা শীকারীর দ্বারা অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটীতে আমাদের মুখ লুকাইয়া আমাদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমবশতঃ আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে ভুলা যায় না—সর্ব্বদাই উহা কোন না কোন-রূপে আমাদের সমক্ষে আসিতেছে, আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জ্জগতে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়া

থাকি, এ সকল আর— কিছুই নয়, আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা বা কোন দেবতা হইতে উত্থিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদের ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থতঃ আমরা আত্মস্বরূপ আছি ও চিরকাল সেই আত্মস্বরূপ থাকিব। এক কথায়, বেদান্তের আদর্শ এই জগতে মনুষ্যোপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পার, তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই যে, যদি তুমি তোমার ভ্রাতা, যাহাকে তুমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাসিতে পার, তবে ঈশ্বর, যাঁহাকে কখন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভাল বাসিবে? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মনুষ্যমুখে না দেখিতে পার, তবে তাঁহাকে মেঘে, অথবা অন্য কোন মৃত জড়ে অথবা তোমার নিজ মাস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কিরূপে দেখিবে? যে দিন হইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলিব, আর তখনই তোমরা বুঝিবে, ডানগালে চড় মারিলে বাঁগাল তাহার সম্মুখে ফিরানোর অর্থ কি। যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে, তখন সকল বস্তু, এমন কি, ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তোমার কিছু ক্ষতিবোধ হইবে না। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা, বন্ধুস্বরূপ। আমাদের আপন আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানকে পিতা বলা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়সখা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আমার প্রেমাস্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্ব্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা মনে থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজায় ঘা মারিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল,

'কে ও?' তিনি বলিলেন, 'আমি।' আর কোন উত্তর আসিল না। দ্বিতীয় বার তিনি আসিলেন এবং উত্তর দিলেন, "আমি আসিয়াছি', কিন্তু দরজা খুলিল না। তৃতীয়বার আবার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও', তখন তিনি বলিলেন, 'প্রেমাস্পদ, আমি তুমিই'; তখন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ভগবান এবং আমাদের মধ্যেও তদ্রূপ। তুমি সকলেতে, তুমিই সকল। প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্তকালের জন্য বাস করিতেছি —সর্ব্বত্র অনন্তকালের জন্য জ্ঞাত, অনন্তকাল উপাসিত তোমাকে পাইয়াছি।

আর একটী কথা এই,—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভ্রমাত্মক নহে। এই বিষয়টী কোনমতে ভুলা উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে, (আমরা উহাদিগকে যতই অনুপযোগী মনে করি না কেন,) তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নহে। সত্য হইতে সত্যে ভ্রমণ, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ভ্রমণ। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে, অল্প আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে, অল্প ভালো; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প পবিত্রতা। অতএব সত্যধারণার ইহাও এক দিক্ যে, আমাদিগকে অপরকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরাও যে পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে, তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে, আর তুমি যখন মুক্তই হইলে, তখন তুমি, যাহা অনিত্য, তাহা দেখ কি করিয়া?.. যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিরূপে? কারণ, যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে কখনই উহা দেখিতে পাইতাম না। বেদান্তের ইহা একটী সাধনের দিক্। আশা করি, আমরা সকলে জীবনে ইহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য সারা জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচার আলোচনায় আমরা এই ফললাভ করিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পরিবর্ত্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কার্য্য করিব, কারণ, আমরা জানিলাম, সমুদয়ই আমাদের ভিতরে—উহা আমাদেরই রহিয়াছে. উহা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব। আমাদের আবশ্যক—কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষগোচর করা।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানারোহণন্যায়ে—ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্বে উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ তারা সকলি রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি।' এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না। সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটী সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য্য। প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানাবিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, 'এই সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্ম্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য, হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' তার পর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া একত্র করে, এবং এই বিভিন্ন মধুগণ যেমন জানে না যে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অতএব হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন জানে না, ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা তাহাই। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এক্ষণে কথা এই, সকল জ্ঞানলাভেরই দুইটী মূলসূত্র আছে। একটী সূত্র এই, বিশেষকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আবার সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে

সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্র এই, যে কোন বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব, সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রথম সূত্রটী ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটী কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখান যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত হই ও উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটী প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমরা অতৃপ্ত হই। কিন্তু যখন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্ম্ম আলোচনা করিতে গেলে, এবং উহাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিণত গেলেও আমাদিগকে সেই মূলসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ্, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথমে এই ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই, কিরূপে দেবগণ ক্রমশঃ একে লয় হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে তাঁহারা সূক্ষ্মতর ও অধিকতর ব্যাপী ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্ব্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইতেছেন, কিরূপে তথা হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণাত্মক সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই সকলের ভিতরই আমরা এই এক তত্ত্ব পাইতেছি যে, একটী বস্তু অপর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

সগুণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বে সমাধানও এই মূলসূত্রের আর একটী উদাহরণ। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্যীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটী শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা ত পর্য্যাপ্ত সামান্যীকরণ হইল না। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক্ অর্থাৎ

জ্ঞানের দিক্ লইলাম, তাহা হইতে আমরা সামান্যীকরণ প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকি প্রকৃতিটি সব বাদ গেল। সুতরাং, প্রথমতঃ, এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটী অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয়ত এক সময়ে ভাবিত, মাটীতে যে কোন পাথর পড়ে, তাহাই ভূতে ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা, আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়, কারণ একটী ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশস্থ কারণ হইতে, অপরটী বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক আর যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এক্ষণে 'সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা", এই তত্বটীকেও এই সূত্রটী দ্বারা পরীক্ষা করা যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দ্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে—তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকালই সগুণ ঈশ্বরবাদের এই থানে একটু গোল আছে—ইহাই ইহার দুর্ব্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল সেই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত। যিনি শূন্য হইতে এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন অথচ যিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এরূপ ঈশ্বরবাদে দুইটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ, ইহা সামান্যে সম্পূর্ণ সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাখ্যা নহে। উহা কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই মতের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে, কার্য্য কারণের রূপান্তরমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে আর আধুনিক সর্ব্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্য্যই এই যে, কার্য্য কারণের রূপান্তর মাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উপহাসের বিষয়।

ধর্ম্ম কি পূর্ব্বোক্ত দুইটী পরীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্ম্মমত থাকে, যাহা এই দুইটী পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্য হইবে। যদি পুরোহিত চর্চ্চ অথবা কোন শাস্ত্রের

ভাষ্যমূল।—কিংপুনরিদং তদ্ভাবিতগ্রহণং বৃদ্ধিরিত্যেবং যে আকারৈকারৌকারা ভাব্যন্তে তেষাং গ্রহণমাহোস্বিদাদৈজ্মাত্রস্য। কিং চাতঃ। যদি তদ্ভাবিতগ্রহণং শালীয়ো মালীয় ইতি বৃদ্ধলক্ষণশ্ছো ন প্রাপ্নোতি। আম্রময়ং শালময়ম্। বৃদ্ধলক্ষণো ময়ণ্ ন প্রাপ্নোতি। আম্রগুপ্তায়নিঃ শালগুপ্তায়নিঃ। বৃদ্ধলক্ষণঃ ফিঞ্ ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ। পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে,"বৃদ্ধিরাদৈচ্" সূত্রে, তদ্ভাবিত অর্থাৎ বৃদ্ধি করিবার পরে সেই বৃদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন যে বর্ণসমূহ, তাহাদেরই 'বৃদ্ধি' শব্দে গ্রহণ হইবে, অর্থাৎ অকার কিংবা ইকার উকারাদি স্থলে, বৃদ্ধি হইয়া যে সকল আকার ঐকার ঔকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই গ্রহণ হইবে অথবা আৎ ঐচ্ (আকার ঐকার ঔকার) মাত্রেরই গ্রহণ হইবে?

ইহা হইতে অর্থাৎ এইরূপে বিচার দ্বারা ফল কি?

ফল এই যে, যদি তদ্ভাবিত অর্থাৎ হ্রস্বাদিস্থানে বৃদ্ধি হইয়া উৎপন্ন বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ হয়, তবে শালীয় মালীয় প্রভৃতিস্থলে শালা এবং মালা শব্দের উত্তর আদি 'শ'কার এবং 'ম'কার স্থিত 'অচ্' অর্থাৎ আকারকে বৃদ্ধি মানিয়া (১) "বৃদ্ধাচ্ছঃ।" ৪।২।১১৪। (বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে 'ছ' প্রত্যয় হইবেনা; সুতরাং শালীয় মালীয় প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবেনা।

আম্রময় শালময় প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধসংজ্ঞাবিশিষ্ট আম্র এবং শাল শব্দের উত্তর "নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ।" ৪।৩।১৪৪। (বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের এবং শরাদিগণীয় শব্দের উত্তর নিত্য 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়) এইসূত্রানুসারে 'ময়ট্' প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে না, সুতরাং আম্রময় শালময় প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

তৃতীয়দোষ এই হইবে যে,'আম্রগুপ্তায়নিঃ','শালগুপ্তায়নিঃ'প্রভৃতি স্থলে বৃদ্ধলক্ষণীভূত আম্রগুপ্ত এবং শালগুপ্তশব্দের উত্তর"উদীচাংবৃদ্ধাদগোত্রাৎ।৪।১।১৫৩। (গোত্রসংজ্ঞকভিন্ন বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর উত্তরদেশীয় ঋষিগণের মতে ফিঞ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে ফিঞ্ প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে না, সুতরাং আম্রগুপ্তায়নি শালগুপ্তায়নি প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অথাদৈজ্মাত্রস্য গ্রহণম্। সার্বোভাসঃ সর্বভাস ইত্যাত্তব-

---

(১) বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্। ১।১।৭৩।" যে সকল শব্দের সমুদায় অচ্এর মধ্যে আদি অচ্ বৃদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের বৃদ্ধ সংজ্ঞা হয়।

পদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চেত্যেষ বিধিঃ প্রাপ্নোতি। ইহ তাবতী ভার্য্যা যস্য তাবদ্ভার্য্যঃ যাবদ্ভার্য্যঃ। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর (পূর্ব্বপক্ষে দোষ দেখিয়া) যদি আৎ এবং ঐচ্ অর্থাৎ আকার ও ঐকার ঔকার মাত্রেরই গ্রহণ করা হয় (বৃদ্ধিশব্দে গ্রহণ করা হয়)?

এইরূপ করিলে 'সর্ব্ব যে ভাস = সর্ব্বভাস' এইস্থলে সর্ব্ব শব্দের সহিত উত্তরপদবৃদ্ধিলক্ষণসম্পন্ন 'ভাস' শব্দের "উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চ" ৬।২।১০৫। (উত্তরপদবৃদ্ধিবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বশব্দ এবং দিক্ শব্দের অন্ত্য অচ উদাত্তস্বরবিশিষ্ট হয়) এইসূত্রানুসারে সর্ব্ব শব্দের অন্ত্য অকার উদাত্তস্বরবিশিষ্ট হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বিধেয় নহে।

আর তাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার, সে তাবদ্ভার্য্য (যাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার সে) যাবদ্ভার্য্য ইত্যাদি স্থলে তদ্ এবং যদ্ শব্দের উত্তর 'বতুপ্' প্রত্যয় (১) করিলে এবং সেই 'বতুপ্'কে নিমিত্ত করিয়া তদ্ এবং যদ্ শব্দের অকারের বৃদ্ধি করিয়া (২) তাবৎ এবং যাবৎ শব্দ হইলে এবং তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে তাবতী ও যাবতী শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলে অবশ্য প্রাপ্তব্য তাবদ্ভার্য্য যাবদ্ভার্য্য ইত্যাদি রূপ পুংবদ্ভাব; তাহার বাধক "বৃদ্ধি-নিমিত্তস্য চ তদ্ধিতস্যারক্তবিকারে।" ৬।৩।৩৯। (বৃদ্ধির নিমিত্ত যে অরক্তবিকার-স্থিত তদ্ধিত, তাহার অন্তস্থিত স্ত্রীলিঙ্গবাচকশব্দ পুংবদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গের ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট হয় না) এই সূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি আদৈজ্মাত্রস্য গ্রহণম্। নন্ু চোক্তং সর্ব্বো ভাসঃ সর্ব্বভাস ইত্যুত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বঞ্চেত্যেষ বিধিঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে উত্তরপদস্য বৃদ্ধিরুত্তরপদবৃদ্ধিরিতি। কথং তর্হি। উত্তর-পদেঽধিকারো বৃদ্ধিস্তস্মিন্নুত্তরপদে ইত্যেবমেতদ্বিজ্ঞায়তে। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। তদ্ধিতগ্রহণে সত্যপীহ প্রসজ্যেত। সর্ব্বঃ কারকঃ সর্ব্বকারক ইতি।

---

(১) যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। ৫।২।৩৯। যদ্, তদ্ এবং এতদ্ শব্দের উত্তর পরিমাণ অর্থে বতুপ্ প্রত্যয় হয়।

(২) আসর্ব্বনাম্নঃ। ৬।৩।৯১। সর্ব্বনাম শব্দের আকারান্ত আদেশ হয়, দৃগ্, দৃশ এবং বতুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

ভাষ্যানুবাদ।—যখন উত্তর পক্ষেই দোষ দেখা গেল, তখন এতৎপক্ষ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। হউক্ তবে আকার, ঐকার এবং ঔকার মাত্রেরই গ্রহণ। যদি বল যে, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, 'সর্ব্বো ভাসঃ' অর্থাৎ সর্ব্ব যে ভাস=সেই 'সর্ব্বভাস' এই স্থলে, 'উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চ (১) এইসূত্রানুসারে যে বিধি হইয়া থাকে (উদাত্তরূপ বিধি), তাহা প্রাপ্ত হইবে।

এই দোষ হইবে না। কারণ এই কথা জানিবে না যে,—উত্তর পদের যে বৃদ্ধি=উত্তরপদবৃদ্ধি, তাহাতে, উত্তরপদবৃদ্ধিতে, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

তবে কি প্রকারে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে ?

এইরূপ সমাসবাক্য করিব যে ;—উত্তরপদের প্রকরণে যে বৃদ্ধি, তদ্বিশিষ্ট উত্তরপদে ; এপ্রকার জানিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চ ৬।২।১০৫। এইসূত্রের এক্ষণে যথার্থরূপে এই ব্যাখ্যা হইবে যে ;—'উত্তর পদের,' এই অধিকার করিয়া যে বৃদ্ধি বিহিত হইবে, তদ্বিশিষ্ট (বৃদ্ধিবিশিষ্ট) উত্তরপদ পরে থাকিলে 'সর্ব্ব' শব্দ এবং 'দিক্' শব্দের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ উদাত্ত হয় কিন্তু 'সর্ব্বভাস' সমাসবিধায়ক শব্দটী উত্তরপদের প্রকরণে বিহিত হইয়া সমাস হয় নাই বলিয়াই উদাত্তও হইবে না।

আর এইরূপ করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা যে কল্পনা করা হইল, তাহাও নহে। এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা অবশ্যই জানিতে হইবে। কারণ 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের বৃদ্ধি শব্দ যদি যাবতীয় আ এবং ঐ ঔর গ্রহণ না করিয়া তদ্ভাবিতেরও গ্রহণ হয়, তাহা হইলেও এইরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গই আসিবে। যেহেতু এইরূপ করিলেই সর্ব্ব যে কারক=সর্ব্বকারক (২) এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

---

(১) ইহার এক প্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; বিশেষ ব্যাখ্যা পরে করা যাইতেছে।

(২) কৃ ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় করিয়া "অচো ঞ্ণিতি ৭।২।১১৫। (ঞিৎ প্রত্যয় এবং ণিৎ অর্থাৎ ঞকার ও ণকার ইৎবিশিষ্টপ্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত অর্থাৎ স্বরবর্ণান্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে 'ণ্বুল' প্রত্যয়ের ণকার ইৎপ্রযুক্ত কৃধাতুর ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া কারক হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্ব শব্দের সহিত বৃদ্ধিলক্ষণসম্পন্ন 'কারক' শব্দের সমাসে যথোচিত স্বর যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারে, এইজন্য সর্ব্বাবস্থায়ই 'উত্তরপদবিদ্ধৌ সর্ব্বঞ্চ' এইসূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য।

, ভাষ্যমূল। -যদপূচ্যতে। ইহ তাবত্তী ভার্য্যা যস্য তাবদ্ভার্য্যঃ যাবদ্ভার্য্য ইতি। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে। বৃদ্ধেনিমিত্তং বৃদ্ধিনিমিত্তং বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি। কিং তর্হি। বৃদ্ধেনিমিত্তং যস্মিন্ সোঽয়ং বৃদ্ধিনিমিত্তঃ। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি। কিঞ্চ বৃদ্ধেনিমিত্তম্। যোঽসৌ ককারো ঞকারোণকারোবা।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এইযে -তাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার, সে তাবদ্ভার্য্যা; এইরূপ যাবদ্ভার্য্যা প্রভৃতি বাক্য, এইসকল স্থলে "বৃদ্ধিনিমিত্তস্য চ তদ্ধিতস্যারক্তবিকারে। ৬।৩।৩৯। (১) এইসূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে; সে দোষ কিরূপে নিবারিত হইবে?

ইহা কখনও দোষ নহে। কারণ এইসূত্রের দ্বারা ইহা কখনও জানান হয় নাই যে—বৃদ্ধির যে নিমিত্ত, সে বৃদ্ধিনিমিত্ত; তাহার, বৃদ্ধিনিমিত্তের।

তবে কি?

বৃদ্ধির নিমিত্ত আছে যাহাতে, সেই এইস্থলে বৃদ্ধিনিমিত্ত, তাহার, বৃদ্ধিনিমিত্তের।

সেই বৃদ্ধির নিমিত্ত কি?

এইযে ককার, ঞকার অথবা ণকার, ইহারাই বৃদ্ধির নিমিত্ত। (২)

ভাষ্যমূল।—অথবা যঃ কৃৎস্নায়া বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। কশ্চ কৃৎস্নায়া বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। যস্ত্রয়াণামাকারৈকারৌকারাণাম্।

ভাষ্যানুবাদ।— অথবা যে সকল বর্ণ যাবতীয় বৃদ্ধির নিমিত্ত, সেই বৃদ্ধিনিমিত্ত।

কৃৎস্ন অর্থাৎ যাবতীয় স্থলেই বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়, সে কোন্ কোন্ বর্ণ?

সেই বর্ণ এই যে, আকার ঐকার এবং ঔকার; এই তিন বর্ণেরই বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাধিকারঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে ইহা যে সংজ্ঞাবোধক সূত্র তাহা উপলব্ধি হওয়ার জন্য 'সংজ্ঞা' এই শব্দের অধিকার করা কর্ত্তব্য।*

---

(১) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে সামান্যতঃ হইয়াছে, বিশেষরূপে পরে বলা হইতেছে।

(২) ককার ইৎ ঞকার ইৎ এবং ণকার ইৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে অকস্থ অচের বৃদ্ধি হয়।

ভাষ্যমূল।—অথ সংজ্ঞেয়েবং প্রকৃত্য বৃদ্ধ্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। কিং প্রয়োজনম্। সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থঃ। বৃদ্ধ্যাদীনাং শব্দানাং সংজ্ঞেয়ম্ সংপ্রত্যয়ো যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর বক্তব্য এই যে, 'সংজ্ঞা' এই শব্দটি প্রকরণ (১) করিয়া 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের বৃদ্ধ্যাদি-শব্দ, পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দ যে সংজ্ঞাবোধক, তাহা উপলব্ধি হইবার জন্য। অর্থাৎ বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দ যে সংজ্ঞাবোধক, তাহার উপলব্ধি যাহাতে হইতে পারে, এইজন্য 'সংজ্ঞা' এই শব্দ, অধিকারবোধক করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূল।—ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো যথা লোকে। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইতরথা অর্থাৎ 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার অকরণে, যেমন লোকমধ্যে কাহারও সংজ্ঞা (নাম) না করিলে, কিছুই বুঝা যায় না, সেইরূপ এই স্থলেও 'বৃদ্ধি' এইটী যে 'সংজ্ঞা', তাহা বুঝা যাইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—অক্রিয়মাণে হি সংজ্ঞাধিকারে বৃদ্ধ্যাদীনাং সংজ্ঞেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ইদমিদানীং বহুসূত্রমনর্থকং স্যাৎ। অনর্থকমিত্যাহ। কথম্। যথা লোকে। লোকে হ্যর্থবন্তি চানর্থকানি চ বাক্যানি দৃশ্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার না করিলে, বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি যে সংজ্ঞাবোধক শব্দ, তাহা উপলব্ধি হইবেনা। আর বৃদ্ধি, গুণাদি শব্দ যদি সংজ্ঞাবোধকই না হয়, তবে বহু বহু সূত্র অনর্থক হইবে।

অনেক সূত্র অনর্থক হইবে, এই কথা বলিতেছ? কেন তাহা হইবে?

যেমন লোকে হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন লোকমধ্যে অর্থবিশিষ্ট এবং অনর্থক উভয় প্রকার বাক্যেরই ব্যবহার দেখা যায়।

ভাষ্যমূল।—অর্থবন্তি তাবৎ দেবদত্ত গামভ্যাজ শুক্লাং দণ্ডেন দেবদত্ত গামভ্যাজ কৃষ্ণামিতি।

অনর্থকানি—দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ অধরোরুকমেতৎকুমার্য্যাঃ স্ফৈজ্যকৃতস্য পিতা প্রতিশীন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অর্থবিশিষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত, যথা;—"দেবদত্ত শুক্ল-বর্ণের

---

(১) প্রকরণ=অধিকার অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' এই শব্দটী বৃদ্ধিসংজ্ঞাবোধক যত সূত্র আছে, সেই সকল স্থানে ইহার অনুবৃত্তি (অধিকার) হওয়া কর্ত্তব্য।

গোতাড়ন করিতেছেন দণ্ডদ্বারা ; দেবদত্ত কৃষ্ণা গোতাড়ন করিতেছেন দণ্ড-দ্বারা ;" এই সকল বাক্যের অর্থ রহিয়াছে বলিয়া ইহারা অর্থবান্।

অর্থহীন বাক্যের দৃষ্টান্ত, যথা ;—"দশটী দাড়িম্ব ছয়খানি পিষ্টক কুণ্ড অজাজিনকে ভুষপিণ্ড ইহাই কুমারীর পায়জামা স্ফৈধ্যকৃত নামক ব্যক্তির পিতা প্রতিশীন নামক ব্যক্তি ;" এই বাক্যে কোনও শব্দের সহিত কোনও শব্দের সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা অনর্থক বাক্য।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞ্যসন্দেহশ্চ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, কোন্‌টী সংজ্ঞা এবং কোন্‌টী সংজ্ঞী, যাহাতে এই সন্দেহ না হয়, এরূপ কিছু বলা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ক্রিয়মাণেঽপি সংজ্ঞাধিকারে সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরসন্দেহো বক্তব্যঃ। কুতো হ্যেতৎ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞা আদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি। ন পুনরাদৈচঃ সংজ্ঞা বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞীতি। যত্তাবদুচ্যতে সংজ্ঞাধিকারঃ কর্ত্তব্যঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থ ইতি। ন কর্ত্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার করিলেও সংজ্ঞাতে এবং সংজ্ঞীতে সন্দেহ না হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এইরূপ বলিতে হইবে ?

যাহাতে সূত্রস্থিত বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবাচক এবং আদৈচ্ (আ, ঐ, ঔ) বর্ণসমূহ সংজ্ঞী, এইরূপই বোধ হয় ; কিন্তু তদ্বিপরীত 'আদৈচ্', সংজ্ঞাবাচক এবং 'বৃদ্ধি'শব্দ, সংজ্ঞিবাচক, এইরূপ প্রতীতি না হয়।

সংজ্ঞা সংজ্ঞী (১) অসন্দেহের জন্য বার্ত্তিকাদি কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। এমন কি, যাহা বলা হইয়াছে যে, সংজ্ঞার প্রতীতি হওয়ার জন্য, 'বৃদ্ধি-রাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' এই শব্দের অনুবৃত্তি করা কর্ত্তব্য ; তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

বার্ত্তিকমূল।—আচার্য্যাচারাৎ সংজ্ঞাসিদ্ধিঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচার (ব্যবহার) দ্বারাই সংজ্ঞার সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূল।—আচার্য্যাচারাৎ সংজ্ঞাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি। কিমিদমাচার্য্যাচারা-দিতি। আচার্য্যাণামুপচারাৎ।

---

(১) সংজ্ঞা আছে যার, সে সংজ্ঞী।

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্যগণের আচার দ্বারাই সংজ্ঞাসিদ্ধি হইবে। এই আচার্য্যগণের আচারটী কি?

পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণের উপচার অর্থাৎ ব্যবহার দ্বারাই 'বৃদ্ধি' শব্দ যে সংজ্ঞাবাচক, তাহার উপলব্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—যথা লৌকিকবৈদিকেষু। ＊।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেমন, লৌকিক অথবা বৈদিক ব্যবহার দ্বারাই সংজ্ঞার বোধ হয়, তেমন এখানেও হইবে। ＊।

ভাষ্যমূল।—তদ্‌যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু। লোকে তাবন্মাতাপিতরৌ পুত্রস্য জাতস্য সংবৃতেঽবকাশে নাম কুর্ব্বাতে দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি। তয়োরুপচারাদন্যেঽপি জানন্তি ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। বেদেঽপি যাজ্ঞিকাঃ সংজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি স্ফ্যো যূপশ্চষাল ইতি। তত্রভবতামুপচারাদন্যেঽপি জানন্তি ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। এবং ইহাপি। ইহৈব তাবৎ কেচিদ্ব্যাচক্ষাণা আহুঃ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞা আদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি। অপরে পুনঃ সিচি বৃদ্ধিরিত্যুক্ত্বা আকারৈকারৌকারানুদাহরন্তি তেন মন্যামহে যয়া প্রত্যায্যন্তে সা সংজ্ঞা যে প্রতীয়ন্তে তে সংজ্ঞিন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবোধকই হইবে, যেমন লৌকিক এবং বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে হইয়া থাকে।

তাহার দৃষ্টান্ত এই যে—যেমন লোকমধ্যে নবজাত পুত্রের নির্জ্জন স্থানে তাহার মাতা পিতা দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামকরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের (ঐ পিতামাতার) ব্যবহার দেখিয়াই অন্যেও জানিতে পারে যে, এইটী (দেবদত্ত) ইহার (পুত্রের) সংজ্ঞা (নাম)। আবার বেদেও এইরূপ দেখা যায় যে, যাজ্ঞিকগণ (যজ্ঞকাণ্ডদ্রষ্টা ঋষিগণ) স্ফ্যো (১) যূপ (২) চষাল (৩) প্রভৃতি সংজ্ঞা করিয়া থাকেন; সেইস্থলে তাঁহাদিগের ব্যবহার দ্বারাই অন্যেও জানিতে পারে যে, এইটী (স্ফ্যো) ইহার সংজ্ঞা। সেইরূপ এইখানেও (বৃদ্ধিরাদৈচ্ সূত্রে) আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারাই জানিবে।

---

(১) যজ্ঞাগারে যে, কাষ্ঠনির্ম্মিত খড়্গাকার বস্তুবিশেষ থাকে, তাহাকে 'স্ফ্যো' বলে।

(২) যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের কাষ্ঠস্তম্ভের নাম 'যূপ'।

(৩) 'চষালো যূপকর্ণিকঃ' অর্থাৎ যূপকাষ্ঠের উপরিস্থিত কর্ণাকার স্থানবিশেষ।

আর এইস্থলেই কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে,—'বৃদ্ধি' শব্দ সংজ্ঞাবোধক এবং 'আ ঐচ্' অর্থাৎ আকার, ঐকার, ঔকার, ইহারা সংজ্ঞি বোধক। কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,—"সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু" (১) ৭।২।১। এইসূত্রে, যে 'বৃদ্ধি' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ যেখানেই দেখাইয়াছেন, সেখানেই আকার ঐকার এবং ঔকারেরই দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, সেই হেতু আমরা মনে করিব যে, যদ্দ্বারা কোনও বিষয় প্রতীয়মান করান হয়, সে সংজ্ঞা এবং যাহারা প্রতীত হয়, তাহারা সংজ্ঞী।

ভাষ্যমূল।—অথ ক্রিয়মাণেঽপি সংজ্ঞাধিকারে সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরসংদেহো বক্তব্য ইতে।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার করিলেও 'সংজ্ঞা' এবং 'সংজ্ঞী'র যাহাতে সন্দেহ না হয়, এরূপ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞাসন্দেহশ্চ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতেও কোন সন্দেহ নাই।

ভাষ্যমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোশ্চ [illegible] সিদ্ধঃ। কুতঃ। আচার্য্যাচারাদেব। উক্ত আচার্য্যাচারঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতে যে কোন সন্দেহ নাই, তাহা সিদ্ধই আছে; (তাহার জন্য কোনও সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার প্রয়োজন নাই)।

কিরূপে?

আচার্য্যের আচার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। আচার্য্যাচারের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—অনাকৃতিঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহার আকৃতি নাই, তাহাকে সংজ্ঞা বলে। *

ভাষ্যমূল।—অথবাঽনাকৃতিঃ সংজ্ঞা। আকৃতিমন্তঃ সংজ্ঞিনঃ। লোকেঽপি হ্যাকৃতিমতো মাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহার কোন আকৃতি নাই, তাহাকে সংজ্ঞা বলা হইবে এবং যাহারা আকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা সংজ্ঞী হইবে। যেমন—লোকমধ্যেও আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডের দেবদত্ত (আকৃতিহীন) সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

(১) [illegible] পিছে আছে এমন যে ধাতু, তাহার বৃদ্ধি হয়, পরস্মৈপদান্বিত সিচ্ পরে থাকিলে।

বসন্ত-আগমন।

(শ্রীহরিদাস দত্ত।)

সুরভি সময়, সুধাবসময়,
  বসুধা সুখী এ সুখের কালে।
নব-নব দল, চারুকুন্তল,
  কলিত ললিত লতিকাজালে॥

সুবাস সুধীর, মলয় সমীর,
  মোহিনী মোহিত বহিছে কিবা।
অতি কুতূহলী, কোকিল কাকলী,
  উঠিছে উথলি রজনী দিবা॥

মালতী বকুল, আদি ফুলকুল,
  হাসিল ভাসিল ভুবন-বন।
কুসুম সুবাসে, দশ দিশা ভাসে,
  মধু আশে আসে মধুপগণ॥

উড়ি অলিজাল, কাল ফণিমাল
  প্রকৃতির হৃদি-গগনে দোলে।
উড়িছে উঠিছে, ঘুরিয়া পড়িছে,
  ফুলন ফুলের কোমল কোলে॥

মধুর আমোদে, মাতিয়া আমোদে,
  কিশোর কেশরে রভসে বসে।
চির সাধু সাধে, সাধে মনোসাধে,
  সুষম কুসুম-সুরসে রসে॥

কত মধুব্রত, মধু উনমত
  ধাইছে, গাইছে মধুর স্বরে।
কত অলিকুল, কলহে আকুল,
  রসাল মুকুল মধুর তরে॥

মরাল সকল করে কল কল,
  অমল কমল কমলাকরে।
লীলাতরঙ্গিত, লহরী-ললিত,
  সলিলে দোলিত নলিনী ধরে॥

গুরু কে ?

(শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।)

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশতঃ মার্জ্জিতসংস্কার মানবের ব্রহ্মবিবিদিষা নিরতিশয় বেগবতী। বেগবতী অনুরাগমন্দাকিনী অযুতঅনন্ত পর্ব্বত মরুভূমি বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনার বেগে আপনি মহাসমুদ্রে মিলিতা। অনুরাগী আপনার বেগে আপনি উন্মাদ, আপনার গন্তব্য পথের আপনি আবিষ্কারক। এজন্য তীব্রসংস্কার অনুরাগীর গুরুকরণে প্রয়োজনাভাব। কিন্তু এ হেন তীব্র অনুরাগী জগতে বড়ই বিরল। মন্দাধিকারী নিজ সামর্থ্যে অবিশ্বাসী, তমোভাবাপন্ন, অমার্জ্জিতসংস্কার সুতরাং পরসাহায্যে আত্মলাভেচ্ছু মানব স্বতঃই গুরুকৃপাসাহায্যপ্রার্থী। পরমাত্মা বা ঈশ্বরলাভে আত্মসাক্ষাৎকারকারী মানব ভিন্ন অন্য কেহই সহায় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত উপায়নহস্তে শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। সুতরাং যে কেহ শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনিই গুরুপদবাচ্য। বিবেক-চূড়ামণিমুখে ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বলিতেছেন, "উপসীদেদ্‌গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎ বন্ধবিমোক্ষণম্। শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥" যাঁহাদ্বারা ভববন্ধন মুক্তি হয়, যিনি প্রাজ্ঞ, বেদজ্ঞ, পাপাচারবিহীন, কামরহিত ও ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, সেই গুরুর উপাসনা করিবে। ইহাদ্বারাও যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেই গুরু বুঝাইতেছে। পরমাত্মা বা ঈশ্বর-দর্শন বড়ই কঠিন বিষয়; সুতরাং যে সে এ বিষয়ের উপদেষ্টা হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি জীবকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে যেমন উভয়েই বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানী গুরু এবং শিষ্যেরও সেই দশা হয়। কোন লোক গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না; এ বিষয় বিশিষ্টরূপে বলিবার জন্য অন্যত্র শ্রুতি বলিতেছেন, "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ" যেহেতু প্রাকৃত বুদ্ধি অব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে বহুচিন্তিত হইয়াও আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয় না। সুতরাং প্রাকৃত মানব গুরুর আসন গ্রহণের একান্ত অযোগ্য।

বৈদিক যুগে গুরুর এরূপ ব্রহ্মজ্ঞতা জ্ঞাত হওয়া যায়। পৌরাণিক ও তান্ত্রিকযুগে এভাবের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও

কুলগুরু প্রভৃতি অদ্ভুত ও অবৈদিক মত ভারতবর্ষের দেশবিশেষে প্রচলিত হইয়া অধুনাতন সমাজে তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রের ২য় পটলে "আস্তিকোহংশ শুচির্দক্ষো" ইত্যাদি বাক্যে গুরুর যে লক্ষণ করা হইয়াছে, সেরূপ গুরু তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। হয় ত অধুনাতন কুলগুরুগণের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনেক শিষ্য করিয়া গিয়া থাকিবেন; তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে নিরক্ষর হইয়া, কামিনীকাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া কিরূপে সেই গুরুর আসন গ্রহণ করিতে চান- বুঝিতে পারি না। অনেক অদ্ভুত তন্ত্রে কুলগুরুপ্রথার অদ্ভুত মত লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই কুলগুরুপ্রথা বঙ্গদেশে যেরূপ অধিকার বিস্তার করিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তেমন বিড়ম্বনা ঘটে নাই। যখন পূর্ব্ব সিদ্ধপুরুষগণের বংশাবতংসগণ জ্ঞান বা যোগাদি উপদেশে অপারগ হইয়া উঠিলেন, তখনি এক অভিনব তন্ত্র রচিত হইল, বলা হইল, আমরা দীক্ষাগুরু থাকিবই; কাণফুঁকার ভারটা পিতৃপুরুষগণের কৃপায় আমাদেরই রহিল;— কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিষ্য অন্যত্র শিক্ষাগুরু করিতে পারেন। গুরুমাহাত্ম্যের অদ্ভুত উপাখ্যান, পুরাণ তন্ত্র ও লোকমুখে রচিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ বুঝিয়া শুঝিয়াও সমাজের ভয়ে কুলগুরুগণের বার্ষিকের টাকা বন্ধ করিলেন না। কেহ কুলগুরুগণের ঘোর ব্যভিচার ও অজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া গুরু অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন; অধিকাংশ লোক নাস্তিকতা অবলম্বন করিলেন। ইহাই বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

শিষ্যের একান্ত নিষ্ঠা থাকিলে যে, যে কোন গুরু হইতে বিদ্যালাভ হইতে না পারে, তা নয়। কিন্তু সে একান্তনিষ্ঠা বড়ই দুর্লভ। কয়জন লোক জগতে আছেন, যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি সদর্পে যে বলিতে পারেন, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি ঘরে যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়?"

অবধূতের ২৪টী গুরু করিবার প্রস্তাব ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরমহংসদেব বুঝাইয়া দিয়াছেন, যাঁহার নিকট যে কিছু বিষয় শিক্ষা করা যায়, তিনিই প্রকারান্তরে গুরুপদবাচ্য। এ ভাবে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ চলাচল সকলি এ প্রকারের গুরু। কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে সহায়কারী ব্যক্তিবিশেষকে গুরু স্বীকার করিয়া সাধনাপথে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পরমাত্মসাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা না থাকায় গুরুকরণ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে আবার সে কোনমতেই গুরুপদ-

বাচ্য নহে। পরন্তু দৃঢ় অনুরাগীর গুরু খুঁজিতে হয় না। ধ্রুবের ন্যায় অনুরাগীর নিকটে ভগবান্ সর্ব্বদাই নারদরূপী গুরুকে প্রেরণ করিয়া ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেরূপ অনুরাগী জগতে এখন দুর্লভ।

সাধনাদ্বারা ক্রমে যদি উচ্চ হইতে উচ্চজ্ঞানে পৌঁছান সম্ভবপর হয়, তবে গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করা অন্যায় হইবে কেন? যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের গুর্ব্বন্তরে গমনের প্রয়োজনাভাব, কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে সমস্ত জ্ঞান, সূর্য্যের মত প্রকাশমান। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কেহ থাকিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এ হেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গুরুরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা গুর্ব্বন্তরে গমন করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। তন্ত্রমুখে ভগবান সদাশিব বলিতেছেন, "মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।" মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায়, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমনি গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করিবে।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ, তাই শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের অভয় পদ প্রাপ্ত হয়। "যথা দেবে তথা গুরৌ" বলিয়া শ্রুতি গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার ফল বলিয়াছেন। এই গুরুভক্তি লাভ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট করামলকবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন শিষ্য বলিতে পারেন, "ন গুরুর্নশিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।"

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [৬৫৩ পৃষ্ঠার পর।

অচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যযৌবন-
স্বভাবলাবণ্যময়ামৃতোদধিম্।
শ্রিয়ঃ শ্রিয়ং ভক্তজনৈকজীবিতম্
সমর্থমাপৎসখমর্থিকল্পকম্॥ ৪৫ ॥

তুমি অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, এবং নিত্যযৌবনশালী, সৌন্দর্য্যময় সুধাসমুদ্র, শোভাময়ী শ্রীদেবীরও শোভাসম্পাদক, ভক্তজনের একমাত্র জীবন, সামর্থ্যবান্, বিপৎকালের বন্ধু, এবং অর্থীদের কল্পবৃক্ষস্বরূপ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ॥ ৪৬॥

নিঃশেষে সমুদয় বাসনাজালকে শান্ত করিয়া, একমাত্র তোমারই নিত্যদাস হইয়া এ জীবনকে সনাথ করতঃ, কবে আমি সর্ব্বদা ত্বদীয় সেবায় রত থাকিয়া তোমার হর্ষসম্পাদন করিতে সমর্থ হইব? ৪৬॥

ধিগশুচিমবিনীতং নির্দ্দয়ং মামলজ্জং
পরমপুরুষ যোহহং যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ।
বিধিশিবসনকাদ্যৈর্ধ্যাতুমত্যন্তদূরম্
তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ॥ ৪৭॥

অশুচি, অবিনীত, নির্দ্দয়, নির্লজ্জ আমায় ধিক্, কারণ, হে পুরুষোত্তম, যোগিশ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য বিধিশিবসনকাদিও যাহা ধ্যানে আনিতে পারেন না, কামপ্রবৃত্তিপূর্ণ আমি কিনা তোমার সেই দাস্যভাব প্রার্থনা করিতেছি॥ ৪৭॥

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥ ৪৮॥

আমি সহস্র সহস্র অপরাধের অনুষ্ঠাতা, ভীষণ ভবসমুদ্র মধ্যে পতিত, নিরুপায়, এবং শ্রীচরণাশ্রিত, হে হরে, কেবলমাত্র কৃপা করিয়াই আমায় আপনার করিয়া লউন॥ ৪৮॥

অবিবেকঘনান্ধদিঙ্মুখে
বহুধা সন্ততদুঃখবর্ষিণি।
ভগবন্ ভবদুর্দ্দিনে পথঃ-
স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত॥ ৪৯॥

এই সংসাররূপ প্রবল বর্ষাসময়ে, অজ্ঞানমেঘে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া নানাপ্রকারের দুঃখবারি নিরন্তর বর্ষণ করতঃ আমায় পথচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে, হে ভগবন, হে অচ্যুত, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর॥ ৪৯॥

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥ ৫০॥

হে নাথ, প্রথমতঃ আমার এক বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, কেবল মাত্র সত্যই বলিতেছি। যদি তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ না কর, তাহা হইলে এরূপ দয়ার পাত্র আর কোথাও পাইবে না ॥ ৫০ ॥

তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ ন চ।
বিধিনির্ম্মিতমেতদন্বয়ম্ ভগবন্ পালয় মাস্ম জীহপ ॥ ৫১ ॥

অতএব তোমা ভিন্ন আমার উপযুক্ত প্রভু কেহ হইতে পারিবে না, এবং আমা ভিন্ন তুমিও উপযুক্ত কৃপাপাত্র কখনও পাইতে পারিবে না। তোমার আমার মধ্যে এই প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিধাতারই অভিপ্রেত। সুতরাং হে ভগবন্, ইহা স্বীকার কর, পরিত্যাগ করিও না ॥ ৫১ ॥

বপুরাদিষু যোহপি কোহপি বা
গুণতোহসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ৫২ ॥

দেহাদিবিষয়ে আমি যাহা তাহা হই না কেন, গুণবিষয়ে যেরূপ সেরূপ হই না কেন, আমি অদ্যই এই আমার "অহং"কে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম ॥ ৫২ ॥

মম নাথ যদস্তি যোহস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তস্বমিতি প্রবুদ্ধধী-
রথবা কিং নু সমর্পয়ামি তে ॥ ৫৩ ॥

হে নাথ, হে মাধব, যাহা "আমি" এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অথবা যদি আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে, "সকলই সর্বক্ষণ তোমার" তাহা হইলে তোমায় কি সমর্পণ করিব ? ৫৩ ॥

অববোধিতবানিমাং যথা
ময়ি নিত্যাং ভবদীয়তাং স্বয়ম্।
কৃপয়ৈবমনন্যভোগ্যতাং
ভগবন্ ভক্তিমপি প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৪ ॥

অয়ি ভগবন্, তুমি যেমন স্বয়ং আমার ভিতর "আমি চিরকাল তোমারই", এইভাব জাগাইয়া দিয়াছ, কৃপা করিয়া তেমনি আমায় সেই ভক্তি দাও, যদ্দ্বারা আমি তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ না হই ॥ ৫৪ ॥

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূৎ অপি মে জন্ম চতুর্মুখাত্মনা ॥ ৫৫ ॥

একমাত্র তোমার দাস্যসুখে যাঁহারা আসক্ত, তাঁহাদের ভবনে আমার কীট-জন্ম হউক, তাহাও ভাল, কিন্তু যেন অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়াও না জন্ম গ্রহণ করি ॥ ৫৫ ॥

সকৃত্ত্বদাকারবিলোকনাশয়া
তৃণীকৃতানুত্তমভুক্তিমুক্তিভিঃ।
মহাত্মভির্মামবলোক্যতাং নয়
ক্ষণেঽপি তে যদ্বিরহোঽতিদুঃসহঃ ॥ ৫৬ ॥

যে সকল মহাত্মা একবার মাত্র তোমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার আশায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগ ও মোক্ষ তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় আমাকেও স্বদর্শনযোগ্যতা দাও, কারণ, মুহূর্ত্তকালও তোমার বিরহ আমার অতি দুঃসহ বোধ হইতেছে ॥ ৫৬ ॥

ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং
ন চাত্মানং নান্যং কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ।
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্ ॥ ৫৭ ॥

তোমার দাসত্বরূপ ঐশ্বর্য্য ভিন্ন, দেহ, প্রাণ, সর্ব্বজনের বাঞ্ছিত সুখ, আত্মা, বা অন্য কিছুই ক্ষণকালের জন্যও ইচ্ছা করি না। ইহারা শত প্রকারে নষ্ট হইয়া যাউক। হে নাথ, হে মধুমথন, ইহা সত্য। এইটি আমি তোমার শ্রীচরণে জানাইতেছি ॥ ৫৭ ॥

দুরন্তস্যানাদেরপরিহরনীয়স্য মহতো
নিহীনাচারোঽহং নৃপশুরশুভস্যাস্পদমপি।
দয়াসিন্ধো বন্ধো নিরবধিকবাৎসল্যজলধে
তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামি গতভীঃ ॥ ৫৮ ॥

হে দয়াসাগর, হে বন্ধো, হে অনন্তস্নেহসমুদ্র, যদিও আমি দুঃস্পৃহ্য, অনাদি, অনিবার্য্য, মহান্ অমঙ্গলের পাত্র, নিরতিশয় হীনাচার, এবং নর-পশুতুল্য, তথাপি তোমার অশেষ গুণসমূহ বার বার স্মরণ করতঃ, নির্ভয় হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৮ ॥

অনিচ্ছন্নপ্যেবং যদি পুনরিতীচ্ছন্নিব রজ-
স্তমশ্ছন্নশ্ছদ্মস্তুতিবচনভঙ্গীমরচং ম্।
তথাপীত্থং রূপং বচনমবলম্ব্যাপি কৃপয়া
ত্বমেবৈবংভূতং ধরণিধর মে শিক্ষয় মনঃ॥ ৫৯॥

হে ধরণিধর, যদিও রজস্তমঃসমাচ্ছন্ন হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও ইচ্ছার আকার প্রকাশ করতঃ আমি এই মৌখিক স্তব রচনা করিয়াছি, তথাপি কৃপা করিয়া এইরূপ বচনকেও গ্রহণ পূর্ব্বক, আমার এবম্ভূত মনকে শিক্ষা দাও॥ ৫৯॥

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ॥ ৬০॥

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রিয় তনয়, তুমিই প্রিয় সুহৃৎ, তুমি মিত্র, তুমি জগতের গুরু ও গতি। আমি তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন; তুমি আমার গতি, আমি তোমার শরণাগত; এরূপ অবস্থায় আমি বাস্তবিকই তোমার ভারস্বরূপ॥ ৬০॥

জনিত্বাহং বংশে মহতি জগতি খ্যাতযশসাং
শুচীনাং যুক্তানাং গুণপুরুষতত্ত্বস্থিতিবিদাম্।
নিসর্গাদেব ত্বচ্চরণকমলৈকান্তমনসা-
মধোঽধঃ পাপাত্মা শরণদ নিমজ্জামি তমসি॥ ৬১॥

যাঁহারা খ্যাতনামা, পবিত্র, ও যুক্ত, যাঁহারা ত্রিগুণাত্মক প্রধান ও পুরুষের যাথার্থ্যজ্ঞ, স্বভাবতঃই যাঁহাদের মন তোমার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তিযুক্ত, তাঁহাদের মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হে আশ্রয়দাতঃ, দুষ্টাত্মা আমি অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে মগ্ন হইতেছি॥ ৬২॥

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ॥ ৬২॥

আমি উচ্ছৃঙ্খল, ক্ষুদ্র, চঞ্চল, অসূয়ার জন্মভূমি, কৃতঘ্ন, অভিমানী, কামুক, বঞ্চক, নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ। আমি কিরূপে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার পাদপদ্মযুগলের সেবা করিব? ৬২॥

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দয়ালুর্যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রতিভবমপরাদ্ধুর্মুগ্ধসাযুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ॥ ৬৩।

হে রঘুবর, যখন তাদৃশ মহানিষ্টকারী কাক প্রণত হইয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলে, হে কৃষ্ণ, প্রতি জন্মে তোমার নিকট অপরাধী হইলেও চেদিরাজ শিশুপালকে যখন তুমি আনন্দময় কৈবল্য দান করিয়াছ, তখন বল, এরূপ কি পাপ আছে, যাহা তুমি ক্ষমা করিতে না পার? ৬৩॥

ননু প্রপন্নঃ সকৃদেব নাথ
তবাহমস্মীতি চ যাচমানঃ।
তবানুকম্প্যঃ স্মর তৎপ্রতিজ্ঞাং
মদেকবর্জ্যং কিমিদং ব্রতং তে॥ ৬৪॥

শরণাগত ব্যক্তি একবার মাত্র "আমি তোমার" বলিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে সে তোমার দয়াপাত্র হইবে, এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, এবং বল, ইহা কি আমা ভিন্ন অন্য সকলের প্রতি খাটিবে, তুমি এরূপ ব্রত করিয়াছ? ৬৪॥

অকৃত্রিমত্বচ্চরণারবিন্দ-
প্রেমপ্রকর্ষাবধিমাত্মবন্তম্।
পিতামহং নাথমুনিং বিলোক্য
প্রসীদ মদ্বৃত্তমচিন্তয়িত্বা॥ ৬৫॥

তোমার শ্রীচরণারবিন্দে অকৃত্রিম, প্রকৃষ্ট প্রেমের যিনি অবধিস্বরূপ, সেই আত্মবান্ পিতামহ নাথমুনিকে অবলোকন করতঃ, আমার দুশ্চরিত্রের বিষয় কিছু মনে না করিয়া, প্রসন্ন হও॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীযামুনাচার্য্যবিরচিতং স্তোত্ররত্নং সম্পূর্ণম্॥

(ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক কথা।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ।] [৪৮৮ পৃষ্ঠার পর।

বর্ত্তমান সৌরবিপ্লবের আলোচনা হইতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিরত হইয়া দেখা যাউক যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইতিহাসে ঐরূপ আর কতগুলি বিপ্লব লিপিবদ্ধ আছে। দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কস নামক গ্রীসদেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা রাত্রিকালে একটী "নূতন" নক্ষত্র দেখিতে পান। আকাশমার্গে যে স্থানে নক্ষত্রটী উদিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে সে স্থানে অন্য কোন নক্ষত্র দেখা যাইত না। যে স্থানে নক্ষত্রের অস্তিত্ব পূর্ব্বে অনুমিত হয় নাই, সে স্থানে একটি অজানিত নক্ষত্রের আবির্ভাব হইলে তাহাকে 'নূতন' বলিয়া পরিগণনা করা অসঙ্গত নহে এবং এ পর্য্যন্ত যতগুলি নক্ষত্র সহসা উদিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'নূতন' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। হিপার্কস যে নক্ষত্রটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা এত উজ্জ্বল ছিল যে, দিবালোকে উহা স্পষ্ট দেখা যাইত। হিপার্কস 'নূতন' নক্ষত্রের তালিকা প্রথম প্রকাশ করেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিও (Biot) চীনদেশীয় ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে বৃশ্চিক রাশিতে আবির্ভূত আর একটী নূতন নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিয়াছেন।

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ডেন্মার্কদেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ টিকো ব্রা (Tycho Brahe) তাঁহার বিজ্ঞানমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে একদল লোককে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এইরূপে তিনি একটী 'নূতন' নক্ষত্রের আবিষ্কর্ত্তা হন। তিনি ইহার বিশেষ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ক্যাসিওপিয়া রাশিতে (Constellation of Cassiopia) আবির্ভূত হয় ও প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র অপেক্ষাও অধিক জ্যোতিঃসম্পন্ন ছিল এবং দিবাভাগেও দৃষ্ট হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার আলোকবিকীরণশক্তি হ্রাস হইতে লাগিল এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইহা একেবারে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়। সর্ব্ব প্রথমে নক্ষত্রটী উজ্জ্বল শুভ্ররশ্মি-বিশিষ্ট ছিল। আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পীত লোহিত ও পাংশু বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটী 'নূতন' নক্ষত্র অফিউকস্ রাশিতে (Constellation of Ophiuous) সহসা উদিত হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ কেপ্লারের ব্রনাউস্কি নামক ছাত্রকর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়।

কেপ্‌লার বলেন যে, ধূমকেতুর স্থায় পুচ্ছবিশিষ্ট না হওয়ায় ইহা একটী নক্ষত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। টিকোর নক্ষত্রের স্থায় ইহাও অসাধারণ জ্যোতি-সম্পন্ন ছিল। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা একেবারে অদৃশ্য হয়। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিগ্‌নাস্‌ রাশিতে (Constellation of Cygnus) আর একটী 'নূতন' নক্ষত্র আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহার আলোকবিকীরণশক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত নক্ষত্রসমূহের অপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষীণ ছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল একটী ক্ষুদ্রতর 'নূতন' নক্ষত্র ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা হাইণ্ড সাহেবের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে বার্মিংহাম্‌ সাহেব নর্দার্ণ ক্রাউন নামক রাশিতে (Constellation of Northern Crown) এক 'নূতন' নক্ষত্র দেখিতে পান। ইতিপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতগণ ঐ স্থানে কোন নক্ষত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। যে রাত্রিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়, ঐ রাত্রিতে ১১ ঘটিকার সময় এথেন্স নগরের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ডাক্তার স্মিড নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণকালে ঐ স্থানে চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন বৃহৎ নক্ষত্র দেখেন নাই।

১৩ই মে তারিখে সন্ধ্যাকালে ডাক্তার স্মিড এই নক্ষত্রটী দেখিতে পান। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ হাগিন্স্‌ (Huggins) ও ডাক্তার মিলার আলোক-বিশ্লেষণযন্ত্রসাহায্যে (Spectroscope) নক্ষত্রসমূহের রাসায়নিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। বার্মিংহাম্‌ সাহেব তাঁহাদের নিকট এই অভিনব নক্ষত্রের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে তাঁহারা নবাবিষ্কৃত আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রসংযুক্ত দূরবীক্ষণ (Telespectroscope) দ্বারা ইহার জড়তত্ত্ব নির্ণয় আরম্ভ করিলেন।

হাগিন্স ও মুলার সাহেব আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রদ্বারা নর্দার্ণ ক্রাউনে উদিত 'নূতন নক্ষত্র' অবলোকনকালে রামধনুবর্ণে রঞ্জিত স্থানে কৃষ্ণবর্ণ রেখাসমূহের মধ্যে চারিটী উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শেষোক্তের মধ্যে তিনটী হাইড্রোজেন গ্যাসের আলোক হইতে উৎপন্ন। হাগিন্স সাহেব বলেন যে, কোন অজানিত কারণে নক্ষত্রস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস অন্যান্য সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত হয় এবং তত্রত্য কঠিন দ্রব্য সমূহকে এরূপ উত্তপ্ত করে যে, তাহারাও আলোক বিকীরণ করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে সকল অভিনব নক্ষত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে একটীও সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। বৈজ্ঞানিকগবেষণা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, চক্ষুর অগোচর কোন ক্ষুদ্র নক্ষত্রে সহসা জড়বিপ্লব উপ-

স্থিত হইলে তত্রত্য হাইড্রোজেন প্রভৃতি জড় পদার্থের উত্তাপ এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ আলোক বিকীরণ করে এবং এই জন্যই তখন ঐ নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিপথে নীত হয়। ক্রমে যখন হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে, তখন নক্ষত্রও ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে ও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক মেয়ার (Meyer) ও ক্লাইন (Klein) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আকাশমার্গে ভ্রাম্যমান কোন নক্ষত্রের উপর আকর্ষণ প্রভাবে কোন গ্রহ কিম্বা তৎসদৃশ বিশাল আয়তনবিশিষ্ট জড়রাশি পতিত হইলে উভয়ের প্রতিঘাতে যে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্দ্বারা নক্ষত্রস্থিত হাইড্রোজেন গ্যাস প্রজ্বলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সৌভাগ্যের বিষয়, লক্ষাধিক বর্ষের জন্য আমাদের সূর্য্যে এইরূপে বিপ্লবব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, ঐ সময়ের মধ্যে কোন গ্রহের সহিত সূর্য্যের সঙ্ঘর্ষণের আশঙ্কা অল্প। মেয়ার ও ক্লাইনের মতের বিরুদ্ধে প্রক্টার (Proctor) বলেন যে, কোন গ্রহ হঠাৎ কোন সূর্য্যের উপর পতিত হইতে পারেনা।

জোলনার (Zollner) বলেন যে—সকল নক্ষত্র তাহাদের প্রথমাবস্থায় বিকীরণশক্তিবিহীন এক প্রকার শীতল আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। এই সময়ে সংসক্তিপ্রভাবে উপরিস্থিত মূলপদার্থসকল মিলিত হয়। কিন্তু মধ্যভাগস্থ উত্তপ্ত দ্রবরাশি আবরণ ভেদ করিলে উপরে যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। সুতরাং Zollner এর মতে অন্তর্ভাগস্থ উত্তপ্ত দ্রবরাশি ও কঠিন আবরণের জ্বলনই 'নূতন নক্ষত্রে'র আবির্ভাবের কারণ।

জনসন্ ষ্টোনি সাহেবের মতে কোন অন্তর্বিপ্লব 'নূতন নক্ষত্রের' কারণ নহে। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, দুই নক্ষত্রের বায়বীয় আবরণের ঘর্ষণে তৎসংশ্লিষ্ট হাইড্রোজেন উত্তপ্ত হইয়া এরূপ আলোক বিতরণ করিবে যে, তাহার অস্তিত্ব কিয়ৎকালের জন্য আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রে চারিটী উজ্জ্বল রেখা দ্বারা প্রমাণিত হইবে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উদিত 'নোভা সিগ্নাস্' (Nova Cygnus) নামক নক্ষত্রের আলোচনা কালে অধ্যাপক ভোগেল (Vogel) কর্ত্তৃক জোলনারের (Zollner) মত সমর্থিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার লোস্ (Dr. Lohse) রাসায়নিক সংসক্তির প্রভাব অদৃশ্য নক্ষত্রের প্রজ্বলনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ বৎসর বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ নর্ম্মান্ লকিয়ার সাহেব তাঁহার মত

প্রকাশ কালে বলেন যে, 'নূতন নক্ষত্র' সমূহের আলোক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাহাদের সহিত উল্কাপিণ্ড ও ধূমকেতুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং উল্কাসমষ্টির সঙ্ঘর্ষণই অদৃশ্য নক্ষত্রের জ্বলনের কারণ।

কোন জ্যোতিষ্কের সহিত উল্কাসমষ্টির সঙ্ঘাত উপস্থিত হইলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ক্যারিংটন (Carrington) ও হজ্‌সন্‌ (Hodgson) দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যদর্শনকালে দুইটী অত্যুজ্জ্বল জড়রাশি সূর্য্যের উপর দিয়া যাইতে দেখিতে পান। অনেকেই বলেন, ইহারা উল্কাপিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বভাবতঃ সূর্য্যের প্রতি আমরা অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারি না। সূর্য্যের আলোকবিকীরণশক্তি এত অধিক যে, গ্রহণদর্শনকালে কেহ কেহ ভুষা দ্বারা আবৃত কাচের সাহায্য লইয়া থাকেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহার আয়তন ও তৎসঙ্গে বিকীরণশক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ধূমবর্ণ কাচের দ্বারা দূরবীক্ষণের শেষভাগ আবৃত করিলে অনায়াসে সূর্য্য অবলোকন করা যাইতে পারে। সূর্য্যের সহিত সঙ্ঘর্ষণে উল্লিখিত জ্বলন্ত উল্কারাশি এরূপ উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করিতেছিল যে ক্যারিংটন ভাবিলেন, তাঁহার দূরবীক্ষণের ধূমবর্ণের কাচ ফাটিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা বর্ণনকালে হজ্‌সন বলেন যে, উল্কাদ্বয় কর্ত্তৃক আবৃত সূর্য্যাংশ অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষা অধিক জ্যোতির্ম্ময় ছিল এবং অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সূর্য্যের উপর এই দুই উল্কাপিণ্ডের পতনে পৃথিবীতে কি হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাউক। ঐ সময়ে পৃথিবীর চুম্বকশক্তি উত্তেজিত হইয়া সমস্ত ভূভাগ আলোড়িত করিয়াছিল। সমুজ্জ্বল কেন্দ্রীয় আলোক (Auroræ) মেরু ও তদ্বহির্ভূত প্রদেশসমূহ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকশক্তির আলোড়নে পৃথিবীস্থ যাবতীয় টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। আমেরিকার অন্তর্গত ওয়াসিংটন ও ফিলাডেলফিয়ার টেলিগ্রাফ আফিসের সংবাদপ্রেরকগণ সংবাদপ্রেরণকালে তাড়িত শক্তির আধিক্যবশতঃ বিশেষরূপে আহত হয়। নরওয়ের কোন ষ্টেসনের টেলিগ্রাফ যন্ত্র সহসা দগ্ধ হয় এবং এবং উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন সহরে বেন্‌ সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী টেলিগ্রাফ যন্ত্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়। যদি কেবল দুইটী উল্কার সূর্য্যমণ্ডলে পতনে পৃথিবীতে এরূপ অনিষ্ট

ঘটিতে পারে, তাহা হইলে বহুসংখ্যক উল্কা সূর্য্যোপরি পতিত হইলে যে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, আমাদের সৌরজগতে এরূপ প্রলয়কাণ্ডের সংঘটন সম্ভব নহে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডাক্তার আণ্ডার্সন সাহেব একটী "নূতন নক্ষত্র" দেখিতে পান। বর্ত্তমান বর্ষে পার্সেউস্ মণ্ডলে যে নক্ষত্র উদিত হইয়াছে, এই আণ্ডার্সন সাহেব তাহারও আবিষ্কর্ত্তা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এই দুইটী নক্ষত্র হইতে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'নূতন নক্ষত্রে'র পর্য্যালোচনা এখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত।

সার লেপেল গ্রিফিন ও হিন্দুধর্ম্ম।

সার লেপেল গ্রিফিন সম্প্রতি এক সভায় সভাপতি হইয়া অন্যান্য কথার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।— হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম, উহার নীতিও অতি উচ্চ। যখন আমার ভারতবাসের কথা এবং তত্রত্য সর্ব্বসম্প্রদায়ের দেশীয় ব্যক্তিগণের ভিতর সহস্র সহস্র বন্ধুবর্গের কথা আমার মানসপথে উদয় হয়, যখন আমি সেই আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল, আইনের মর্য্যাদারক্ষক, মদ্যপানে অনাসক্ত, মনুষ্যোচিতগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিষয় চিন্তা করি, তখন আমার মনে সন্দেহ হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মে এমন কিছু আছে কি না, যাহা ভারতীয় ব্যক্তিগণকে অধিকতর নীতিপরায়ণ করিতে পারে। আমি ত লণ্ডনের কোথাও ভারতবাসীদের ন্যায় নীতিপরায়ণ লোক দেখিতে পাই না। আমার বিবেচনায় ভারতীয় নীতি পশ্চিম ইউরোপের যে কোন দেশের নীতির সহিত সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

সমালোচনা।

পীঢ়াদরপীঢ়ী বা নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস।—পুঁথির আবিষ্কারক ও তাহার বঙ্গানুবাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন। সেই ভূমিকার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল। তাহাতেই এই গ্রন্থের পরিচয় পাঠকবর্গ পাইবেন।

"পীঢ়াদর পীঢ়ী"র অর্থ পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বা বংশাবলী।

ইহাতে দিল্লীর রাজবংশাবলী এবং সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ইতিহাসটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মূল্য অল্প নহে। * * আধুনিক ইতিহাসের অনুসরণে লিখিত নয় বলিয়াই বর্ত্তমান প্রচলিত ইতিহাসলিখিত আখ্যান ও ঘটনাবলীর সহিত এতল্লিখিত অনেক আখ্যান ও ঘটনাবলীর অনেক স্থলে মিল নাই। * * * গ্রন্থকার দিল্লীর ব৷ ইন্দ্রপ্রস্থের ইতিহাস লিখিতে গিয়া মূল দেবরাজ ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভেই হিন্দুরীত্যনুসারে 'গণেশায় নমঃ' লিখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর মুসলমান সম্রাট শাহ আলম পর্য্যন্ত বিবরণ সংক্ষেপে আছে। * * ধুন্ধার রাজ্যের অন্তর্গত 'সবাই' জয়পুর সদৃশ সবাই মাধোপুর নামক এক নগর আছে। তত্রত্য জনৈক বৃদ্ধহিন্দুর নিকট কতকগুলি জীর্ণ পুঁথি" হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই পুঁথিখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুঁথিটী ঝাড়সাহী বা জয়পুরী হিন্দী ভাষায় ও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত ছিল। তাহা হইতে নগেন্দ্র বাবু বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মূলগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে ও তাহার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান বাদশাহদিগের কতকগুলি সুন্দর চিত্রও ইহাতে আছে। হিন্দুরা ইতিহাস লিখিতে একেবারে ঔদাস্য করিত, এই সংস্কার এই পুস্তকদৃষ্টে অনেকের দূর হইবে। আশা করি, ইতিহাসতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সকলেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির আদর করিবেন।

আমিষ ও নিরামিষ আহার। প্রথম খণ্ড।—শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। এই গ্রন্থেও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত একটী দীর্ঘ ভূমিকা আছে। ঋতেন্দ্র বাবু নানা প্রমাণ প্রয়োগে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালের যজ্ঞ হইতেই প্রথম খাদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। ইহঁার মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনটী যুগ বা স্তর আছে যথা, দেবযুগ ঋষিযুগ ও পিতৃযুগ। ইহঁার মতে এই দেব বা পিতৃগণ কোন অলৌকিক পুরুষ নহেন—ইহঁারা দেব বা পিতৃউপাধিকারী মনুষ্যবিশেষ। বিভিন্ন সময়ে এই সকল মহাপুরুষগণ নানা দ্রব্য ও ওষধি যজ্ঞচ্ছলে পরীক্ষা করিয়া অনেক বহুবিধ খাদ্য ও ঔষধের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ভূমিকাটী খুব গবেষণাপূর্ণ ও

চিন্তাশীল মনের পরিচায়ক। সকলে ইহাঁর মতের সহিত একমত হইতে না পারিলেও নূতন চিন্তার অনেক উপকরণ পাইবেন।

মূলগ্রন্থের প্রথম ভাগে নিরামিষ আহারের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইয়াছে। নানাপ্রকার, ভাত, নিরামিষ পোলাও, ডালে, পোড়া, ভাজা, বড়ি, চচ্চড়ি, ছেঁচ্‌কি ও ঘণ্ট প্রস্তুত করিবার উপায় বেশ সুপ্রণালীক্রমে সাজাইয়া লিখা হইয়াছে। আর আয়ুর্ব্বেদমতে বা ডাক্তারীমতে প্রত্যেক জিনিষের গুণাগুণ লিখা থাকাতে পুস্তকখানি আরো অধিক শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

যাঁহারা রন্ধনের ক খ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারাও এই পুস্তক খানির সাহায্যে নানাবিধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রস্তুত করিয়া আপনাকে ও অপরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানির বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে উল্লিখিত খাদ্যগুলি শুধু বড় মানুষের উপযোগী নহে, অনেকগুলি সামান্য গৃহস্থেও অতি অল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারেন।

বঙ্গমঙ্গল।—জাতীয় ভাব উদ্দীপনাপূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক। কবিতা কয়েকটী অতি সুন্দর—কবির আন্তরিকতা আছে। জন্মভূমিকে মা জানিয়া পূজা করিতে কবি জানেন। আশা করি, এই পুস্তকখানি পাঠে প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের মাতৃভূমির উন্নতির জন্য স্বার্থকে বলি দিতে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে।

চণ্ডীরাম (ধর্ম্মমূলক নাটক)।—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভারত-সঙ্গীতসমিতি হইতে প্রকাশিত।

আজকাল অভিনয়দর্শকগণের রুচি অনেকটা বিকৃতপথে চলিয়াছে বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই সময়ে এই ধর্ম্মমূলক নাটকখানিকে সাধারণে উৎসাহ দেওয়াতে তাঁহাদের সে সংস্কার দূর হইবে। সাধারণের সমক্ষে নূতন নূতন ধর্ম্মমূলক নাটক উপস্থিত করিতে পারিলে, সাধারণে যে উপেক্ষা করিবেন, তাহা বোধ হয় না। এই গ্রন্থখানিতে গিরীশ বাবুর নসীরামের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রচয়িতা সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়া না থাকিলেও উদ্যম যে খুব প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। চণ্ডীরামের গীতগুলি অভিনয়কালে সাধারণের মনপ্রাণ দ্রব করিয়া থাকে।

অতানুসারে কোন মত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বল, তবে বর্ত্তমান কালের লোকে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাহার ফল দাঁড়াইবে,—ঘোর অবিশ্বাস। যাঁহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাঁহারা বাস্তবিক ভিতরে ঘোর অবিশ্বাসী দেখা যায়। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, উহাকে পুরোহিতদের জুয়াচুরী মনে করে।

ধর্ম্ম এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়াছে। উহা আমাদের প্রাচীন সমাজের একটী মহৎ অবশিষ্ট ; উহাকে থাকিতে দাও। কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্ব্বপুরুষ উহার জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাহা চলিয়া গিয়াছে ; তাঁহার যুক্তিতে উহা মেলে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্ম্মেই একেশ্বরবাদ বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে উহা প্রবল হইতে পায় নাই, আর এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি উহার নিজ অভাব আপনিই পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই একটী তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার জীবিত রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইউরোপে মধ্য যুগে, এমন কি, দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেক দিন পর পর্য্যন্তও এই একটী বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল যে, গুণ দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না, দ্রব্য গুণে লাগিয়া আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড়পদার্থনামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটীর অস্তিত্ব থাকে কি না? এক্ষণে বৌদ্ধ আসিয়া বলিতেছেন, এরূপ একটী দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছু দেখিতে পাও না আর ইহাই আধুনিক অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদীর মত, কারণ, এই দ্রব্য-গুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, উহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচার। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম

হয় না, আর কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত বলেন, আমাদের এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা কেবল দৃশ্যপদার্থ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার তোমার কোন অধিকার নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল আমরা বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—এক বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টা কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু সেই এক বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা অপরিণামী।

বুঝিবার উপযুক্ত একটী দার্শনিক ধারণা করিবার জন্য আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, আর উহাকে রজ্জু বলিয়া বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান চলিয়া যায়, আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যবহারিক সত্তা দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবশ্যই ব্যবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হইবে না। এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Idoalist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সত্তা দেখেন আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিকে দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার জগৎ সত্য বলিবার অধিকার আছে।

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল এই হইল, ঈশ্বরের সগুণ ধারণাই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদিগকে আরো উচ্চতর ধারণা করিতে হইবে অর্থাৎ নিগুর্ণের ধারণা চাই। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। আমরা সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিলাম না, কিন্তু আমরা দেখাইলাম যে, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ নিগুর্ণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটি, আবার নিগুর্ণও বটি। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বর-ধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটী ব্যক্তি বলিয়া ধারণা, অবশ্যই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ, মানুষ যে ভাবে সগুণ নিগুর্ণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চ দিকে লইয়া গিয়া ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নিগুর্ণ উভয়ই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই অবশেষে আমাদিগকে নিগুর্ণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নিগুর্ণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে উচ্চতর ভাবে সমাধান। অনন্ত কেবল নিগুর্ণই হইতে পারে, সগুণ কেবল সান্তমাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা সগুণের রক্ষা করিলাম, উহাকে উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আইসে, নিগুর্ণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিগুর্ণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে, বাস্তবিক কিন্তু উহাতে 'আমিত্বে'র নাশ না হইয়া প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্তায় সমাধান না করিয়া ব্যক্তিকে কোন রূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও ওরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরো কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। যদি সকল বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নিগুর্ণ পুরুষ—সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে আমরা তাহাই। 'হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি'—তুমি তাহাই, তুমিই সেই নিগুর্ণ পুরুষ, তুমিই সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে তুমি সমুদয় জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তাহা সর্ব্বদাই তুমি স্বয়ং। 'তুমি' কিন্তু 'ব্যক্তি' অর্থে নহে, নিগুর্ণ অর্থে। আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি বাস্তবিক সগুণ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নিগুর্ণ। এই

সগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নির্গুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নির্গুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনিই মানুষের আত্মাস্বরূপ—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সত্য বলা হয় নাই।

এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেই গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কূট উঠিবে, কিন্তু উহাদের মীমাংসার পূর্ব্বে আমরা অদ্বৈতবাদ কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি আইস। অদ্বৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অন্যত্র সত্যের অন্বেষণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। স্থূলসূক্ষ্ম সবই এখানে ; কার্য্যকারণ সবই এখানে—জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্ব্বানুস্যূত সত্তারই সূক্ষ্ম ভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই জগৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গনরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহারাও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়াই এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টি স্বরূপ এই 'এক' রহিয়াছে আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তজীবভাবে আমরা যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ, আর যতই আমরা আপনাদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, আমাদের পক্ষে তত মঙ্গল। আর যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের কষ্ট আসিবে। এই তত্ত্ব হইতে আমরা অদ্বৈতবাদসম্মত নীতিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম আর আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোনমত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্বই প্রাপ্ত হই না। আমরা জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষবিশেষের খেয়াল যাহা,তাহাই কর্ত্তব্য। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নহে ; কারণ, উহা আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। হিন্দুরা বলেন, এই কার্য্য করা উচিত নয়, কারণ, বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন,কিন্তু খ্রীশ্চিয়ান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীশ্চিয়ান আবার বলেন, এ কাষ করিও না, ও কাষ করিও না, কারণ বাইবেলে ঐ সকল কার্য্য করিতে নিষেধ আছে। যারা বাইবেল মানে না, তারা অবশ্য এ কথা শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে

হইবে, যাহা এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্ত্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল ধারণা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন; আর যখনই ধর্ম্মসম্প্রদায় এই সকল মনীষীগণকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিবার উপযোগী উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই ফল এই হইয়াছে যে, সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্ত্তমানকালে প্রধানতঃ ইউরোপ খণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কখনও এরূপ হয় নাই।

ইহাঁদিগকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অবশ্য উহা খুব উদারভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম যাহা কিছু বলে, সমুদয় যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল ধর্ম্মেই কেন যে এই এক দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাস্তবিক ইহার কারণ এই যে, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত, ধর্ম্ম বিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। কোন ধর্ম্ম হয়ত কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল। * * * * * * মনে কর, মুসলমান ধর্ম্মের কোন আদেশের উপর একজন খ্রীশ্চিয়ান কোন এক দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কি করিয়া তুমি জানিলে উহা ভাল কি মন্দ? তোমার ভালমন্দের ধারণা ত তোমার শাস্ত্র হইতে। আমার শাস্ত্র বলিতেছে, ইহা সৎকার্য্য।' যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন, আমাদের শাস্ত্র তোমাদের অপেক্ষা প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন, আমার শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহাকে লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পার? খ্রীশ্চিয়ান বলিবেন, ঈশার 'পর্ব্বতের উপর হইতে প্রদত্ত উপদেশাবলি' দেখ, মুসলমান বলিবেন, কোরাণের নীতি দেখ। মুসলমান বলিবেন, এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরাণে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারেন না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি উহার মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। উহা কোন গ্রন্থ হইতে পারে না, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক কোন পদার্থ এই মীমাংসক হওয়া আবশ্যক। যুক্তি হইতে সার্ব্বভৌমিক আর কি আছে? কথিত হইয়া থাকে, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানু-

সন্ধানে ক্ষমবান নহে। অনেক সময় উহা ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কোন পুরোহিতসম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। * * আমি কিন্তু বলি, যদি যুক্তি দুর্ব্বল হয়, তবে পুরোহিতসম্প্রদায় আরো অধিক দুর্ব্বল হইবেন, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তি শুনিব, কারণ, যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অপর উপায়ে কোন সত্য লাভেরই সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে সহানুভূতি করিতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশলক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা হইতে যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল! আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্রতর হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফলস্বরূপ। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা করে না। ইহা তুমি মানিয়াই লইতে পার যে, উহা সমুদয় বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। একটী গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকাখণ্ড, তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব মননশীল জীব বলিয়া। পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি, আমি শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি, কারণ, আমি যে দেশে জন্মিয়াছি, সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত করিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটী গো আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ, 'গো' শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে, কি করিয়া জানিলে? কারণ, বেদে 'মনুষ্য' শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আর আমি যে ভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি

তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যক্তি ইহা লইয়া কতকগুলি অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন আর সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই মতান্দোলনে কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন। লোকের কথায় যুক্তিশূন্য বিশ্বাসের এতদূর শক্তি, উহাতে বিপদ্ও এত। উহা মনুষ্যজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে,—আর আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের উন্নতিই আবশ্যক। সমুদয় আপেক্ষিক সত্যানুসন্ধানেও সত্যটী অপেক্ষা আমাদের মনের চালনাই বেশী আবশ্যক হইয়া থাকে। এই মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের এই টুকু গুণ যে, ধর্ম্মমতের ভিতর এই মতটীই অনেকটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণের যোগ্য। নির্গুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে সেই নির্গুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য আর অন্য সমুদয় আংশিক ও সগুণ ঈশ্বরধারণার কোনটীই বিচারসহ নহে। ইহার আর একটী গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, এই আংশিক ধারণাগুলিও এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, কিন্তু ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সকের ধর্ম্ম চাহিয়া থাকে, আর আমরা বুঝিতে পারি, তাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকেই সত্যের বিমল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা ত দূরের কথা। অতএব এই সকের ধর্ম্মও থাকা দরকার; সময়ে ইহা অনেককে উচ্চতরধর্ম্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নির্গুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নির্গুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা প্রতীত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত, তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নির্গুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিক পক্ষে জগৎ কি? বিভিন্ন মন সেই নির্গুণেরই যতদূর ধারণা করিতে

পারে, তাহাই; উহা যেন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত একখানি পুস্তকস্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে আর প্রত্যেককেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা সদৃশ, সেই জন্য মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিষ একরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। তুমি আমি উভয়েই একখানি চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর, অপর কোন-রূপ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল; সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা সমপ্রকৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগৎই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ, প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা সর্ব্বদাই সসীম। আমরা যে কোন ব্যবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ অতএব সসীম হইয়া থাকে আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যবহারিকমাত্র। কার্য্যকারণভাব কেবল ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্য তাঁহাকে সসীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎও সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র, যেমন আমাদের বুদ্ধির নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ পুরুষমাত্র আর আমাদের বুদ্ধিদ্বারা উহার উপর নামরূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই পুরুষ আর এই টেবিল আকৃতি আর অন্যান্য যাহা কিছু, সবই সদৃশ মানববুদ্ধি দ্বারা তাঁহার উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যবহারিক সত্তার উহা নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্ব্বভৌমিক পারমার্থিক সত্তাসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ও গতিশীল কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ, গতি বা পরিণাম আপেক্ষিক পদার্থমাত্র। আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই দুইটী পদার্থের আবশ্যক। সমুদায় সমষ্টিজগৎ একবস্তুস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে

বার্ত্তিকমূল।—লিঙ্গেন বা। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা সংজ্ঞাবোধক চিহ্নবিশেষের দ্বারা জানা যাইবে যে, এইটী সংজ্ঞা। *

ভাষ্যমূল।—অথবা কিঞ্চিল্লিঙ্গমাসজ্য বক্ষ্যামীত্থংলিঙ্গা সংজ্ঞেতি। বৃদ্ধি-শব্দে চ তল্লিঙ্গং করিষ্যতে নাদৈজ্‌শব্দে। ইদং তাবদযুক্তং যদুচ্যতে আচার্য্যাচারাদিতি। কিমত্রাযুক্তম্। তমেবোপালভ্যাগমকং তে সূত্রমিতি তমেব পুনঃ প্রমাণীকরণমিত্যেতদযুক্তম্। অপরিতুষ্যন্ খল্বপি ভবাননেন পরিহারেণানেনাকৃতির্লিঙ্গেনবেত্যাহ। তচ্চাপি বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা কিছু লিঙ্গ (চিহ্ন) সংলগ্ন করিয়া বলিব যে, এইরূপ চিহ্নসূচক সংজ্ঞা আর সেই চিহ্নটি 'বৃদ্ধি' শব্দে করা হইবে; কিন্তু আদৈচ্ শব্দে করা হইবে না। ('বৃদ্ধি' শব্দে, ক্'বৃদ্ধি', খ্'বৃদ্ধি' বা র্'বৃদ্ধি' এইরূপ সংকেত করা যাইবে, সেই চিহ্নটী কালক্রমে লোপ হইয়াছে কিংবা ইচ্ছা করিয়া লোপ করা হইবে)।

পূর্ব্বে যে 'আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি-শব্দ সংজ্ঞাবোধক হইবে,' এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা ত অসঙ্গত হইবে?

এখানে কি অসঙ্গত?

অসঙ্গত এই যে, তাহাকে অর্থাৎ সূত্রকারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল যে, তোমার সূত্র অগমক (অবোধক) হইয়াছে; আবার তাহার অর্থাৎ বার্ত্তিককারাদির বাক্য, তাহাতে প্রমাণ করা হইল। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এক জনের বাক্যে দোষ দেখিয়া সেই দোষ পরিহারের জন্য আর এক জনের বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না; সুতরাং সূত্রকারকে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার না করিলে, 'সংজ্ঞা'র বোধ হইবে না বলিয়া দোষ দিয়া, 'আচার্য্যাচারাৎ' অর্থাৎ বার্ত্তিককারাদি আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারাই 'সংজ্ঞা'র বোধ হইবে; এইরূপ প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আর বার্ত্তিককার, 'আচার্য্যাচারাৎ' এইরূপ বার্ত্তিক করিয়া ও সেই পরিহারের দ্বারা সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই 'অনাকৃতিঃ' 'লিঙ্গেন বা' এইরূপ বার্ত্তিক করিয়াছেন। অতএব 'আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বার্ত্তিক করিলেও 'লিঙ্গেন বা' (অথবা চিহ্নবিশেষের দ্বারা সংজ্ঞাবোধ হইবে) এইরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যোতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি ইৎসংজ্ঞা ন বক্তব্যা লোপশ্চ

ন বক্তব্যঃ। সংজ্ঞালিঙ্গমনুবন্ধেষু করিষ্যতে। ন চ সংজ্ঞায়া নিবৃত্তিরুচ্যতে। স্বভাবতঃ সংজ্ঞা সংজ্ঞিনং প্রত্যায্য স্বয়ং নিবর্ত্ততে। তেনানুবন্ধানামপি নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এইরূপ বলিতেই হয়; অর্থাৎ 'চিহ্নবিশেষের দ্বারা বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবাচক,' এইরূপ অবশ্যই জানিতে হয়; তবে এইরূপ করিলে পরে, ইৎসংজ্ঞাও বলিতে হইবে না, লোপও বলিতে হইবেনা। কারণ, 'ইৎ'-সংজ্ঞাবিধায়ক যে সকল অনুবন্ধ বর্ণ, সে সকল বর্ণে, 'সংজ্ঞা' বোধক যে চিহ্ন, সেই চিহ্ন করা হইবে।

আবার সেই চিহ্নদ্বারা অনুবন্ধবর্ণসমূহে, 'সংজ্ঞা' আসিয়া উপস্থিত হইবে, অনুবন্ধবর্ণসমূহের লোপ হয় বলিয়া সেই সংজ্ঞারও নিবৃত্তি হয় (লোপ হয়) এইরূপ যে বলিতে হইবে, তাহাও নহে। কারণ, স্বভাবতঃই সংজ্ঞা শব্দ, তাহার সংজ্ঞীকে বোধন করাইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু অনুবন্ধবর্ণসমূহেরও নিবৃত্তি হইবে।

বিশেষ বিবৃতি।—যেমন,—'অষ্টাভ্য ঔশ্' ।৭।১।২১। (অষ্টন্ শব্দের আকারান্ত করিবার পর, 'জস্' এবং 'শস্' বিভক্তির স্থানে 'ঔশ'হয়) এই সূত্রে, 'ঔশ্', 'শ্'কার অনুবন্ধ করিবার প্রয়োজন এই যে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য'। ১।১।৫৫। (অনেক বর্ণ এবং 'শ্'কার ইৎবিশিষ্ট আদেশ হইলে, সকল বর্ণস্থানে ঐ আদেশ হয়), এই সূত্রানুসারে, 'জস্' এবং 'শস্'এর সমুদায় ('জ'ও 'স্' উভয়) বর্ণস্থানে 'ঔশ্' আদেশ হয়। এইস্থলে, 'শ্'কারের 'ইৎ' করিবার জন্য 'হলন্ত্যম্।' ১।৩।৩। (উপদেশকালে যে অন্ত্য হল্, তাহার ইৎ হয়) প্রভৃতি সূত্র, এবং 'তস্য লোপঃ' ।১।৩।৯। (সেই 'ইৎ'এর লোপ্ হয়) ইত্যাদি লোপবিধায়ক সূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, 'বৃদ্ধি' শব্দে, 'সংজ্ঞা'বোধের জন্য যেমন 'ক' 'খ' বা কোনরূপ চিহ্ন করা হইবে; সেইরূপ 'ঔশ্'এর 'শ'কার প্রভৃতি অনুবন্ধবর্ণ স্থানেও 'ক্শ', 'খ্শ' বা অন্য কোন রূপ চিহ্ন করিব। তাহা হইলেই সেই চিহ্নদ্বারা 'শ'কার প্রভৃতি বর্ণ যে ইৎসংজ্ঞাবোধক তাহা জানা যাইবে। আর অনুবন্ধ বর্ণের লোপের জন্য যে সংজ্ঞালোপের (সংজ্ঞাবোধক চিহ্নের লোপের) কোনও সূত্র করিতে হইবে, তাহাও নহে। কারণ 'সংজ্ঞা' শব্দের স্বাভাবিক শক্তিই এই যে, সে সংজ্ঞীর বোধ জন্মাইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূল।—সিদ্ধ্যত্যেবম্। অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাসমেবাস্তু।

নহু চোক্তং সংজ্ঞাধিকারঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থ ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো যথা লোক-ইতি। ন চ যথা লোকে তথা ব্যাকরণে। প্রমাণভূত আচার্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রং প্রণয়তিস্ম তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে ; কিন্তু অপাণিনীয় ত হইবে অর্থাৎ পাণিনিবিরুদ্ধ ত হইবে ?

তবে পাণিনি যেরূপ সূত্র করিয়াছেন, সেইরূপই হউক ! যদি বল যে, পূর্ব্বে যে দোষ উক্ত হইয়াছে,—"যেমন, লোকমধ্যে দেখা যায় যে, কোন বস্তুর কোনও সংজ্ঞা (নাম) না করিলে, লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না ; সেইরূপ এখানেও যে, 'বৃদ্ধি' শব্দ কি জন্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না ; এই জন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞা শব্দের অধিকার (অনুবৃত্তি) করা কর্ত্তব্য" ?

তাহা হইতে পারে না। কারণ, অপ্রামাণিক লোকগণ মধ্যে, যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ব্যাকরণে তাহা হওয়া কখনও সম্ভব নহে। যেহেতু, ব্যাকরণের আচার্য্য পাণিনি, কুশনির্ম্মিত পবিত্র (১) হস্তে ধারণ করিয়া, অতি পরিশুদ্ধ সময়ে, পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার একটী বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না ; এত বড় বড় সূত্রের আর কথা কি ?

ভাষ্যানুবাদ।—কিমতো যদশক্যম্। অতঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেব। কুতোহ্ন্যথেতৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেবেতি। ন পুনঃ সাধ্বনুশাসনেঽস্মিন্শাস্ত্রে সাধুত্বমনেন ক্রিয়তে। কৃতমনয়োঃ সাধুত্বম্। কথম্। বৃধিরস্মায়বিশেষেণোপদিষ্টঃ প্রকৃতিপাঠে তস্মাৎ ক্তিন্প্রত্যয়ঃ। আদৈচোপ্যক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্টাঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা দ্বারা কি বোধ হইবে যে, যে জন্য একটী বর্ণও অনর্থক বলিতে সমর্থ হইব না ?

ইহা দ্বারা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র দ্বারা) সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীরই বোধ হইবে। এঁ্যা ; কেনই বা নিশ্চিতরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞীরই বোধক হইবে ? "আর সাধু (পরিশুদ্ধ) শব্দের অনুশাসনের জন্য প্রণীত এই শাস্ত্রে, এই সূত্র দ্বারা সাধুত্বই বিধান করিতেছেন," এই কথাই কেন বলা হয় না ?

তাহা হইতে পারে না ; কারণ, 'বৃদ্ধি' এবং 'আদৈচ্' এই শব্দদ্বয়ের সাধুত্ব পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ রহিয়াছে।

(১) দুই গাছি কুশদ্বারা নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়বিশেষের নাম 'পবিত্র'।

কিরূপে ?

বৃধি (বৃদ্ধি অর্থবাচক) ধাতু, ইহাকে প্রকৃতি (ধাতু) পাঠে, অবিশেষ রূপে (অর্থাৎ বৃদ্ধি অর্থ ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ অর্থে নহে,) উপদেশ করা হইয়াছে ; তদুত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'বৃদ্ধি' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব 'বৃদ্ধি' শব্দ যে সাধু, তাহা সিদ্ধই আছে। আর এইরূপ আদৈচ্ (আ, ঐ এবং ঔ) বর্ণসমূহও (স্বতঃসিদ্ধ) অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দদ্বয় সাধু করিবার জন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের প্রয়োজন হইতে পারে না ; অতএব, সংজ্ঞাসংজ্ঞিবোধনই এই সূত্রের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূল। প্রয়োগনিয়মার্থং তর্হীদং স্যাৎ। বৃদ্ধিশব্দাৎ পরে আদৈচঃ প্রয়োক্তব্যা ইতি। নেহ প্রয়োগনিয়ম আরভ্যতে। কিং তর্হি। সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পদান্যুৎসৃজ্যন্তে তেষাং যথেষ্টমভিসম্বন্ধো ভবতি। তদ্‌যথা। আহর পাত্রং পাত্রমাহরেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে প্রয়োগের নিয়মের জন্য এই সূত্র করা হইয়াছে, সেই নিয়ম এই যে, সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি শব্দের পরে, আ, ঐ, ঔ বর্ণসমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই স্থলে অর্থাৎ এই গ্রন্থে কোথাও শব্দসমূহ পূর্ব্বাপর স্থাপনের নিয়ম আরম্ভ করা হয় নাই।

তবে কি ?

পদসমূহকে সংস্কার করিয়া করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে, তাহাদিগের, যেমন ইচ্ছা তেমনই (জনগণ কর্ত্তৃক) ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন;—'আহর পাত্রং' (আহরণ কর পাত্রকে) এইরূপও ব্যবহার হয় ; অথবা 'পাত্রমাহর' (পাত্রকে আহরণ কর) এইরূপও ব্যবহার হয়।

ভাষ্যমূল।—আদেশাস্তর্হীমে স্যুঃ। বৃদ্ধিশব্দস্যাদৈচ আদেশাঃ। ষষ্ঠী-নির্দ্দিষ্টস্যাদেশা উচ্যন্তে। ন চাত্র ষষ্ঠীং পশ্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহারা আদেশবাচক হউক ! 'বৃদ্ধি' শব্দ স্থানে আ, ঐ, ঔ, আদেশ হইবে। তাহা হইতে পারে না ; কারণ, ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শব্দেরই আদেশ বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে (বৃদ্ধি শব্দে) ষষ্ঠী বিভক্তি দেখিতে পাই না।

ভাষ্যমূল।—আগমাস্তর্হীমে স্যুঃ। বৃদ্ধিশব্দস্যাদৈচ আগমাঃ। আগমা অপি ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্যৈবোচ্যন্তে। লিঙ্গেন চ। ন চাত্র ষষ্ঠীং ন চাত্র আগমলিঙ্গং পশ্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহারা আগমবাচক হউক! বৃদ্ধি শব্দের, আ, ঐ, ঔ আগম হইবে?

তাহা হইতে পারে না। কারণ, আগমও ষষ্ঠীবিভক্তিনির্দ্দিষ্ট শব্দেরই বলা হয়। অথবা আগমবিশিষ্ট শব্দে (যেমন,'কুক্'আগমে উকার ও ককার ইৎরূপ) চিহ্ন থাকে। সেই চিহ্নের দ্বারা জানা যায় যে, এইটী আগমবাচক শব্দ। কিন্তু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্',এই সূত্রে,না দেখি ষষ্ঠী বিভক্তি,না দেখি আগমবোধক কোন চিহ্ন।

ভাষ্যমূল।—ইদং খল্বপি ভূয়ঃ সামানাধিকরণ্যমেক বিভক্তিকত্বং চ দ্বয়োশ্চৈতদ্ভবতি। কয়োঃ। বিশেষণবিশেষ্যয়োর্বা সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোর্বা। তত্রৈতৎ স্যাদ্ বিশেষণবিশেষ্যে ইতি। তচ্চ ন। দ্বয়োর্হি প্রতীতপদার্থকয়োর্বিশেষণবিশেষ্যভাবো ভবতি। ন চাদৈচ্ছব্দঃ প্রতীতপদার্থকঃ। তস্মাৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেব।

ভাষ্যানুবাদ। ইহা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ এবং 'আদৈচ্' শব্দ), অত্যন্ত সমানাধিকরণবিশিষ্ট এবং (উভয় শব্দই) একবিভক্তিবিশিষ্ট। ইহা আবার দুই রকম হইয়া থাকে।

কাহাদের, (অর্থাৎ পরস্পর সামানাধিকরণ্য ও একত্ব কাহাদের হইয়া থাকে?)

বিশেষণ বিশেষ্যের অথবা সংজ্ঞা সংজ্ঞীর।

তবে সেইস্থলে ('বৃদ্ধি' শব্দে এবং 'আদৈচ্'শব্দে) ইহা বিশেষণবিশেষ্যই হউক!

তাহাও হইবে না। কারণ, দুইটী প্রতীতপদার্থকের অর্থাৎ যে সকল পদ ও অর্থের প্রতীতি পূর্ব্ব হইতেই লোকের বিদ্যমান আছে, তাহাদেরই বিশেষণ বিশেষ্য ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু 'আদৈচ্' শব্দ যে কি পদ, ইহার অর্থই বা কি, কি জন্যই বা ইহার প্রয়োজন, তাহার কিছুই কাহারও প্রতীতি নাই; অতএব ইহা প্রতীতপদার্থক নহে। অতএব ইহারা ('বৃদ্ধি' এবং 'আদৈচ্') সংজ্ঞাসংজ্ঞিবাচকই সিদ্ধ হইল।

ভাষ্যমূল।—তত্র ত্বেতাবান্ সন্দেহঃ কঃ সংজ্ঞী কা সংজ্ঞেতি। স চাপি ক সংদেহঃ। যত্রোভে সমানাক্ষরে। যত্র ত্বন্যতরল্লঘু সা সংজ্ঞা যদ্গুরু স সংজ্ঞী। কুত এতৎ। লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে এই সংদেহ হইয়া থাকে যে, সংজ্ঞীই বা কোন্টী সংজ্ঞাই বা কোন্টী?

এই সন্দেহও হইতে পারে না। কারণ, সেই সন্দেহ কোথায় হইয়া থাকে ? না, যেখানে উভয়পক্ষে (সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতে) সমান অক্ষর হইয়া থাকে) যেখানে উভয়ের মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত লঘু, সেইটী সংজ্ঞা, যেটী গুরু, সেইটী সংজ্ঞী।

কেন এইরূপ হইবে ?

এইরূপ হইবার কারণ এই যে, লঘুপ্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ যাহাতে লঘু উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্যই সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'বৃদ্ধি', ইহা একটী মাত্র শব্দ, 'আদৈচ্' অর্থাৎ আ, ঐ, ঔ, তিনটী শব্দ ; অতএব তিনটী শব্দ সংজ্ঞা না হইয়া একটী শব্দ অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' শব্দই সংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—তত্রাপ্যয়ং নাবশ্যং গুরুলঘুতামেবোপলক্ষয়িতুমর্হতি। কিং তর্হি। অনাকৃতিতামপি। অনাকৃতিঃ সংজ্ঞাকৃতিমন্তঃ সংজ্ঞিনঃ। লোকেঽপি হ্যাকৃতিমতোমাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে অবশ্যই ইহা যে কেবল গুরুলঘুতাকেই উপলক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নহে। তবে কি ?

ইহা অনাকৃতিতাও লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আকৃতিহীন সংজ্ঞা, আকৃতি অর্থাৎ যাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রহিয়াছে এবং যে, সময়ে পরিবর্ত্তনশীল, সেই আকৃতিবিশিষ্ট সংজ্ঞী। যেমন লোকমধ্যেও আকৃতিবিশিষ্ট (বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধাদিপরিবর্ত্তনবিশিষ্ট) মাংসপিণ্ডের, 'দেবদত্ত' এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূল।—অথবাবর্ত্তিন্যঃ সংজ্ঞা ভবন্তি। বৃদ্ধিশব্দশ্চাবর্ত্ততে নাদৈচ্ছব্দঃ। তদ্যথা। ইতরত্রাপি দেবদত্ত শব্দ আবর্ত্ততে ন মাংসপিণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহা আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ পাঠ) বিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই সংজ্ঞা। ব্যাকরণে বৃদ্ধি শব্দের অনেক বার আবৃত্তি হইয়াছে ; কিন্তু 'আদৈচ্' শব্দের তাহা হয় নাই। সুতরাং 'বৃদ্ধি' শব্দই সংজ্ঞাবাচক। যেমন ;—অন্যত্রও অর্থাৎ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্যস্থানে (লোকমধ্যে), সংজ্ঞাবাচক 'দেবদত্ত' শব্দই আবর্ত্তিত হয় ('দেবদত্ত' নাম একশত জন লোকে একশতবার ডাকিলে, একশত বারই আবর্ত্তিত হয়) ; কিন্তু সংজ্ঞী যে দেবদত্তের শরীরস্থিত মাংসপিণ্ড, তাহার আবৃত্তি হয় না।

ভাষ্যমূল।—অথবা পূর্ব্বোচ্চারিতঃ সংজ্ঞী পরোচ্চারিতা সংজ্ঞা। কুত এতৎ। সতোহি কার্য্যিণঃ কার্য্যেণ ভবিতব্যম্। তদ্যথা। ইতরত্রাপি

সতো মাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে। কথং বৃদ্ধিরাদৈজিতি। এতদেকমাচার্য্যস্য মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকানি ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষকাণি চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুরিতি। সর্ব্বত্রৈব হি ব্যাকরণে পূর্ব্বোচ্চারিতঃ সংজ্ঞী পরোচ্চারিতা সংজ্ঞা। অদেঙ্ গুণ ইতি যথা।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহা, পূর্ব্বে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে সংজ্ঞী জানিবে; আর যাহা পরে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে সংজ্ঞা জানিতে হইবে।

কেন এইরূপ হইবে?

তাহার কারণ এই যে, কার্য্যী বিদ্যমান থাকিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। যেমন;—ব্যাকরণ ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ লোকমধ্যেও ব্যবহার দেখা যায় যে, বিদ্যমান যে মাংসপিণ্ড, তাহারই 'দেবদত্ত' সংজ্ঞা করা হয়। অর্থাৎ যেমন হাতপাবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড পূর্ব্বে দেখাইয়া পরে, মনুষ্যগণ, তাহার 'দেবদত্ত' প্রভৃতি নাম রাখিয়া থাকেন, যাহার নাম রাখা হইবে, পূর্ব্বে তাহাকে না দেখাইয়া নাম রাখিতে পারেন না; সেইরূপ ব্যাকরণেও যাহার সংজ্ঞা করা হইবে, সেই সংজ্ঞীকে পূর্ব্বে দেখাইয়া পরে তাহার সংজ্ঞা রাখা হইয়াছে।

যদি এই নিয়মই সত্য হয়, তবে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি'-শব্দ, কিরূপে পূর্ব্বে হইল?

আচার্য্যের (অত্যন্ত মাননীয় ঋষির) এই একটী প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইলেও মঙ্গলাচরণের জন্য করিয়াছেন বলিয়া সহ্য করুন। কারণ, মঙ্গলকারী আচার্য্য, অত্যন্তমহৎ শাস্ত্র (সূত্র) সমূহের মঙ্গলাচরণের জন্য বৃদ্ধিশব্দ আদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। আদিতে মাঙ্গলিকশব্দবিশিষ্ট শাস্ত্রসমূহ, বিস্তীর্ণ (দেশ বিদেশে প্রচারিত) হয়। মাঙ্গলিক শব্দের ব্যবহারকর্ত্তা পুরুষও বীর হন এবং দীর্ঘায়ু হন। আর মঙ্গলাচরণবিশিষ্ট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অধ্যয়নশীল বিদ্যার্থিগণও যাহাতে বৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, এইজন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বৃদ্ধিশব্দ পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা ব্যাকরণের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে উচ্চারিত শব্দ সংজ্ঞী এবং পরে উচ্চারিত শব্দ সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন;—'অদেঙ্ গুণঃ' ।১।১।২। ('অৎ' অর্থাৎ হ্রস্ব অকার, 'এঙ্' অর্থাৎ 'এ'কার এবং 'ও'কার 'গুণ'সংজ্ঞক হয়) এইসূত্রে, পূর্ব্বোচ্চারিত 'অদেঙ্' শব্দ সংজ্ঞিবাচক এবং পরোচ্চারিত 'গুণ' শব্দ সংজ্ঞাবাচক হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—দোষবান্ খল্বপি সংজ্ঞাধিকারঃ অষ্টমেঽপি হি সংজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে তস্য পরমাম্রেড়িতমিতি। তত্রাপীদমনুবর্ত্ত্যং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আর 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞা শব্দের অধিকার করিলে, সেইটী দোষবিশিষ্টও হয় বটে; কারণ, তাহা হইলে আবার অষ্টমঅধ্যায়ে, 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্।৮।১।২। (দ্বিরুক্তের যে পরের রূপ, তাহার আম্রেড়িত সংজ্ঞা হয়; যেমন,—'পটৎ পটৎ' ইহার পরের 'পটৎ' আম্রেড়িত সংজ্ঞা-[illegible]) প্রভৃতি সংজ্ঞাবাচক সূত্রেও আবার সংজ্ঞাধিকার করিতে হইবে।

তাহা করিতে হইবে না; কারণ, সেখানেও ইহা (সংজ্ঞাধিকারক 'সংজ্ঞা' [illegible]) অনুবৃত্তিবিশিষ্ট হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবাঽস্থানেঽয়ং যত্নঃ ক্রিয়তে নহীদং লোকাদ্ভিদ্যতে। যদীদং লোকাদ্ভিদ্যেত ততো যত্নার্হং স্যাৎ। তদ্যথা। অগোজ্ঞায় কশ্চিদ্‌গাং সক্‌থনি কর্ণে বা গৃহীত্বোপদিশতি অয়ং গৌরিতি। ন চাস্যাচষ্টে ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। ভবতি চাস্য সংপ্রত্যয়ঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ কৃতঃ পূর্ব্বৈরভিসম্বন্ধ ইতি। ইহাপি কৃতঃ পূর্ব্বৈরভিসম্বন্ধঃ। কৈঃ। আচার্য্যৈঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ। যস্মৈ তর্হি সম্প্রত্যুপদিশতি তস্যাকৃত ইতি। লোকেঽপি যস্মৈ সম্প্রত্যুপদিশতি তস্যাকৃতঃ। অথ তত্র কৃতঃ। ইহাপি কৃতো দ্রষ্টব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সকল যত্ন অস্থানেই (যত্ন করিবার অযোগ্য স্থানে) করা হইতেছে। কারণ, ইহা ত লোকবিরুদ্ধ হয় নাই। যদি ইহা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র) লোকবিরুদ্ধ হইত, তবে এই সকল যত্নযোগ্য হইত। যেমন;—কোন গোজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে, গোবিষয়ক জ্ঞান দেওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি কোনও গোর সক্‌থি (উরু) অথবা কর্ণে ধরিয়া উপদেশ করে যে, এইটী গো, কিন্তু ইহা তাহাকে বলে না যে, ইহা (এই গো শব্দ) ইহার (গোর) সংজ্ঞা। অথচ তাহাতেই তাহার (গোজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির) বোধও হইয়া থাকে।

সেই স্থলে, এইরূপ বলিব যে, পূর্ব্ব হইতেই ইহার (গো শব্দের) সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই প্রতীতি হইয়াছে? তবে আমরা বলিব যে, এখানেও পূর্ব্ব হইতেই (বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞা এইরূপ) সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে?

কাহা দ্বারা সম্বন্ধ করা হইয়াছিল?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুত নরেন্দ্র, গিরিশ ঘোষ ডাক্তার সরকার ইত্যাদির কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভজনানন্দে সমাধিমন্দিরে]

পরদিন ২৭এ অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা।

আজ নরেন্দ্র,* ডাক্তার সরকার, শ্যামবসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর বলিলেন, 'তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও আমি আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুনবেন?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ—ভাব চেপে রাখতে হবে।'

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন ;—

চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ তোমারি ভাণ্ডার ;
হে মহেশ, অগণন লোক গায় ধন্য ধন্য এই গীতি অনিবার।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন,—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।
অনন্ত আঁধারকোলে, মহা নির্ব্বাণহিল্লোলে,

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

চিরশান্তিপরিমল, অবিরত যায় ভাসি।
মহাকালী রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি ;
অভয় পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him' (এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্‌ছে? তিনি উত্তর করিলেন, 'ডাক্তার ভয় কর্‌ছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে একটু ভাবস্থ হইয়াছেন, ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন, 'না, না, কেন ভাব হবে?' কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গম্ভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির। অবাক্‌, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়।

নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন;—

কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

তিনি আবার গাইলেন—

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ, চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।

কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাই হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষবিষ ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দনিলয় হে।

'সতীর পবিত্র প্রেম', গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা!

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম,
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন,
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন,
লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায়, কবে যাবে আমার ধরম করম,
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম,
পরিহরি অভিমান লোকাচার—
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি,
কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়া সকলে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের, বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও, স্ত্রীর—আপামর সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল, সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লজ্জা ত্যাগ কর; ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।'

"আমি এত বড় লোক, আমি 'হরি হরি' বলে নাচ্‌বো? বড় বড় লোক এ কথা শুন্‌লে আমায় কি বল্‌বে? যদি বলে, 'ওহে ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে। কি লজ্জার কথা! এ সব ভাব ত্যাগ কর।"

ডাক্তার। আমার ও দিক্ দিয়েই যাওয়া নেই। লোকে কি বল্‌বে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটী খুব আছে। (সকলের হাস্য।)

[বিজ্ঞান কিরূপে হয়—ব্রহ্মদর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয়-বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। সে কাঁটাটী তোলবার জন্যে আর একটী কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটী তোল্‌বার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটাটী দূর কর্‌বার জন্য, জ্ঞানকাঁটা আন্‌তে হয়; তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুটীই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম! একি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী

স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন! রাম বল্লেন 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। তিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচিঅশুচির পার।'

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলেরে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামামারে পাবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
তাদের জ্ঞানখড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি।
অহংকার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি,
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি,
তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি।

[অবাঙ্মনসোগোচরম্; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না]

শ্যামবাবু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যশুদ্ধবোধরূপং। তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ঘী কেমন খেলে। তাকে এখন কি করে বুঝাবো? হদ্দ বলতে পার, 'কেমন ঘী, না যেমন ঘী।' একটী মেয়েকে তার একটী সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী বল্লে 'ভাই তোর স্বামী হলে তুই জানবি, এখন তোকে কেমন করে বুঝাব।' 'পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে

ভগবতীকে বল্লেন, মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি কর্‌তে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

"ব্রহ্ম কি জিনিস মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ পুরাণ তন্ত্র আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বল্‌তে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই। আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ, যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে,সে জানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পণ্ডিত ও অহঙ্কার]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হব কবে, আমি যাব যবে।' 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটী অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে, হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব কর্‌ছো। আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ। তোমার গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা কর্‌বার আমার অধিকার।

"যারা একটু বৈ টৈ পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে। —ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, 'ও সব আমি জানি।' আমি বল্লুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গিছি, আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু?

শ্রীমহেন্দ্র। তিনি (—ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওগো বল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটা মেথরাণীর যে অহঙ্কার। তার গায়ে দু-একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু-একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠ্‌লো, 'এই! সরে যা।' তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি বল্‌বো!

[পাপ পুণ্য ।]

শ্যামবসু। মহাশয়, পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব করছেন, এ কি রকম কথা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি !

নরেন্দ্র। সোণার বেণে বুদ্ধি অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো, তুই আম খেয়েনে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কায কি ? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা ! (শ্যাম বসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বরসাধন করবার জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কায কি ? ফিলজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার করে তোমার কি হবে ? দেখ, আধ পো মদে তুমি মাতাল হতে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার ?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ infinite ! সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি।) আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন ? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বল্‌বে ? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) তোমাদের ঐ এক ! কল্‌কাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ !' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেচেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেচেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

[লোকমান্য কি জীবনের উদ্দেশ্য ?]

হেম দক্ষিণেশ্বর যেত। দেখা হলেই আমায় বল্‌তো, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই, জগতে এক বস্তু আছে—মান ?' ঈশ্বরলাভ যে মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সূক্ষ্মশরীর।)

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে। কোন্ শালা মানবে আর না মানবে, তাদের দায় কি ; একটা বড় লোক হাতে থাক্‌বে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না।

শ্যামবসু। আচ্ছা, স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি?

[স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটা স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটী কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু। সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়)—মুখে বলা যায় না।

[সাধনের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো!

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখ্‌লেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের, এ সব সূতার ব্যবসা না কর্‌লে কি বলা যায়? যাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতা বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কা'কে বলে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

[ঈশ্বরে ভক্তি একমাত্র সার।]

"যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌বে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা কর্‌বে।

"অহল্যার শাপ মোচনের পর রামচন্দ্র তাঁকে বল্লেন, 'তুমি আমার কাছে বর লও।' অহল্যা বল্লেন, 'রাম, যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।'

"আমি মা'র কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মা'র পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাতযোড় করে বলেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও

তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

"ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ নিতে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।

"যদি কাহারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম! এখানে একটী কথা বলি, বুদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল। শূকরমাংস খাওয়া আর Colic ও (পেটে শূলবেদনা) হওয়া। এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ opium (আফিঙ) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো, বাহ্যজ্ঞান থাকতো না—তাই 'নির্ব্বাণ'।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যাম বসুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হয়ে, কায কর্ম্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাযকর্ম্মও করে, কিন্তু তার মন যেমন ফোড়ার দিকে পড়ে থাকে, সেইরূপ।

"সংসারে নষ্টমেয়ের মত থাকবে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কায করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব যদি না থাকে, বুঝ্‌ব কেমন করে ?

শ্যামবসু। কিছু বোঝো বই কি! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধরে কর্‌ছেন! কি বল ? (সকলের হাস্য)।

[থিয়সফি Theosophy]

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফী) কি রকম বলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই—যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। আর একদেশে একজন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। এই সব লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophistরা) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মর্‌বার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে, আমার ভাব কি রকম জান ? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি ? হনুমান বল্লে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।' আমার ঠিক ঐ ভাব।

শ্যামবসু। তারা বলে, 'মহাত্মারা' সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। ও সব কথা এখন থাক্। আমার অসুখটা কম্‌লে আস্‌বে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হয়ে যাবে। দেখ্‌ছো তো, আমি টাকা লিই না, কাপড় লিই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না—ও সবতো অনেক কর্‌লে—টাকা, মান, Lecture—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হবে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময়ে

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না। যাই চলে যাব যাব হয়েছি, অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় একদিন সেখানে (Science Associationএ) নিয়ে যাবে ?

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(গুরুপূজা।)

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর--but do not worship him as God. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ !

গিরীশ। কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার কর্‌লেন, তাঁকে আর কি কোর্‌বো বলুন। ওঁর গু কি গু বোধ হয় ?

ডাক্তার। গুর জন্যে হচ্চে না। আমার ও ঘৃণা নাই। একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেল্লে। সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ, নিচ্চি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য কর্‌ছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি—এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ।)

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন ? যেমন Vegetable Creation (উদ্ভিদ্) ও Animal Creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটী (point) স্থান আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।

ডাক্তার। ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র। আমি God (ঈশ্বর) বল্‌ছি না, God-like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) বল্‌ছি।

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না। My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সেকি ! এরা তোমায় কত ভালবাসে ! তুমি আস্‌বে বলে বাসক সজ্জা জেগে থাকে !

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you.

ডাক্তার। আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত—আমায় মনে করে hardhearted,—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারও কাছে প্রকাশ করি না।

গিরীশ। তবে মহাশয়, আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at least out of pity for your friends—এই মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না ?

ডাক্তার। বল্‌বো কি ! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked up হয়, (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude !

(মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ।)

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ভাল, তুমি যে ভাব হয়ে লোকের গায়ে পা দেও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না ?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকুতো বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয়, তা তোমায় কি বল্‌ব ? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্চে ঐ জন্তে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি কর্‌বো ?

ডাক্তার। (শিষ্যগণের প্রতি) ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does, কাযটা sinful এটা বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো খুব শঠ্ (বুদ্ধিমান)। তুই বল্ না, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সে জন্ত দুঃখিত হন্ নি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্ত তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত পড়্‌তুম ? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্তায় কায ? রোগের জন্ত regret হতে পারে, তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্ত স্পর্শ করাকে অন্তায় কায মনে করেন না।

ডাক্তার। (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি)। তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলা দাও (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তে হবে।

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific discovery কর্‌বার জন্ত আপনি life devote কর্‌তে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences—এর জন্ত ইনি health risk কর্‌বেন না ?

(অবতারাদি।)

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য) হয়েছে, Jesus (যীশু), Chaitanya (চৈতন্ত), Buddha, (বুদ্ধ), Mohamed (মহম্মদ), সব শেষে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—বলে আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক। একি কথা ?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

আপনি একলা তাঁদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship bordering on divine worship.

মরণে জীবন।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

শুনিনু সে সঙ্গীত মহান্—
গম্ভীর আকাশ হতে, বলে কেবা দিনেরাত,
কি কাযে ঘুরিস ওরে মানবসন্তান ?

খুলে গেল আঁখি—
দেখিলাম ভাবনেত্রে, এই মর কর্ম্মক্ষেত্রে,
দু দিনের তরে সব—ফাঁক ফাঁকি ফাঁকি !

আমি আত্মা শুধু ভাবময়—
দেহ—সে বন্ধনমাত্র, ভরমের লীলাক্ষেত্র,
পদে পদে গাঁথা তাহে বিঘ্নবাধাচয়।

কেমনেতে মুক্ত তবে হই ?
কহে অশরীরী বাণী, মৃত্যু তার পথ জানি,
ভরসা থাকে তো যদি বিবরিয়া কই।

'মৃত্যু' শব্দে চমকিত মন।
এত লীলা খেলা ভবে, মরণের তরে তবে,
মরণে এ ব্রত উদ্‌যাপন ?

'মৃত্যু' পুন কহিল সে বাণী—
রহস্য ভেদিতে চাও, মৃত্যুর শরণ লও,
মুক্তির এই পথ জানি।

হস্ত পদ অনাড় আমার।
ঘরে ভার্য্যা গুণবতী, অঙ্কে কন্যা স্নেহমতী,
বক্ষে পুত্র গুণের আধার।

বৃদ্ধ মুগ্ধ জনক জননী;
ছাড়িয়ে তাঁদের সেবা, মৃত্যুপথে যাবে কেবা
একি শুনি ভয়ঙ্কর বাণী?

কর্ত্তব্য সে পর উপকার;
সে মহান্ লক্ষ্য ছাড়ি, মৃত্যুপথ অনুসারী
হইলে, হইবে কিবা ফল সে আমার?

পুন বজ্রগম্ভীরস্বরে—
কহে অশরীরী বাণী—"'মৃত্যু' এর পথ জানি—
যাও পুছ সদ্‌গুরুবরে।

"যাও নগরাজ হিমাচলে;
গুহামাঝে যোগিবর, ধ্যানমগ্ন নিরন্তর
মৃত্যুতত্ত্ব কহিবে সুধালে।"

এত কহি নীরব সে বাণী;
সঙ্গীতলহরী পুন, করে মোরে বিচেতন,
আনন্দের মদিরা প্রদানি।

মূর্চ্ছাভঙ্গে সব বিস্মরণ—
ভাসি গেল মোহমায়া, যায় যাবে যাক্ কায়া,
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পতন।

এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া,
দৈববাণী অনুসারি, পদব্রাজী, বনচারী,
কত দিনে হিমালয়ে উতরিনু গিয়া।

গুরুদেব সনে দেখা হলো;
উপাসনা মৃত্যুমন্ত্রে (লেগে গেছে হৃদিতন্ত্রে)
করি বহুদিন হৃদে পাইয়াছি আলো।

জানিয়াছি, দেহত্যাগ বড়ই কঠিন।
বাসনার অধিকার, যতদিন পরিহার
না হইবে—পুনঃ পুনঃ জন্মের অধীন।

সমাধিরে মৃত্যু শাস্ত্রে কয়—
সমাধিমরণ হবে, মনেন্দ্রিয় মরে যাবে,
হইবে চৈতন্যচন্দ্র আনন্দে উদয়।

মরিবে সে বিষয়কামনা,
'আমি' তও মরে যাবে, সুখ দুঃখ মরে যাবে,
মরে যাবে রিপুকুল—মরিবে ভাবনা—

মরিবে সে স্নেহ বুকভরা,
ভালবাসা মরে যাবে— জগৎ শ্মশান হবে,
নাচিবে কেবল সেই আত্মা সারাৎসারা।

শূন্যময় হইবে ভুবন—
আমি তুমি ঘুচে যাবে— সব শূন্যময় হবে,
শুধু রহিবেক সেই প্রলয়গর্জ্জন—

যে আহ্বানে হয় জীব তোমার চেতন।
শুধু মৃত্যু নয়—এ যে মহান্ মরণ—
সর্ব্ববিস্মরণকারী মহা জাগরণ!
মৃত্যু নহে এ ত—এ যে মহান্ জীবন!!

যাহা অনন্ত, তাহাই সুখস্বরূপ ; ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখ নাই। যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই অনন্ত বা ভূমাপদবাচ্য, আর যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহাই ক্ষুদ্র বা সান্ত বা অল্পপদবাচ্য। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত ; যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য। সেই ভূমা আপন মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, অথবা তিনি কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদের প্রতি
সনৎকুমারবাক্য।

পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টিই নিরপেক্ষ সত্তা, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিবন্তর গতি-শীল, এক সময়েই উহা অপরিণামী ও পরিণামী, সগুণ নির্গুণ উভয়ই। আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা আর তত্ত্বমসির অর্থ ইহাই। আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি আর অদ্বৈতবাদ আমা-দিগকে বিষমভাবাপন্ন জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি, তাহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন—উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে আর বাস্তবিক পক্ষে উহা সমুদ্র সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্রস্বরূপ, কারণ, যে অনন্ত শক্তিরাশি ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, তাহার সমুদয়ই তোমার ও আমার। তুমি, আমি, এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত—যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে প্রকাশ করিতেছে আর এই যে পরিবর্ত্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশমাত্র, কিন্তু অনন্তের এ পারে, সান্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ-লাভ করি না কেন, উহারা কখনই এজগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। উহাদিগকে যে আমরা উপার্জ্জন করিব, তাহা নহে, উহারা আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে আর ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্ব্বলতা শিক্ষা দিতেছে, জন্মাবধিই আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্ব্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যুক্তি বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহারা কোথা হইতে আসিয়া থাকে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। বহি-

দেশে কোন্ জ্ঞান আছে? আমাকে এক বিন্দুও দেখাও। জ্ঞান কখন জড়ে ছিল না; উহা বরাবর মনুষ্যের ভিতরই ছিল। কেহ কখন জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে। উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ঐ সর্ষপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে—ঐ মহাশক্তিরাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটী জীবাণুকোষের ভিতর অত্যদ্ভুত প্রখরা বুদ্ধি কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করে, তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, ইহা সত্য। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও, ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটী জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি আর আমাদের যাহা কিছু ক্ষুদ্রশক্তি রহিয়াছে, তাহা তথায়ই কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত, রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্ব্বত প্রস্তুত কর, দেখ, তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্ত ভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই, মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে। কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে যেন এই অনন্তশক্তিমান দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের উপর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যখন এই অনন্তজ্ঞান পুনর্লাভ হইবে, তখন জ্ঞান ও শক্তিমান হইয়া এই দৈত্য দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে এই অবস্থা আনয়নে সাহায্য করি।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা এ পর্য্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অদ্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধবিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মত সকলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটী বিশেষ সীমাবিশিষ্ট আত্মা আছে। প্রত্যেক

ভাবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ আছে, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে ইহাই প্রধান বিচারের বিষয় ছিল;—বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি পূর্ব্বদিনই তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইউরোপে দ্রব্যগুণসম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মত। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর একদলের মতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণই স্বয়ং থাকিতে পারে। অবশ্য আত্মাসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন মত অহংসারূপ্যগত যুক্তির উপর স্থাপিত—'আমি আমিই', কল্যকার যে আমি, অদ্যও সেই আমি, আর অদ্যকার আমি আবার আগামীকল্যের আমি হইব, শরীরে যাহা কিছু পরিণাম হইতেছে, তৎসমুদয় সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্ব্বদাই একরূপ। যাঁহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই তর্ক করিতেন, আমরা যাহা কিছু জানি, অথবা যাহা কিছু জানা সম্ভব, তাহারা এই পরিণামমাত্র। একটী অপরিণমা ও অপরিণামী দ্রব্যস্বীকার কেবল বাহুল্যমাত্র, আর বাস্তবিক যদিও এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহা বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপেও কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানকালেও ইউরোপে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে—একদলের বিশ্বাস—অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে। ইঁহাদের সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি—হার্ব্বার্ট স্পেন্সার—ইনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি আধুনিক কোম্তের শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ হ্যারিসন ও মিঃ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে, ইহাতেও সেই প্রাচীন গোল বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামিসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল এরূপ স্বীকার করিবার আবশ্যকতাই একেবারে অস্বীকার করিতেছেন। একদল

বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না, অপর দল যুক্তি দেখান, এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি। অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতেও এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কারণ, আমরা দেখিয়াছি, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণাতিরিক্ত পদার্থের সত্তা কথনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, অহং-সারূপ্যগত আত্মার প্রমাণ, স্মৃতি হইতে যে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি, কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ, আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি, এই যুক্তিও কোন কাযের নহে। আর একটী যুক্ত্যাভাস যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। 'আমি যাচ্চি', 'আমি খাচ্চি,' 'আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি,' 'আমি ঘুমুচ্চি,' 'আমি চল্‌চি,' এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন, করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম, কিন্তু উহার মধ্যে 'আমি'টী নিত্য। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই 'আমি' নিত্য ও স্বয়ং একটী ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপেঁচের উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা যাওয়া স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে কলমে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহারকার্য্যের সহিত আমার তাদাত্ম্যভাব হইয়া যায়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন আমি ও দৌড়ান দুইটী পৃথক্ বস্তু থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি আমার অস্তিত্বের সারূপ্য আমার স্মৃতিদ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে সকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না, বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেক লোক, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীত অবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। অনেক উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তির আপনাদিগকে কাচনির্ম্মিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবিতে দেখা যায়। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই অহংসারূপ্য, স্মৃতিবিষয়ক

অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি না। তবে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য আত্মার ধারণা আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথক্ভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব স্থাপন করিতে পারি না, যাহার পশ্চাতে গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথক্রূপে চিন্তা করিতে পারি না এ কথা সত্য আর আমরা পরিণাম ও অপরিণাম এ দুটীও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকে বস্তুই বলা হইতেছে, তাহাই গুণস্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই অপরিণামী সত্তা, পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। পারমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নহে, কিন্তু সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যবহারিক সত্তা হইয়াছেন। অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা যাহাদিগের অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি, শুধু তাহাই নহে, শরীর পর্য্যন্তও সেই আত্মস্বরূপ আর বাস্তবিক আমরা এক সময়ে দুই বস্তুর অনুভব করি না, একটীরই করিয়া থাকি। আমাদের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, এরূপ ভাবা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, আমাদের একটী যাহা হয় কিছু আছে, একটীরই এক সময়ে অনুভব হইয়া থাকে, দুই প্রকারের পর্য্যন্ত অনুভূতি এক সময়ে হয় না।

যখন আমি আমাকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা বৃথামাত্র। আর যখন আমি আমাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে বস্তুর অনুভব কেহই করিতে পারেন না।

এইটী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্জুসর্পের

দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায় আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটাই অবশিষ্ট থাকে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর পুস্তকে উহা লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থপাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ উভয়েরই অনুভব হইয়া থাকে—বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখন হয় না। হয় দেহ নয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজে মনে মনে উহা পরীক্ষা করিতে পার।

তুমি আপনাকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখ, তুমি দেখিবে, ইহা একরূপ অসম্ভব আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, যখন তাঁহারা আপনাদিগকে আত্মস্বরূপ অনুভব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের দেহজ্ঞান থাকে না। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি, বশীকরণ (Hypnotism) প্রভাব অথবা স্নায়ুরোগ বা অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে এক প্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা জানিতে পার, যখন তাঁহারা ভিতরের কিছু অনুভব করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, মোটেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে, অস্তিত্ব একটী, দুইটী নহে। সেই একই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে। কার্য্যকারণসম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটী অপরটীতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে আর যখন শরীরের অন্তর্দ্ধান হয়, তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধেরা আত্মা ও শরীর এই দুইটী পৃথক্, এই অনুমানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। এক্ষণে অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈতভাব অস্বীকৃত হওয়াতে এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্নরূপ প্রদর্শিত হওয়াতে তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টি সম্বন্ধেই সত্য

হইতে পারে, ব্যষ্টিসম্বন্ধে নহে। পরিণাম—গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী, কারণ, অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী, কারণ, উহা ব্যতীত আর কিছু নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অল্প পরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদমতে, সর্ব্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণের বিষয়। ব্যষ্টিসম্বন্ধেই গোলমাল। তবে আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক মতসকলের কি হইবে, যাহারা আমাদের উপর এখনো ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মাসম্বন্ধে কি হইবে?

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিহিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। ইহার কি হইল? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর তাহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই। সেই সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হয়? আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব সদাই বিকাশশীল। এক বটে, অথচ পৃথক্। কালকার আমি আজকার আমিও বটি, আবার নাও বটি। ইহাতে দ্বৈত-ভাবাত্মক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্ব সূত্র রহিয়াছে, এইমত পরিত্যক্ত হইল আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ মত গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু এ পরিণামের ভিতরে একটী সাকল্য রহিয়াছে, উহা নিত্য বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জন্তুবিশেষের (Mollusca) পরিণামমাত্র, তবে সেই জন্তু ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ সেই জন্তুবিশেষের বহুপরিমাণে বিকাশমাত্র। উহা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে, তিনি ক্রমশঃ পূর্ণব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পঁহুছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্ব্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

অদ্বৈতবেদান্তের এক বিশেষ প্রকার গতি ছিল। অনেক সময় ইহাতে উহার অনেক উপকার হইয়াছিল আবার ইহাতে কখন কখন উহার গভীর তত্ত্বের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে; সেই গতি এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধন করা। বর্ত্তমানকালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, তাঁহাদেরও সেই মত ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিতেন, সমুদয়ই ক্রমবিকাশের ফল আর এই মতের সহায়তায় তাঁহারা সহজেই পূর্ব্বে পূর্ব্ব প্রণালীর সহিত এই মতের সামঞ্জস্যবিধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মতই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধমতের এই একটী বিশেষ দোষ ছিল যে, তাঁহারা এই ক্রমবিকাশবাদ বুঝিতেন না, সুতরাং তাঁহারা আদর্শে আরোহণ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানগুলির সহিত তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা পান নাই। বরং সেগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এরূপ গতি ধর্ম্মে বড় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি এক নূতন ও শ্রেষ্ঠতর ভাব কিছু পাইল। তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে, সেগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক ছিল। সে কখন ইহা ভাবে না যে, তাহার বর্ত্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলিকে এখন যতই বিসদৃশ বোধ হউক না, তাহারা তাহার পক্ষে এক সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুছিতে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা ছিল আর আমাদের প্রত্যেককেই সেইরূপ উপায়ে আত্মবিকাশ করিতে হইবে, সেই সকল ভাব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে ভালটুকু লইতে হইবে তৎপরে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এই জন্য অদ্বৈতবাদ প্রাচীনতম মতসমূহের উপর, দ্বৈতবাদের উপর এবং আর আর মত যাহা তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, সকলেরই প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। এরূপ নয় যে, তিনি উচ্চমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সেগুলিকে যেন দয়ার চক্ষে দেখিতেছেন। তাহা নহে; তাঁহার ধারণা, সেগুলিও সত্য; একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ আর অদ্বৈতবাদ যে সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

অতএব মানুষকে যে সকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে হয়, সেগুলির প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্যই বেদান্তে এই সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এই জন্যই দ্বৈতবাদসমতপূর্ণজীবাত্মবাদও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

সেখানে এরূপও ত হইতে পারে যে, যাহাকে (যে শিষ্যকে) সংপ্রতি উপদেশ করা হইতেছে, তাহার সহিত ত পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ করা হয় নাই?

তাহা হইলে লৌকিক বিষয়েও এইরূপই বলিব যে, যে গোজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে সংপ্রতি গোর বিষয় উপদেশ করা হইতেছে, তাহার সহিতও সম্বন্ধ পূর্ব্বে করা হয় নাই?

যদি বল যে, পূর্ব্বেই করা আছে?

তবে এখানেও সেইরূপই করা আছে জানিবে।

বার্ত্তিকমূল।—সতো বৃদ্ধ্যাদিষু সংজ্ঞাভাবাত্তদাশ্রয় ইতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞিবাচক বৃদ্ধ্যাদি সিদ্ধ বর্ণসমূহে, সংজ্ঞার ভাব প্রযুক্ত তদাশ্রয় হেতু, ইতরেতরাশ্রয় হইবে, সুতরাং অসিদ্ধি হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—সতঃ সংজ্ঞিনঃ সংজ্ঞাভাবাত্তদাশ্রয়ে সংজ্ঞিনি বৃদ্ধ্যাদিষিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ। কা ইতরেতরাশ্রয়তা। সতামাদৈচাং সংজ্ঞয়া ভবিতব্যং সংজ্ঞয়া আদৈচো ভাব্যন্তে। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে। তদ্যথা। নৌর্নাবি বদ্ধানেতরত্রাণায় ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরেচি ।৬।১।৮৮।' (অ বর্ণের পরে, 'এচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকিলে, 'বৃদ্ধি' রূপ এক আদেশ হয়) এই সূত্রে, সংজ্ঞাবোধক 'বৃদ্ধি' শব্দের আদেশ হইয়াছে। এই স্থলে, সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' এই শব্দটী না বলিলে কি আদেশ হয়, তাহার কিছুই প্রতীতি হয় না, আবার, আ, ঐ, ঔ, ইহারা যে বৃদ্ধিসংজ্ঞাবাচক, তাহাও ইহারা বর্ত্তমান না থাকিলে, হইতে পারে না। অতএব সংজ্ঞী আ, ঐ, ঔ, ইহারা বর্ত্তমান না থাকিলে, বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইতে পারে না, আবার সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' শব্দ উপস্থিত না থাকিলেও কোন্ কোন্ বর্ণের উপস্থিতি হইবে, তাহার প্রতীতি হয় না। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে;—পূর্ব্বে আ ঐ ঔ প্রভৃতি সংজ্ঞী বর্ত্তমান থাকিলে, পরে তাহা সংজ্ঞাভাব ধারণ করিবে, সুতরাং সংজ্ঞার আশ্রয়স্বরূপ সংজ্ঞীতে, আর 'বৃদ্ধি' এই সংজ্ঞাবোধক শব্দ উচ্চারণ করিলে পরে বোধ হয় যে (আ ঐ ঔ) সংজ্ঞী, তাহার আশ্রয় স্বরূপ 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি সংজ্ঞাসমূহেতে, ইতরেতরাশ্রয় প্রযুক্ত অপ্রসিদ্ধি হইবে।

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয়তা হইল?

সংজ্ঞিবোধক আ ঐ ঔ বর্ত্তমান থাকিলে, পরে তাহার 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি

সংজ্ঞা হইবে। আবার সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিলে পরে (বৃদ্ধিরেচি বৎ) আ ঐ ঔ প্রভৃতির উপস্থিতি হইবে। অতএব ইহারা এক অন্যকে পরস্পর আশ্রয় করিয়াছে।

ইতরেতর অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াছে, এমন যে শাস্ত্র, সে কোনও কার্য্যে প্রকল্পিত অর্থাৎ ব্যবহৃত হইতে পারে না। যেমন, এক নৌকা, অন্য নৌকাতে বদ্ধ থাকিলে, একটা অন্যটাকে ত্রাণ করিতে (স্রোত হইতে উদ্ধার করিতে) পারেনা। (১)

ভাষ্যমূল।—নন্বু চ ভোঃ ইতরেতরাশ্রয়াণ্যপি কার্য্যাণি দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা। নৌঃ শকটং বহতি শকটং চ নাবং বহতি। অন্যদপি তত্র কিঞ্চিদ্ভবতি জলং স্থলংবা। স্থলে শকটং নাবং বহতি জলে নৌঃ শকটং বহতি। যথা তর্হি ত্রিবিষ্টব্ধকম্‌। তত্রাপ্যস্তুতঃ সূত্রকং ভবতি। ইদং পুনরিতরেতরাশ্রয়মেব।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে, ওহে! (দোষদাতা।) ইতরেতরাশ্রয়প্রযুক্ত কার্য্যও ত ব্যবহারে দেখা যায় ?

যেমন,—নৌকা, শকট (গাড়ী) বহন করিয়া থাকে, আবার শকটও নৌকা বহন করিয়া থাকে (২) ?

আর কিছু সেখানে আছে কি,—জল হউক বা স্থলই হউক ? স্থলভাগে, শকট, নৌকাবহন করে ; আর জলভাগে, নৌকা, শকট বহন করিয়া থাকে। অর্থাৎ যদি দুইটী বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, তবেই ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে ; সুতরাং তৎপ্রযুক্ত কোন কার্য্যসিদ্ধিও সম্ভব হয় না।

---

(১) যদি কোনও স্রোত জলে দুই খানি নৌকা ভাসিয়া যায় ; তবে তাহার একখানি নৌকাকে অবলম্বন করিয়া, আর একখানি পার হইতে পারে না। যেহেতু এইখানিও চায় ঐখানিকে ধরিয়া পার হইতে, আবার ঐখানিও চায় এইখানিকে ধরিয়া পার হইতে। অতএব দুইখানিই ভাসিয়া যায়, একখানিও পার হইতে পারে না।

(২) পূর্ব্বে রাজগণ, দিগ্বিজয় বা শত্রুদমনার্থ বহির্গত হইলে, শত্রু রাজার রাজধানীর চতুর্দ্দিকে যে কৃত্রিম গড় বা পরিখা কাটান থাকিত, সেই জলাশয় পার হইবার জন্য, গাড়ীতে করিয়া নৌকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে সেই জলাশয়ে গাড়ী চলিতে পারে না বলিয়া নৌকায় গাড়ী রসদাদি উঠাইয়া তাঁহারা জলাশয় পার হইতেন।

কিন্তু নৌকা ও শকটের মধ্যে, কেবল ইহারা উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে নাই। ইহাদের মধ্যে আর অন্য আশ্রয় জল অথবা স্থল রহিয়াছে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ও হয় নাই ; কার্য্যের বাধাও হয় নাই।

তবে যদি 'ত্রিবিষ্টব্ধকের' (১) দৃষ্টান্ত বল, যে সেখানেও ত তিন খানি কাষ্ঠ, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ?

সেই স্থলেও কেবল তিনখানি কাষ্ঠই যে, দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা নহে। সেখানেও (মৃত্তিকার উপরে থাকে, এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও) অন্ততঃ পক্ষে কাষ্ঠ তিনখানি বাঁধিতে একগাছি সূত্র থাকে। সুতরাং সেখানেও ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয় নাই। এখানে ('বৃদ্ধি'এবং 'আদৈচ্' বিষয়ে) কিন্তু ইতরেতরাশ্রয়ই হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—সিদ্ধংতু নিত্যশব্দত্বাৎ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইস্থলে, শব্দের নিত্যত্ব হেতুই সিদ্ধ হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। নিত্যশব্দত্বাৎ। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু শব্দেষু সতামাদৈচাং সংজ্ঞাঃ ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়া আদৈচোভাব্যন্তে। যদি তর্হি নিত্যাঃ শব্দাঃ কিমর্থং শাস্ত্রম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা (প্রয়োগাদি) সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

শব্দের নিত্যত্ব হেতুই সিদ্ধ হইবে। যে সকল শব্দ সিদ্ধির জন্য এত যত্ন করা হইতেছে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। কারণ, শব্দ হইয়াছে নিত্য-পদার্থ ; অতএব নিত্য শব্দসমূহেই আকার ঐকার ঔকার প্রভৃতি শব্দের, সংজ্ঞা করা হইতেছে, কিন্তু 'বৃদ্ধি'প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কখনও আ, ঐ, ঔ প্রভৃতির উৎপত্তি করান হয় নাই।

শব্দ যদি নিত্যই হয়, তবে (ব্যাকরণাদি) শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?

বার্ত্তিকমূল—কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেন্নিবর্ত্তকত্বাৎ সিদ্ধম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—শব্দ নিত্য হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন কি, যদি এই কথা জিজ্ঞাসা কর ; তবে অসাধু প্রয়োগ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূল।—নিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্। কথম্। মৃজিরস্মায়বিশেষেণোপদিষ্টস্তস্য

(১) পূর্ব্বে প্রদীপ রাখিবার জন্য তিনখানি কাষ্ঠ আড়া আড়ি করিয়া বাঁধিয়া দীপাধার করা হইত, তাহাকে 'ত্রিবিষ্টব্ধক' বলা হইত।

সর্ব্বত্র মৃজিবৃদ্ধিঃ প্রসক্তা তত্রানেন নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। মৃজেরকৃঙিৎসু প্রত্যয়েষু মৃজিপ্রসঙ্গে মার্জিঃ সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শব্দ নিত্য হইলেও, অসাধু প্রয়োগের নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

কেন ?

মৃজি ধাতু (মৃজূ শুদ্ধৌ) আচার্য্য পাণিনিকর্ত্তৃক অবিশেষরূপে (সাধারণতঃ) উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তাহার (মৃজিধাতুর) সর্ব্বত্রই মৃজি বৃদ্ধির প্রসঙ্গ হইয়াছে, সেই (অসঙ্গত সঙ্গত সকল স্থানের) সাধারণ বৃদ্ধি, এই শাস্ত্রদ্বারা (অসঙ্গতস্থানের বৃদ্ধি) নিবৃত্তি করা হয়।

যেমন; 'মাষ্টি',' এইস্থলে, 'মৃজি' ধাতুর প্রসঙ্গ রহিয়াছে। 'মৃজি'ধাতুর অবিশেষরূপে উপদেশ করাতে, 'মাষ্টি' এইরূপ সাধুপ্রয়োগ স্থলেও 'মৃষ্টি'এইরূপ অসাধু প্রয়োগ হইবে। এইজন্যই 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' ।৭।২।১১৪।

('মৃজি'ধাতুস্থিত, ইক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, ধাতুপ্রত্যয় পরে থাকিলে) এইরূপ শাস্ত্র (সূত্র) করিবার প্রয়োজন; যেন, ককার, ঙকার এবং গকার ইৎপ্রত্যয় ভিন্ন, অন্য প্রত্যয় পরে থাকিলে, মৃজিধাতুর প্রসঙ্গ হইলে, 'মার্জি' এইরূপ সাধু প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

বার্ত্তিকমূল।—প্রত্যেকংগুণবৃদ্ধিসংজ্ঞে ভবত ইতি বক্তব্যম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, গুণ এবং বৃদ্ধি যেখানেই আদেশ করা যাইবে, সেখানে একটী বর্ণের প্রতিই গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—কিং প্রয়োজনম্। সমুদায়ে মাভূতামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রতি একটী বর্ণের প্রতি গুণ বা বৃদ্ধিসংজ্ঞা হয়; এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি ?

সমুদায়ে সংজ্ঞা না হয়, ইহাই প্রয়োজন।

বার্ত্তিকমূল।—অন্যত্র সহবচনাৎ সমুদায়ে সংজ্ঞাপ্রসঙ্গঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যত্র (অন্যান্য সূত্রে) 'সহ' এই বচন প্রয়োগ করাতেই জানিব যে, এইস্থলে, সমুদায়ে গুণ বৃদ্ধি প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—অন্যত্র সহ বচনাৎ সমুদায়ে বৃদ্ধিগুণসংজ্ঞয়োরপ্রসঙ্গঃ। যত্রেচ্ছতি সহভূতানাং কার্য্যং করোতি তত্র সহগ্রহণম্। তদ্‌যথা। সহসুপা। উভে অভ্যস্তং সহেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য স্থানে 'সহ' এইবচন প্রয়োগ থাকাতে, সমুদায়ে গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞার প্রসঙ্গ হইবেনা। কারণ যেখানেই (পাণিনি ঋষি) একত্র মিলিত শব্দ সমূহের কার্য্য ইচ্ছা করিয়াছেন, সেখানেই 'সহ' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন,—"সহসুপা।২।১।৪।" (সমর্থ পদের সহিত সুবন্ত পদের সমাস হইয়া থাকে; যথা,—অক্ষঃপর পরোক্ষম্)। "উভে অভ্যস্তং সহ। ৬।১।৫।" (ষষ্ঠ অধ্যায়স্থিত দ্বিত্ব প্রকরণে, যে দ্বিত্ব বিহিত হইয়াছে, তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া 'অভ্যস্ত'সংজ্ঞা হয়)।

ইত্যাদি সূত্রে 'সহ' শব্দের গ্রহণ হওয়াতে সমুদায়ের গ্রহণ হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—প্রত্যবয়বং চ বাক্যপরিসমাপ্তেঃ। * ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কোনও বাক্যপ্রয়োগকালীন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার প্রতি অবয়বেই বাক্য সমাপ্তি হইয়া থাকে, এইহেতুই জানিতে হইবে যে, গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞাও সমুদায়ে না হইয়া প্রত্যেকে হইবে।

ভাষ্যমূল।—প্রত্যবয়বং চ বাক্যপরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে। তদ্‌যথা। দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রা ভোজ্যন্তামিতি। ন চোচ্যতে প্রত্যেকমিতি। প্রত্যেকং চ ভুজিঃ পরিসমাপ্যতে। ননু চায়মপ্যস্তি দৃষ্টান্তঃ। সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তি-রিতি। তদ্‌যথা। গর্গাঃ শতং দণ্ড্যন্তামিতি। অর্থিনশ্চ রাজানো হিরণ্যেন ভবন্তি। ন চ প্রত্যেকং দণ্ডয়ন্তি। সত্যেতস্মিন্ দৃষ্টান্তে যদি তত্র সহ গ্রহণং ক্রিয়তে। ইহাপি প্রত্যেকমিতি বক্তব্যম্। অথ তত্রান্তরেণ সহগ্রহণং সহভূতানাং কার্য্যং ভবতি। ইহাপি নার্থঃ প্রত্যেকমিতি বচনেন।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রতি অবয়বেও বাক্যপরিসমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন;—'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত বিষ্ণুমিত্রেরা ভোজন করুন' বলিলে, এই কথা বলে না যে, 'ইঁহারা প্রত্যেকে ভোজন করুন'; অথচ ভোজনক্রিয়া, প্রত্যেকেতে সমাপ্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভোজন করিয়া থাকে।

যদি বল যে, কেন, এই ত সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে,—যেমন,—'গর্গবংশীয় সন্তানদিগকে শতমুদ্রা দণ্ড কর;' রাজা এইরূপ আদেশ করিলে, যদিও রাজাগণ হিরণ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে,তথাপি (শতমুদ্রা গর্গবংশের) প্রত্যেক লোককে দণ্ড করে না। অতএব এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানে 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হইত, তবে এখানেও (গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞাতে) 'প্রত্যেক'এর কথা বলা উচিত ছিল। আর যদি বিনা 'সহ' শব্দের গ্রহণেই

সহভূত (একত্র মিলিত সমুদায়) বিষয়ের গ্রহণ হয়, তবে এখানে (আ, ঐ, ঔ-এর প্রত্যেক বর্ণে) ও 'প্রত্যেক' এই বচন প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূল।—অথ কিমর্থমাকারস্তপরঃ ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর বক্তব্য এই যে, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'আৎ' এই স্থলে 'ত'কার পর বিশিষ্ট কেন করা হইল ?

বার্ত্তিকমূল।—আকারস্য তপরকরণং সবর্ণার্থম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আৎ'এর আকার, তপরবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন, আকারের সবর্ণ অর্থাৎ আকারের তুল্য বর্ণ কেবল দীর্ঘ আকারস্থিত উদাত্তানুদাত্তাদির গ্রহণের জন্য। *।

ভাষ্যমূল।—আকারস্য তপরকরণং ক্রিয়তে। কিং প্রয়োজনম্। সবর্ণার্থম্। তপরস্তৎকালস্যেতি তৎকালানাং সবর্ণানাং গ্রহণং যথা স্যাৎ। কেষাম্। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাম্। কিঞ্চ কারণং ন স্যাৎ। ভেদকত্বাৎ স্বরস্য। ভেদকা উদাত্তাদয়ঃ। কথং পুনর্জ্ঞায়তে ভেদকা উদাত্তাদয় ইতি। এবং হি দৃশ্যতে লোকে। য উদাত্তে কর্ত্তব্যেঽনুদাত্তং করোতি খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তস্মৈ চপেটাং দদাতি। অন্যত্ত্বং করোষীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকারের 'ত', পরে করা হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন কি ?

সবর্ণের গ্রহণ জন্য—'তপরস্তৎকালস্য' ।১।১।৭০। (১) এই সূত্রানুসারে, আকারের সমান কালবিশিষ্ট বর্ণসমূহের যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে।

কাহাদের (কোন্ বর্ণের) ?

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত উচ্চারণবিশিষ্টবর্ণসমূহের।

'ত'পরে উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র আকারের উচ্চারণ করিলেই বা, কেন উদাত্তাদির গ্রহণ না হইবে ?

উদাত্তাদি স্বরের পরস্পর ভেদকত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে বলিয়া। উদাত্তাদিস্বর পরস্পর পরস্পরের ভেদক হইয়া থাকে।

উদাত্তাদি স্বর যে পরস্পর ভেদক, তাহাই বা (ভবৎকর্ত্তৃক) কিরূপে জানা গেল ?

লোকমধ্যে এইরূপ দেখিয়া। কারণ, লোকমধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে;—যে বালক, উদাত্ত পাঠ কর্ত্তব্য হইলে, অনুদাত্ত পাঠ করিয়া থাকে, খণ্ডিক

(১) এইসূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

উপাধ্যায়, (১) ঐবালককে, "তুই অন্যরকম পাঠ করিতেছিস্" এই বলিয়া চপেটাঘাত (চড়) প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে জানা যাইতেছে যে, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত স্বরে, বিশেষত্ব রহিয়াছে; এই জন্যই অধ্যাপক তাহা বুঝিতে পারিয়া, বালককে চড় মারিয়াছে। অতএব 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। ভেদকত্বাৎ গুণস্যেতি বক্তব্যম্। কিংপ্রয়োজনম্। আনুনাসিক্যং নাম গুণঃ। তদ্ভিন্নস্যাপি গ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। ভেদকত্বাদ্‌গুণস্য। ভেদকা গুণাঃ। কথং পুনর্জ্ঞায়তে ভেদকাগুণা ইতি। এবং হি দৃশ্যতে লোকে। একোঽয়মাত্মা উদকংনাম তস্য গুণভেদাদন্যত্বং ভবতি। অন্যদিদং শীতমন্যদিদমুষ্ণমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার (আকারের 'ত'পর করণ করার) কি বাস্তবিকই প্রয়োজন?

তবে কি?

গুণের ভেদকত্ব হেতুও আকার 'ত'পর বিশিষ্ট বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি?

যাবতীয় স্বরবর্ণেরই অনুনাসিকত্ব নামক একটী গুণ (ধর্ম্ম) রহিয়াছে। অতএব 'আ'কার, 'ত'পর বিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন এই যে, সাধারণতঃ নিরনুনাসিক আকার ভিন্ন সেই অনুনাসিক গুণবিশিষ্ট 'আ'কারেরও যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে।

গুণের ভেদকত্ব হেতু, 'আ'কার, 'ত'পর বিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য? গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভেদক?

(আপনাদ্বারা) কিরূপে জানা গেল যে, গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভেদক?

সংসারে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে,—'জল' নামক একটী পদার্থ, তাহার গুণ-ভেদে অন্যরূপ হইয়া থাকে।

যেমন,—এই জল শীতল, অতএব ইহা এক রকম, আবার এই জল উষ্ণ, সুতরাং ইহা অন্য রকম। এই জন্যই বলা হইল যে, গুণসমূহ, পরস্পর ভেদক।

ভাষ্যমূল।—ননু চ ভোঃ অভেদকা অপি গুণা দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা। দেবদত্তো

(১) যিনি বেদের বৃহৎ বৃহৎ মন্ত্রসমূহকে, বালকগণের সুবিধার জন্য, এক এক পদ বা দুই দুই পদে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপদেশ দেন, তাঁহাকে 'খণ্ডিক উপাধ্যায়' বলে।

মুণ্ড্যপি জট্যপি শিখ্যপি স্বামাখ্যাং ন জহাতি। তথা বালো যুবা বৃদ্ধঃ বৎসো দম্যো বলীবর্দ্দ ইতি। উভয়মিদং গুণেষূক্তম্। ভেদকা অভেদকা ইতি। কিং পুনরত্র ন্যায্যম্। অভেদকাগুণা ইত্যেব ন্যায্যম্। কুত এতৎ। যদয়মস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্ত ইত্যুদাত্তগ্রহণং করোতি। তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যোঽভেদকা গুণাইতি। যদি ভেদকা গুণাঃ স্যুঃ উদাত্তমেবোচ্চারয়েৎ। যদি তর্হ্যভেদকাগুণাঃ অনুদাত্তাদেরন্তোদাত্তাচ্চ যদুচ্যতে তৎস্বরিতাদেঃ স্বরিতান্তাচ্চ প্রাপ্নোতি। নৈষদোষঃ। আশ্রীয়মাণো গুণো ভেদকো ভবতি। তদ্যথা। শুক্লমালভেত কৃষ্ণমালভেত। তত্র যঃ শুক্লমালব্ধব্যে কৃষ্ণমালভতে নহি তেন যথোক্তং কৃতং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল যে, ওহে, গুণসমূহত ত অভেদকও দৃষ্ট হয়; যেমন,—দেবদত্ত নামক কোনও ব্রাহ্মণ, মস্তককে মুণ্ডন করিলে, জটা ধারণ করিলে অথবা শিখা ধারণ করিলেও তাহার স্বকীয় 'দেবদত্ত' সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে না। সেইরূপ কোন গোরুও, বালক হইলে তাহাকে বৎস, যুবা হইলে তাহাকে দম্য এবং বৃদ্ধ হইলে তাহাকে বলীবর্দ্দ বলা যায়; কিন্তু সে স্বকীয় গোত্ব গুণ পরিত্যাগ করে না।

গুণসমূহে ত দুই ধর্ম্মই বলা হইল,—ভেদক এবং অভেদক; এই স্থলে ন্যায্য কি?

'গুণসমূহ অভেদক'—ইহাই এই স্থলে ন্যায্য।

কেন এরূপ হইবে?

যেহেতু 'অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ।৭।১।৭৫।' (১) এই সূত্রে, 'উদাত্ত' গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য (পাণিনি) জানাইতেছেন যে, গুণসমূহ পরস্পর অভেদক। যদি গুণসমূহ (উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতাদি) পরস্পর ভেদকই হইত, তবে 'উদাত্ত' এই শব্দ পাঠ না করিয়া আচার্য্য পাণিনি, উদাত্ত স্বরই উচ্চারণ করিতেন।

তবে যদি গুণসমূহ অভেদকই হয়; তাহা হইলে অনুদাত্তাদি এবং অন্ত উদাত্তবিশিষ্ট শব্দের উত্তর যে সকল বিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (২); তাহা, স্বরিত আদিবিশিষ্ট এবং স্বরিতান্ত বিশিষ্ট শব্দের উত্তরও প্রাপ্তি হইবে?

(১) অস্থি, দধি, সক্থি এবং অক্ষি শব্দের ইকার স্থানে 'অনঙ্' আদেশ হয়, টা প্রভৃতি স্বরবর্ণ আদিবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে; এবং সেই 'অনঙ্' আদেশ উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট হয়।

(২) (অনুদাত্তাদেরঞ্।৪।২।৪৪। (অনুদাত্ত স্বর আদি বিশিষ্ট যে শব্দ,

কালী।

(স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother এর শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত অনুবাদ।)

নিবেছে নক্ষত্রপুঞ্জ,
ঘনাচ্ছন্ন ঘোর ঘন ;
তরঙ্গিত, শব্দমান,
জীবন্ত আঁধার যেন।

ভীম ঘূর্ণিবায়ু মাঝে
অযুত উন্মাদকুল
সদ্য কারা-মুক্ত, যেন
তুলিছে ভীষণ রোল।

উন্মূলিত মহীরুহ
ভীমবেগ-ঝটিকায়।
সম্মুখে যা পড়ে, তাই
নিমিষে উড়িয়া যায়॥

সমুদ্র সে মহাযুদ্ধে
মিশিয়াছে ভীমবলে ;
ছোঁয় অধোলম্বী ব্যোম
পর্ব্বত-তরঙ্গ তুলে।

মলিন আলোক প্রভা
চৌদিকেতে প্রকাশয়—
ধূলিধূসরিত
মৃত্যুর সহস্র ছায়'।

মড়ক রোগাদি দুঃখ
ছড়ায়ে ফেলিয়ে—হায়,
আনন্দে নাচিছে মৃত্যু
ঘোর উন্মাদের প্রায়
এস মাগো ডাকিছি তোমায়॥

ভীমা তব নাম শ্যামে,
শ্বাসে তোর মৃত্যু বয় ;
প্রতি পদক্ষেপে তোর
জগৎ বিচূর্ণ হয়।
তুমি "কাল" প্রলয়রূপিনী,
এস, এস, জগৎজননী।

সন্তাষে বিপদ্ যেই,
ধ্বংসে যেই নাচে হাসে,
সুখে আলিঙ্গয়ে মৃত্যু,
তার কাছে মা প্রকাশে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

নবম অধ্যায়। আল্‌ওয়ান্দার।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [১০৫ পৃষ্ঠার পর।

কিছু দিন পরে বৃদ্ধ আল্‌ওয়ান্দার পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। শিষ্যগণ শয্যার চারি পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সেই জ্ঞান-ভক্তিময়-বিগ্রহ, মহাসত্ত্ব যামুনমুনি পীড়ায় অভিভূত হইয়াও ভগবদ্দাস্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরস্ত হইলেন না। শিষ্যবর্গকে বার বার সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যেরূপ পুষ্পের সার মধু, গাভীর সার ঘৃত, সেইরূপ ত্রিলোকের সার নারায়ণ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে চতুর্বর্গলাভ হয়।" মহাপূর্ণ, তিরুকোটিয়ুর পূর্ণ প্রভৃতি শিষ্যগণ, আল্‌ওয়ান্দারের সমবয়স্ক স্বামিচূড়ামণি তিরুবরাঙ্গ পেরুমল্ আরিয়ারকে স্ব স্ব সন্দেহভঞ্জনের জন্য তাঁহাদের হইয়া যামুনমুনিকে দু একটি প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তিরুবরাঙ্গ তাঁহাদের মুখস্বরূপ হইয়া শয্যাশায়ী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীমন্নারায়ণ, বাক্য মনের অতীত। কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে হইবে ?" যামুনমুনি উত্তর করিলেন, "ভক্তের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা করা হয়। ভক্তের জাতি কুল নাই। তিনি ঈশ্বরের দৃশ্যমান বিগ্রহ। তোমরা সকলে চণ্ডালকুলোদ্ভব তিরুপ্পান্ আলো-

ন্ধাবের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিও, তাহাতেই নারায়ণের সেবা হইবে।" তিনি আরও কহিলেন, "শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ নিষ্ঠাভক্তিসহকারে নিরন্তর নারায়ণ ও তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। দেখ, তিরুপ্পান আলোয়ার্ অনন্যমনে শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের বরদরাজের সেবায় কি নিষ্ঠা। ইহাঁরা সকলে মহাপুরুষ; ইহাঁদের ন্যায় আচরণ করিলে শ্রেয়ঃ হইবে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'।" পরে তিরু-বরাঙ্গের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রঙ্গনাথভক্ত তিরপ্পান আলোয়ার আমার একমাত্র আশ্রয়, তিনি আমার ভবপারের কর্ণধার হইবেন।" ইহা শুনিয়া তিরুবরাঙ্গ ব্যথিতহৃদয়ে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি শরীর ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন?" যামুন কহিলেন, "যদিই ঈশ্বরেচ্ছায় এ শরীর আমার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তোমার ন্যায় মহাপুরুষের কোনও ব্যথা পাওয়া উচিত নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা হয়, তাহাই পরমমঙ্গলজনক, ইহাতে স্থির বিশ্বাস থাকা চাই। অহঙ্কারকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বলিস্বরূপে অর্পণ করিয়া, চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। অহঙ্কারই সকল দুঃখের মূল, নির-হঙ্কারই সকল সুখের মূল। নিরহঙ্কারী পুরুষকে কর্ম্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না। 'আমি তাঁহার দাস' এইভাব মনে দৃঢ়বদ্ধ হইলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাহা হইলেই মনুষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি জন্ম মরণের অধীন নহেন, তিনি শ্রীমন্নারায়ণের নিত্যদাস; তখন তিনি, 'হে প্রভো, আমায় রক্ষা কর', এই বলিয়া আর ভগবৎশ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করেন না। তখনই তিনি নিষ্কাম ভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারেন। তখনই তাঁহার ভক্তি অহৈতুকী হয়। তখনই তিনি ঈশ্বরের যথার্থ দাস হয়েন।"

তিরুপ্পান্ আলোয়ারের সেবায় তিরুবরাঙ্গের একান্ত নিষ্ঠা জানিয়া, যামুন তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাহা করিতেছ, তদ্দ্বারা অচিরেই অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।" যখন এইরূপ কথা হইতেছে, তখন মহাপূর্ণ ও তিরু-কোটিযুর পূর্ণ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আল্‌ওয়ান্দার দেহত্যাগ করিলেই তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন। সেই সময় অন্য একজন শিষ্য কহিলেন, "আপ-নার অদর্শনে আমরা কাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিব? কে আমাদিগকে এরূপ মধুর ভাষায় আশ্বস্ত করিবেন?" ইহা কহিয়া তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে যামুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমরা কেহ উদ্বিগ্ন হইও না। শ্রীরঙ্গনাথ রহিয়াছেন; তিনি তোমাদের

আশ্রয় দিয়াছেন, দিতেছেন, এবং দিবেন। সর্ব্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিও। মধ্যে মধ্যে তিরুপতিস্থ বালাজী এবং কাঞ্চীপুরস্থ বরদরাজকে দর্শন করিও। শ্রীরঙ্গম্, নারায়ণের ধাম; তিরুপতি, নারায়ণের পাদপদ্মপ্রাপক চরমশ্লোক *; এবং কাঞ্চিপুর, তারকমন্ত্র।"

তাঁহার অদর্শনে তদীয় দেহকে দগ্ধ বা সমাধিস্থ করা হইবে, তিরুবরাঙ্গ ইহা জিজ্ঞাসিলে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কারণ, তাঁহার মন সেই সময় ভগবৎপাদপদ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অদর্শনে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পর দিবস শ্রীরঙ্গনাথ অসংখ্য সেবক সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনার্থ মন্দির-বহিঃস্থ চতুষ্পথে বহির্গত হইলে শ্রীরঙ্গম্‌বাসী যাবতীয় নরনারী ভগবদ্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। চতুষ্পথ জনাকীর্ণ হইয়া গেল। যামুনশিষ্যগণও গুরুর আদেশে মঠ হইতে রঙ্গনাথদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। সেই সময় জনৈক ভগবৎসেবক দেবতাবিষ্ট হইয়া মহাপূর্ণ ও তিরুকোটিযুর পূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। ইহা আমার অভিমত নয়।" ইহা কহিয়া তাঁহাদিগকে তিরুবরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে যামুনাচার্য্যের নিকট লইয়া গিয়া সমস্তই নিবেদন করিলে, সেই জ্ঞানগম্ভীর মহাপুরুষ কহিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমাদের উপরে ঈশ্বরের সাতিশয় স্নেহ, সুতরাং তিনি স্বয়ং তোমাদের নিষেধ করিলেন। উক্ত সঙ্কল্প একেবারেই ত্যাগ কর।" কিঞ্চিৎ কাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ এই, ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বদাই কুসুমাঞ্জলি অর্পণ, ও গুরূপদিষ্ট মার্গে বিচরণ করিবে, এবং ভক্তসেবা দ্বারা অহঙ্কারকে নাশ করিয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি তিরুবরাঙ্গের হস্তে সকল শিষ্যমণ্ডলীকে সমর্পণ করিলেন।

আল্‌ওয়ান্দার, সে যাত্রা সুস্থ হইয়া উঠিলেন, ও স্বয়ং এক দিবস শ্রীরঙ্গ-নাথের উৎসবে যোগ দিলেন। সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর সহিত ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া সকলকে উন্নত করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি শাস্ত্রের রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় কাঞ্চিপুর হইতে দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

যামুনমুনির পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্দর্শন করিয়া আল্‌ওয়ান্দার অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রামানুজের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপদ্দয় কহিলেন, "রামানুজ এক্ষণে যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন এবং শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিদেশানুসারে ভগবদারাধনার্থ প্রতিদিন শালকূপ হইতে ঘট পূর্ণ করিয়া জল আনয়ন করিয়া থাকেন।" ইহা শুনিয়া যামুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখনই আটটি প্রণামশ্লোক রচনা করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন, এবং মহাপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র রামানুজকে এখানে আনয়ন কর। তাঁহার ভিতর ঈশ্বরত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাঁহাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত শ্রেয়ঃ।" ইহা শুনিয়া মহাপূর্ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন।

আল্‌ওয়ান্দার দুই চারি দিবস পরে পুনরায় পীড়াগ্রস্ত হইলেন। শিষ্যেরা পুনরায় তাঁহার জন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এবার তাঁহার পীড়া কিছু অধিক ক্লেশজনক হইল। সেই পীড়িতাবস্থাতেই এক দিবস স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথজীউকে দর্শন করিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শিষ্যমণ্ডলি মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলে, তিনি তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণকে আনয়ন করিবার জন্য, তাঁহাদের কতিপয়কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে, তিনি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলে কহিলেন, "যদি ঈশ্বরের অপরাধ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনারও অপরাধ সম্ভবে।" তিনি তাঁহাদের হস্তে তিরুবরাঙ্গ ও অন্যান্য শিষ্যগণের ভার অর্পণ করিয়া কহিলেন, "প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর সেবা দর্শন এবং প্রসাদী পুষ্প গ্রহণ করিও। তাহা হইলে মনবুদ্ধি নির্ম্মল হইবে এবং আচিরাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার পাইবে। সর্ব্বদা গুরুভক্তিপরায়ণ ও অতিথিসেবক হইও।" তাঁহারা সকলে বিদায় হইলেন। আল্‌ওয়ান্দারের এই অভিনবভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গৃহস্থভক্তগণ প্রস্থান করিলে, আল্‌ওয়ান্দার্ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিলেন। সেই সময় তাঁহার শিষ্যগণ সুমধুর স্বরে ভগবন্নামমাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। মৃদু মৃদু বাদ্য-

ধ্বনির সহিত বংশীধ্বনি সেই সঙ্কীর্ত্তনকে অধিকতর শ্রুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল। এক প্রকার স্বর্গীয় শান্তি ও সুখ সেই সময় সকলের বদনকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তিতে সকলেই আত্মহারা হইয়াছিলেন। ক্রমে আল্ওয়ান্দার মনকে হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্যে উত্থাপিত করিলেন। আনন্দাশ্রু নয়নের দুই পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া দেহনির্ম্মোক ত্যাগপূর্ব্বক পরমপদে বিলীন হইয়া গেলেন। সঙ্কীর্ত্তন সহসা থামিয়া গেল। তিরুক্কোটিয়ুর এবং অন্যান্য শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকবেগ নিরস্ত হইলে, শিষ্যগণ আল্ওয়ান্দারনন্দন ছোটপূর্ণকে সঙ্গে লইয়া অন্তিমকর্ম্ম সম্পাদনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মৃতের দেহকে সুশীতল, পবিত্র জলে ধৌত করা হইল। পরে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া সুসজ্জিত খট্টায় স্থাপন পূর্ব্বক মৃদুপদসঞ্চারে কাবেরীতীরবর্ত্তী শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে সকলে লইয়া চলিলেন। শ্রীরঙ্গম্‌বাসী যাবতীয় নরনারী শবের অনুগমন করিলেন। শ্মশানক্ষেত্র জনতায় পরিপূর্ণ হইল। (ক্রমশঃ)

ভারতের ভবিষ্যৎ।

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় লিখিত।)

কোন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়াই পরম জ্ঞান। প্রাচীন হিন্দু আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বরতত্ত্বও অবিদিত নহে। এই উভয় তত্ত্ব প্রাচীন হিন্দু যে পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন, তেমন আর কোন জাতিকেই করিতে দেখি না। সেই জন্য প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় জ্ঞানী ও উন্নত জাতি জগতে আর বিদ্যমান নাই বা তেমন কোন জাতির অভ্যুদয় হয় নাই। জ্ঞান দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। প্রকৃতি অনুসারে কেহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনা করে, কেহ বা আধিভৌতিক জ্ঞানালোচনায় রত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভূতের বোঝা বহন করাকেই জীবনের সার ব্রত মনে করেন; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু এতদুভয়েরই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে সমাজে বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি ধর্ম্ম এবং ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল,

সে সমাজ যে এক কালে অতি উন্নত এবং জগতের শিরোমণি ছিল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় মহা মহা পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণার দ্বারা এক্ষণে যে সকল জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় মহর্ষিগণ তাহার চূড়ান্ত বিচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে হিন্দু জাতি আর নাই, এক্ষণে যে হিন্দুজাতি বিদ্যমান আছে, তাহা প্রাচীন হিন্দুর ছায়া মাত্র, প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ বিকৃতাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে মাত্র। আমরা যে সমাজে ও যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের কিছুরই অভাব অপ্রতুল থাকিবার কথা নহে; কিন্তু আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, নিজগৃহে নানা ধন রত্ন থাকিতেও আমরা পরমুখাপেক্ষী, চক্ষু থাকিতেও পথভ্রান্ত। অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আমরা যে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং সংসারে কি করিতে আসিয়াছি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। মণিরত্ন সম্মুখে থাকিতে তাহা অবহেলা করিয়া আমরা কেবল লোষ্ট্রসংগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়া অমূল্য জীবন ক্ষয় করিলাম! বহুপুণ্যফলে পবিত্র হিন্দুকুলে ঋষি তপস্বীর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমরা জীবনের গন্তব্য পথ পাইলাম না, ইহা কি সামান্য বিড়ম্বনা?

ভারতীয় সাহিত্যে যত ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্র আছে, তত আর কোন সাহিত্যে নাই এবং চিন্তা ও গবেষণার গভীরতায় তাহাদিগের সমকক্ষও কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার কত অমূল্য গ্রন্থ, বহু কালের চিন্তা ও ভূয়োদর্শনের মহামূল্য ফল যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখনও যাহা আছে, তাহাতে জ্ঞানপিপাসা সম্পূর্ণ নিবারিত হয়। ধর্ম্মনীতি কেবল যে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু পালিত হয় না, এমন নহে, ঈশ্বরানুগৃহীত পরম ধার্ম্মিক যোগী ঋষির কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতে যে পরিমাণ ধর্ম্মপ্রাণ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও নাই; স্বয়ং ধর্ম্মবলে বলবান এবং সাধারণ লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, এমন মহাত্মার সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই সকল মহামূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদিগের সমীপবর্ত্তী থাকিয়াও আমরা ফলভাগী হইতে পারিলাম না।

কোন সমাজেই কোন কালে সকলেই ভোগস্পৃহাশূন্য পরম যোগী হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু সমাজেও সকলেই যে ঋষি তপস্বী ছিলেন,

এমন নহে ; তবে সাহস করিয়া এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, তথায় যে পরিমাণ ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন, তত আর কোন সমাজেই জন্মে নাই। অন্যান্য সমাজে সাধারণ লোকের সহিত ধর্ম্মপ্রাণ লোকের যে অনুপাত, প্রাচীন ভারতে তাহার অধিক ছিল। প্রাচীন ভারতের সাধারণ লোকেও সামান্য ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন না। যোগী ঋষি না হইলেও এবং ঈশ্বরের অধিক সমীপবর্ত্তী হইতে না পারিলেও তাঁহারা ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিতেন না। ধর্ম্মই সকলের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহার যেমন শক্তি, তিনি তেমনই ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া পরোপকারী ছিলেন এবং শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে সকলেই যথাসাধ্য পূজার্চ্চনা করিতেন। প্রায় সকলেই গুরু পুরোহিতের উপদেশ মতে যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতেন, দান ধ্যান ও অতিথিসৎকারপরায়ণ ছিলেন এবং সত্য ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যেক পরিবারই এক একটী ছোট খাট ধর্ম্মমন্দির ছিল। ঘোর সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ইহাকে তাঁহারা স্বর্গতুল্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ, গুরুজনে অচলা ভক্তি, সাধুসঙ্গে স্পৃহা, সৎপ্রসঙ্গে রতি, আহার ব্যবহারে সাত্ত্বিকভাব, পর-দুঃখে কাতরতা ইত্যাদি সৎপথে চলিবার যাহা যাহা সম্বল, তৎসমস্তই প্রাচীন ভারতের সাধারণ লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। হইতে পারে, সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না ; কিন্তু চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন না করিলেও দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা যাহা শিখিয়াছিলেন, অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তিও তাহার অধিক জানিতেন না। সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের অন্ধবিশ্বাস কিছু প্রবল ছিল, বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্য দিয়া তাহা উপার্জ্জিত নহে ; কিন্তু সে ত্রুটিও অবিশ্বাস অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

একণে সে দিন গিয়াছে, আমাদিগের সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিযাছে। ভারতীয় ধর্ম্মজগতে একটা যে মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যতই পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ততই আমাদিগের ধর্ম্মভাবের তিরোভাব হইতেছে। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইবার সময়ে অতি কুলগ্নেই হিন্দুসন্তানকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষায় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা হয় না এবং পাশ্চাত্য দর্শন অবিশ্বাসের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিয়া দেয়। পশ্চিম হইতে যে সাম্য ও স্বাধীনতার তরঙ্গ আসিয়াছে,

তাহাতে আমাদিগের সমাজে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির ভোগ বিলাসিতা ও ঘোর স্বার্থপরতা আমাদিগের পরিবারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার মধ্যে যে সত্য নাই, আমরা তাহা না বলিলেও যে কারণেই হউক, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুর যে অতি উচ্চ স্তর হইতে পতন হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে হিন্দুর অবস্থা অতি উন্নত ছিল, আমরা এমন কথা বলি না; তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গে যে পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজের পতন সহজ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যে দিন হইতে জ্ঞান সাধারণ সম্পত্তি না হইয়া ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের সম্পত্তি হইয়াছে, যে দিন হইতে এক শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকারী অন্য শ্রেণীকে হেয় জ্ঞান করিতে শিখিয়াছে, যে দিন হইতে ত্যাগ অপেক্ষা ভোগে হিন্দু সন্তানের আসক্তি জন্মিয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুর পতন আরম্ভ হইয়াছে। তিল তিল করিয়া পড়িতে পড়িতে হিন্দু সন্তান এক্ষণে অবনতির সুগভীর নিখাতে পতিত হইয়াছে।

সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের যে সকল মূল মন্ত্র, তাহাদের বিকৃতি হইয়াছে; এমন কি, বলিতে মর্ম্মাহত হইতেছি যে, ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজনীয়তাই অনেকে স্বীকার করেন না। ঈশ্বরকে আরাধনা উপাসনা দূরে থাকুক, অনেকের এমন অনেক দিন অতিবাহিত হয়, যে দিন একবারও তাঁহাকে স্মরণ করাও হয় না। অনেকে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইঁহারা অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে যত্ন করিয়া থাকেন! ইঁহাদিগের অপেক্ষা যাঁহারা একটু অল্প জ্ঞানী, তাঁহারা সন্দেহদোলায় দোলায়-মান এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার আরাধনা উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পতন আর কোথায় হইতে পারে! যোগ, প্রাণায়ামাদি ঈশ্বরলাভের যে সকল উপায় আছে, তাহারা এক্ষণে বাজীকরের বাজীতে পরিণত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষগণের সিদ্ধি ভেল্কী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। যোগিগণ দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহারা অতুল শক্তিশালী, তাহা কেহ বিশ্বাস করে না। কি ভক্তি, কি জ্ঞান, এখনকার সাধারণ হিন্দুর কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল কর্ম্ম; কিন্তু এক্ষণে তাহা দেবোদ্দেশে নহে। এখনকার কর্ম্মের কেন্দ্র "আমি",

পরিধিও "আমি"। এখন জগতে কেবল "আমি" আছি, ঈশ্বরকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি। আমাদিগের বাহ্যদৃষ্টি এক্ষণে নিতান্ত প্রবল, অন্তর্মুখী চিন্তা আর আসে না; বাহ্য জগৎ লইয়াই এক্ষণে সংসার, বাহ্যাড়ম্বরই আমাদিগের অস্থি মজ্জা। যাহাতে কেবল তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, আমরা এক্ষণে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছি, সত্ত্বগুণের নিকটে ভুলিয়াও যাই না। কল কারখানার সাহায্যে বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য যেমন সহজ হইয়াছে, নিতান্ত ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারাও ধর্ম্মকে তদ্রূপ কলে ফেলিয়া সহজ করিয়া লইয়াছেন। যে নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়া না গেলে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না এবং যে চরিত্র গঠন করিতে না পারিলে পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নাই। যে ত্যাগে ধর্ম্মের আরম্ভ, যে নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত ধর্ম্মের প্রাণ, যে সর্ব্বজীবে প্রেম ঈশ্বর লাভের উপায়, তাহা আমাদিগের নাই। শাস্ত্রে আমাদিগের রতি নাই, ঈশ্বরকথায় মন বসে না, ভক্তির ধার ক্রান্তি মাত্রও ধারি না, তাহার উপর গুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এমত অবস্থায় আমরা যে একটা হযবরল হইয়া পড়িব, তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজের নিতান্ত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, অবনতির অবধি নাই।

আমাদিগের ভবিষ্যৎ এক্ষণে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিলেও আমরা প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারিব কি না, স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। ক্রমে ক্রমে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব কি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ আমরা সনাতন ধর্ম্মচ্যুত হইয়া এক বিকটাবস্থা প্রাপ্ত হইব, ইহা বাস্তবিকই আলোচনার বিষয়।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিবিশেষেরও উত্থান পতন আছে। সমগ্র মনুষ্যসমাজের পক্ষেও ঐ নিয়ম; কিন্তু কথাটা সহজে বুঝিবার জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র লওয়া যাউক। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় জাতিবিশেষের উন্নতি অবনতি অপরিহার্য্য। সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রী যে নিয়মের অধীন, মনুষ্য তাহা কি প্রকারে অতিক্রম করিবে? আমরা যে হিন্দু সমাজের কথা বলিতেছি, তাহারই যে এক ভাবে দুই সহস্র সহস্র যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, এমন নহে। ইহার

উপর দিয়া কত প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কতবার ইহার পতন ও পুনরুত্থান হইয়াছে, ইতিহাস তাহার উত্তর দানে সমর্থ। সময়ে সময়ে ইহার বহু অবসাদের যুগ গিয়াছে ; কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার অপার কৃপায় ইহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া আবার সত্য জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই যুগে যুগে তিনি স্বয়ং অবিভূর্ত হইয়া উহার সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, কেবল ধর্ম্ম কেন, যে কোন বিষয়েই কোন সমাজ অবনত হইয়া পড়িলে এক এক জন অমানুষী প্রতিভাশালী ব্যক্তি আবিভূর্ত হইয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। যাহা সমাজের পক্ষে আপাত অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইতেই মঙ্গলের উদয় হয় , যাহা অশিব, তাহার মধ্যেই শিব লুক্কায়িত দেখিতে পাই। পৃথিবী যখনই পাপভারে আক্রান্ত হয়, তখনই তাহার উদ্ধার নিকট-বর্ত্তী বুঝিতে হইবে। প্রয়োজন অনুসারে কখন পূর্ণ কখন বা আংশিক শক্তি সহকারে শ্রীভগবান আবিভূর্ত হইয়া পৃথিবীর পাপভার মোচন এবং অজ্ঞান-তিমিরে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন। ইঁহারাই লোকের নিকট অবতার বলিয়া পরিচিত হন। কেবল ধর্ম্ম নহে, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, যখনই যে বিষয়ে সমাজ অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই এক এক জন অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় তেজে সমাজকে বলবান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য ইঁহারা সকলেই যুগে যুগে অব-তীর্ণ হইয়া জনসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকার হইতে মনুষ্যকে জ্ঞানালোকে আনয়ন করিয়াছেন। মনুষ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা মনুষ্যোচিত জীবনকালের অধিক পৃথিবীতে থাকেন না , সাধারণ জীবন কালের মধ্যেই, এমন কি, তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যেই, আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থান করেন। সমস্ত পৃথিবীর সকল জাতিকে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাহারা বসিয়া থাকেন না সত্য ; কিন্তু সমাজে তাঁহারা যে বল প্রয়োগ করিয়া যান, অনেক দিন ধরিয়া তাহার কার্য্য চলিতে থাকে এবং ক্রমে দিগ্দিগন্তে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। কেহ জলন্ত মূর্ত্তিতে আবিভূর্ত হইয়া যেখানে গিয়া পড়েন, একেবারে সে স্থানকে আলোকিত করেন, আবার কেহ বা বিনা আড়-ম্বর আস্ফালনে নীরবে সমাজশরীরে এমন বল প্রয়োগ করিয়া যান যে, বহুদিন পর্য্যন্ত সে বলের কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। এই সত্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন সমাজেরই গতি চির দিন এক ভাবে বহিতে থাকে

না। মানুষ যেমন চির দিন সমান স্বাস্থ্যভোগ করে না, তেমনই সমাজ-শরীরের ধর্ম্মাঙ্গও সময়ে সময়ে রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে ও ঈশ্বরের করুণায় সমাজের সে অবস্থা বহুদিন থাকে না, অনন্ত তেজোময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমাজের ব্যাধি আরোগ্য করিয়া আবার তাহাকে নব বলে বলীয়ান করিয়া থাকেন।

আজ আমরা প্রাচীন হিন্দুর সমতুল্য নাই, আজ আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আবার যে উঠিব না, তাহা কে বলিল? যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আমরা অবনতির নিম্ন স্তরে নামিয়া গিয়াছি বলিয়া নিতান্ত বিড়ম্বিত বলিয়া মনে করি, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদিগের মঙ্গলের হেতু নহে, তাহা কে বলিতে পারে? পাশ্চাত্য জাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে আমাদিগের জীবন ও সম্পত্তি যে প্রকার ছিল, তাহা অপেক্ষা কি এক্ষণে নিরাপদ নহে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন না বলিব যে, আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর পাশ্চাত্য জাতিকে বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন? হয় ত এই পাশ্চাত্য তরঙ্গের সাহায্যেই আবার পতিত হিন্দু সমাজ উন্নত হইবে। সে উন্নতিস্রোত যে বহিতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিতে পার? পাশ্চাত্য জাতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদিগের দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে কয় জনের দৃষ্টি ছিল, আর এখনই বা কত লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার বিচার করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনই উন্নতির তরঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। সে সকল সামগ্রী আমাদিগের গৃহেই ছিল সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য আলোকের প্রভাতেই ত তাহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল! সে আলোক না পাইলে হয় ত সে সকল মহামূল্য সামগ্রী ক্রমে লোপ পাইয়া যাইত। তদ্ভিন্ন উন্নতি যে কেবল আমাদিগেরই আবশ্যক, পাশ্চাত্য জাতির নহে, এমন নহে। হয় ত সেই পাশ্চাত্য জাতিকেও হিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিবার জন্য বিধাতা তাহাদিগকে ভারতে আনিয়া আর্য্যজাতির ধন রত্নে অধিকার দিতেছেন, হয় ত এক কারণের সাহায্যে নানা কার্য্য সমাধা করিতেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আমাদিগের কেবলই অবনতি হইয়াছে, আদৌ উন্নতি হয় নাই, এমন কথা বলা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। মানুষের উন্নতির এক মাত্র মার্গ নহে, কেবলই জ্ঞানালোচনায় উন্নতি নহে, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মেরও বিশেষ আবশ্যক। পাশ্চাত্য জাতি কর্ম্মপ্রধান, সুতরাং তাহাদিগের

সংঘর্ষে আমাদিগের কর্ম্ম করিবার শক্তি যে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষা প্রণালীরই দোষ গুণ আছে। দোষের ভাগ ত্যাগ করিয়া গুণাংশের সমবায়েই প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যের শিল্প বাণিজ্যাদি কর্ম্মের সহিত প্রাচ্যের জ্ঞান কাণ্ডের সম্মিলনেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ভরসা। ভারত এক দিন যাহা ছিল, তাহা চির দিন থাকিতে পারে না, পাশ্চাত্য জাতির সহিত সাম্মলনের পূর্ব্বেও হিন্দুসমাজে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভারতের সে দিন নাই, সুতরাং প্রাচীন প্রণালীতে আবার হিন্দুসমাজ সংগঠনের আশা বিড়ম্বনা মাত্র, পরিবর্ত্তন কালের অধীন; সুতরাং তাহা অপরিহার্য্য। প্রাচীনকালে এমন ছিল, এখন তেমন নাই বলিয়া আক্ষেপ করা বৃথা। প্রাচীনকে পুনরানয়ন করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য; তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া আত্মকার্য্য অবহেলা না করিয়া তদ্রূপ গৌরবান্বিত হইবার জন্য উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত। কি উপায়ে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির আগ্রহের সহিত আপনি আবিষ্কৃত হইবে। আন্তরিক আগ্রহ জন্মিলে প্রাণের আকর্ষণ বলে উপায়কে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে না, পিপাসাতুরের নিকট জল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে এই আগ্রহ সৃজন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। আগ্রহসৃজনের পন্থাও বহু। তন্মধ্যে আমরা একটীর কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

মানুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানপিপাসু, আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য নিয়ত সচেষ্ট। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি নিমিত্ত আসিয়াছি এবং আমার পরিণাম কি, এ সকল তত্ত্ব জানিবার জন্য সকলেরই ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। অজ্ঞান বা মায়াতে আচ্ছন্ন থাকাতে জ্ঞানের বিকাশ হয় না, সুতরাং আমরা আপনাকে চিনিতে পারি না এবং যখন আপনাকেই চিনিতে পারি না, তখন ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিব? মানুষ আপনাকে জানিবার জন্য যেমন ব্যগ্র, ঈশ্বরকে জানিবার জন্যও তদ্রূপ, কারণ আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব এক প্রকার অবিচ্ছিন্ন। যাহাতে এই তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা বৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে হিন্দুদর্শন ও বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের সমূহ আলোচনার আবশ্যক। জ্ঞান কেহ নিবদ্ধ করিলে চলিবে না, তাহার বিস্তার ও বিকাশ আবশ্যক। সুতরাং শাস্ত্র গ্র[illegible]

বহু প্রচার এবং তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় সকলের বহুল পরিমাণে প্রকাশ্য আলোচনার আবশ্যক। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী, তাঁহারা পতিত ভারতের পরম বন্ধু। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্র গ্রন্থ যে প্রকার দুর্লভ ছিল, এক্ষণে তেমন নহে; সুতরাং তাহার ফলও ফলিতে দেখা যাইতেছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুসন্তানের স্বধর্ম্মে অনুরাগ ও আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুরাপান, ম্লেচ্ছ ব্যবহার, স্বধর্ম্মে বিরাগ প্রভৃতি যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শাস্ত্রগ্রন্থ দুর্লভ থাকাতে তৎকালে শাস্ত্রব্যবসায়ী কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতিরেকে অন্যের তাহা দৃষ্টিগোচর হইত না; সুতরাং তাহাতে কি আছে, তাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই জানিতেন না। এক্ষণে সে দিন অনেক পরিমাণে গিয়াছে, ভারতে ও অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে বেদাদি গ্রন্থের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মালোচনার জন্য কয়েক খানা পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উপর ধর্ম্ম ও দর্শনাদি আলোচনার জন্য সভা সমিতি সংস্থাপিত হইতেছে এবং সাধারণকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা হইতেছে। এ সকল লক্ষণ অতি সুলক্ষণ বলিতে হইবে।—ইহার সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশের অনেক পরিমাণে মেঘ মুক্ত হইবার আশা জন্মিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মমহোৎসব।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঊনসপ্ততিতম জন্মমহোৎসব বেলুড়মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই দিন নিত্যপূজাসমাপনের পর বেলা নয়টা হইতে এই জন্মতিথিনিমিত্তক সর্ব্বদেবদেবীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথমে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা হইল। তৎপরে গণেশ, সূর্য্য, শিব, ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইল। পরে বিষ্ণুর মৎস্য কূর্ম্মাদি দুএকটী অবতারের পূজাসমাপনান্তে তাঁহার জন্মমুহূর্ত্ত পড়াতে জন্মতিথি পূজা অগ্রে করিয়া লওয়া হইল। দশাবতারের পূজাসমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, দত্তাত্রেয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কপিল, জগন্নাথ, শঙ্করাচার্য্য, এমন কি, নানক, মহম্মদ ও ঈশারও পূজা হইল। শ্রীরামচন্দ্রের পূজার সময় সীতাদেবী ও ভক্তপ্রবর হনুমানেরও পূজা সমাধা [illegible]। এই পূজা সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে নিত্য আরাত্রিক ও ভোগের পরে রাত্রি দশটা হইতে প্রত্যুষ পর্য্যন্ত মহামায়ার দশমহাবিদ্যারূপ দশরূপের পূজা হইল। পূজান্তে হোম আরম্ভ হইল। যে যে দেবদেবীর পূজা হইল, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে আহুতি দিয়া পরিশেষে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকল দেবদেবী ও অবতারের সমষ্টিজ্ঞানে, তাঁহার নামে আহুতি দেওয়া হইল। পরে পূর্ণাহুতিদানের পর এই মহাপূজা সমাপন হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সার্ব্বভৌমিক ভাবের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করাই তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এই সকল দেবদেবী পূজার উদ্দেশ্য।

তৎপরের রবিবারে (২রা চৈত্র) সাধারণের জন্য বিরাট মহোৎসব হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ চিত্রপট অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দলে দলে প্রায় শতাধিক সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া তাঁহার সমক্ষে গাইতে লাগিলেন। বাউল, হরিনাম এবং গৌরাঙ্গ উপাসকসম্প্রদায় অনেক আসিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম উপলক্ষে তাঁহাকে অবতারজ্ঞানে তাঁহার নামে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ লোক প্রায় ২০।২৫ হাজার হইয়াছিল। আহিরীটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার কোম্পানীর তিনখানি জাহাজ বেলা আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়াছিল। জাহাজের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছিল। সমস্ত দিন সরবত ও নানাবিধ প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ এতদ্বিধ মহোৎসবকে হুজুক বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আমাদের কিন্তু তাহা বোধ হয় না। প্রথমতঃ, মহোৎসবে কি উপকার হয় বলিয়া পরে শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসবের বিশেষত্ব বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃত সাধনা নিজের নিজের অন্তরের ব্যাপার, সত্য কথা; কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিলে অনেকে যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন, ইহা অনেকের প্রত্যক্ষ। মহোৎসবাদিতে অনবরত ভগবন্নাম শ্রবণ হইয়া মন যে কিছুক্ষণের জন্যও ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকে, তাহার সন্দেহ কি? অনেকের মন এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনাদির ভাবে বিভোর হইয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। তদ্ব্যতীত নানা স্থান হইতে পরিচিত অপরিচিত নানাবিধ ভক্তমণ্ডলীর একত্র সমাগমে ও আলাপে পরস্পরের অনেক আধ্যাত্মিক উপকার হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসবের বিশেষত্ব বলিব। রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইবে, এরূপ চক্ষু থাকিতে অন্ধ বোধ হয় খুব কম আছে। হিন্দুধর্ম্ম বেদবেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদির সংস্কৃত রচনাবলির ভিতর অথবা হয়ত কোন নিভৃত পর্ব্বতগুহায় কোন যোগীর হৃদয়াভ্যন্তরে গুপ্ত ছিল। যাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় সেই হিন্দুধর্ম্ম আমরা সকলে একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, ঘোর সংসারে মগ্ন হইয়াও আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি, যাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক উদারতায় আমরা এখন সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোককে ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে শিখিতেছি, যাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগের মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া কত কত যুবক আজ এই ভোগপ্লাবিত বঙ্গভূমির ভিতর ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই মহাপুরুষের নামে যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সাধারণে যোগ দিলে তাঁহাদের হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণের জন্যও যে সেই মহাপুরুষের আভা পড়ে, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

এ মহোৎসব আবার যে সে স্থানে নহে অথবা যে সে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠাতা নহে। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব যাঁহাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহবশে সাধনের গুহ্য রহস্য শিখাইয়া ও উপলব্ধি করাইয়া এই ঘোর কলির মধ্যে পাবন তীর্থ-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ইহার উদ্যোক্তা ও অনুষ্ঠাতা। দুর্ভাগ্যবশে সেই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত আমাদের কি এমন শুভ মুহূর্ত্ত, পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণ উপেক্ষা করা উচিত?

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সাধু, গৃহী, ধনী, মধ্যবিত্ত, নির্ধন, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলে এক ক্ষেত্রে আনন্দ করিয়া ভগবন্নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মনে হয়, এক দিন সমগ্র ভারত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমায় দ্বেষাদ্বেষী ভুলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত, মহামহিমাময় এক শ্রেষ্ঠজাতিতে পরিণত হইয়া আবার জগতে আপন গৌরব ঘোষণা করিবে। ইতি

জনৈক দর্শক।

মান্দ্রাজ-মঠেও মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। তথায় ঐ দিন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পূজা ও ভজন, ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধুবর্গ ও ৬০০০ কাঙ্গালী ভোজন, ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হরিকথা, ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত 'বহুত্বে একত্ব' এই বিষয়ে বক্তৃতা, এবং ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আরাত্রিক ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

এই মতানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে সে অন্যান্য লোকে গমন করে; এই সকল ভাবও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি খণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমার নিকট এইরূপই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল ভূত বা শক্তির সৃষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে পারে, উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা যাইতে পারে আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথক্‌রূপেই ভাবনা সম্ভব। এই দৃষ্টি হইতে মানুষ আপনাকে আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টি, এইরূপেই চিন্তা করিতে পারে আর এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এই জন্যই এই মতগুলিও বেদান্তে রক্ষিত হইয়াছে আর এই জন্যই দ্বৈতবাদীদের খুব প্রচলিত সাধারণ মত তোমাদের নিকট আমার বলা আবশ্যক।

এই মতানুসারে প্রথমতঃ অবশ্য আমাদের স্থূল শরীর রহিয়াছে। এই স্থূলশরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কর্ম্মের আশয়স্বরূপ। সমুদয় কর্ম্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান—তাহারা সর্ব্বদাই ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মস্বরূপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাহাই এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার প্রকাশ হইয়া ফলপ্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে আপন অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহে, সে আপনার নিয়মে, আপনার জালে আপনি বদ্ধ। আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, আমরা যে সকল চিন্তা করি, তাহারা আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালনা করিয়া দিলে তাহার পূর্ণ ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মবিধান। এই সূক্ষ্মশরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি না, ইহা অণু, বৃহৎ, বা মধ্যম আকারের, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা বৃহৎ।

এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র আর ইহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে। ইহা অনাদি, ইহা সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহা অনন্ত। আর ইহা আপন প্রকৃত স্বরূপ শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানাদেহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জীব যে অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যে কার্য্যের দ্বারা সে সেই অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য্য বলে, চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর যে কার্য্যের দ্বারা, যে চিন্তার দ্বারা তাহার স্বরূপপ্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী, সকলেরই এই সাধারণ মত যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে—উহারা অন্য কোথাও হইতে আইসে না। উহারা আত্মাতে অব্যক্তভাবে থাকে, আর সমুদয় জীবনের কার্য্য কেবল উহার অব্যক্তভাব বিকাশ করিবার জন্য।

তাঁহারা পুনর্জ্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবেন আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ; এইরূপ চলিবে। তিনি এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারেন বা অন্যলোকেও জন্মাইতে পারেন। তবে এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মত এই, আমাদের সমুদয় প্রয়োজনের জন্য এই পৃথিবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য লোকে দুঃখকষ্ট খুব কম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন, সেই কারণেই সেই সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবারও সুযোগ নাই। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে, খুব দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখন না কখন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা। কিন্তু যেমন এই লোকে খুব বড়মানুষদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার খুব অল্পই সুযোগ আছে, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে গমন করে, তাহারও আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, এখানে যে সুখ ছিল, তদপেক্ষা সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—তাহার যে সূক্ষ্মদেহ থাকিবে, তাহাতে কোন ব্যাধি থাকিবে না, তাহার আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক থাকিবে না আর তাহার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে সুখের পর সুখ সম্ভোগ করে এবং আপনাকে ও উচ্চভাব সমুদয় ভুলিয়া যায়। তথাপি এই সকল উচ্চতর লোকে কতকব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই সকল ভোগসত্ত্বেও তথা হইতেও আরো উচ্চতর ভাবে

আরোহণ করেন। এক প্রকার স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন—এই আত্মাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল ভগবানের সহিত বাস করিবেন। তাঁহারা সেখানে দিব্যদেহলাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগশোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে এবং তাঁহারা চিরকাল তথায় ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ সকলেই এই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের এতদূর কৃপা হইল যে, তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে দেবলোকাদি বিভিন্ন লোকেও গমন করিয়া থাকেন।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেটা আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য হইতে পারে না, কিন্তু দেহ ত কখন অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ, সসীমতা হইতেই শরীরের উৎপত্তি। অনন্ত চিন্তা হইতে পারে না, কারণ, সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তারও বাহিরে যাইতে হইবে। আর আমরা অদ্বৈতবাদের সেই বিশেষ মতও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এই মুক্তি—লাভ করিবার নয়, ইহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। আমরা কেবল উহা ভুলিয়া যাই ও উহাকে অস্বীকার করিয়া থাকি। এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও অপরিণামিতা লাভ করিতে হইবে না, উহারা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—উহারা বরাবর আমাদের রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার, 'আমি মুক্ত', এই মুহূর্ত্তে তুমি মুক্ত হইবে। যদি তুমি বল, 'আমি বদ্ধ', তবে তুমি বদ্ধই থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যান্যবাদীদের বিভিন্ন মত কথিত হইল। তোমরা ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পার।

বেদান্তের এই এক আদর্শ বুঝা বড় কঠিন, আর লোকে সর্ব্বদা ইহা লইয়া

বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুস্কিল হয় এইটুকু যে, ইহার মধ্যে যে একটী মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া তন্মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, এই সসীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা রাখিতে পার, তোমার সকল বাসনা রাখিতে পার ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পার। যদি মানুষভাবে থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা, উহা রাখিয়া দাও, কারণ, তুমি জান, তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্ম্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিতে পারে না। তোমার যতদিন ইচ্ছা, ততদিন মানুষ থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর, দেবতাই হইবে। এই কথা। কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেবতা পর্য্যন্ত হইতে অনিচ্ছুক! তোমার তাঁহাদিগকে বলিবার কি অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের জগতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্ব্বকালে অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শানুসারে বিচার করিতে কেন যাও? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন? তুমি যেমনটী চাও, তেমনটী পাইবে। কিন্তু তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না; তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চাহেন, জগতের কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ এবং উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে গোষ্পদতুল্য। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহ কেন? এই ভাবটী একেবারে ছাড়িতে হইবে। প্রত্যেককে আপনার আপনার ভাবে চলিতে দাও।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমি 'সচিত্র লণ্ডন সমাচার' (Illustrated London News) নামক সংবাদপত্রে একটী সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ *

* প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিওপ ও আমেরিকার কতকগুলি ম্যান অফ ওয়ার।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় ঐ ঘটনার একখানি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই ব্রিটিশ জাহাজ খানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। আর ছবিখানিতে ইহা দেখাইতেছে, যে জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদের ডেকে মজ্জমান আরোহিদল দাঁড়াইয়া যে জাহাজখানি ঝড় কাটাইতেছে, সেই জাহাজ খানির লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোককে টানিয়া নিজের ভূমিতে লইয়া যাইও না। আর এক নির্ব্বুদ্ধিতা লোকের দেখা যায় যে, যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যেন যাঁহারা উহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য সর্ব্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন! যদি সকল দেশে অন্ততঃ দুইশত নরনারী বাস্তবিক দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তবে দুদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, আমরা মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য কেমন মরিতে প্রস্তুত! এ সকল লম্বা লম্বা কথামাত্র—এ সকল কথা বলিবার কোন স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ যে, যাঁহারা এই ক্ষুদ্র আমিকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর যতই লোকে আপনাকে ভুলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ হইবে। উহার মধ্যে একটী স্বার্থপরতা, অপরটী নিঃস্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগসুখে আসক্ত হইয়া থাকা এবং এইগুলিই চিরকাল থাকিবে মনে করাই অতিশয় স্বার্থপরতা। ইহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে—উহার উৎপত্তির কারণ, ঘোর স্বার্থপরতা। আর কাহারো দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব, এই ভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবলশালী পুরুষ আরো দেখিতে চাই—তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র পশুর উপকারের জন্য শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন! নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা ত আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র!

আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ও সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের

জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে বনে গমন করেন নাই। জগৎ জ্বলিয়া গেল—কেহ উহা হইতে বাঁচিবার পথ না করিলে চলিবে কেন? তাঁহার সারা জীবন এই এক চিন্তা ছিল—জগতে এত দুঃখ কেন? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ?

* * * * * *

যীশু খ্রীষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও বেদান্ত-ধর্ম্মে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। তিনি অদ্বৈতবাদও প্রচার করিয়াছেন আবার সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার সোপানস্বরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। যিনি 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার ইহাও বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই অভেদবুদ্ধি আসিয়া থাকে। তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল প্রেম ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ ভাব প্রবেশ করিয়া উহা বিকৃতভাব ধারণ করিল। এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এ জীবনে নহে, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি', এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ঐ ধর্ম্মের বিকৃত ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা নিঃস্বার্থপরতা—ইহা নীতির ভিত্তিস্বরূপ। ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি আর যে সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি, তাঁহারা, এই ক্ষুদ্র 'আমি' নাশ হইলে একেবারে সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল! সর্ব্বপ্রকার শুভের, সর্ব্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র আমি নয়, তুমি। কে ভাবিতে যায়, স্বর্গনরক আছে কি না? কে ভাবিতে যায়, আমার আত্মা আছেন কি না? কে ভাবিতে যায়, কোন অপরিণামী সত্তা আছে কি না। এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দাও, হয়, উহা দূর কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন কর। আপনাকে ভুলিয়া যাও; আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীশ্চিয়ান হও বা মুসল-

মান হও, ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে—নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু—অহং নাশ ও প্রকৃত আমির বিকাশ।

দুটী শক্তি সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্য করিতেছে। একটী অহং, অপরটী নাহং। এই নিঃস্বার্থপরতা শক্তি শুধু মানুষের ভিতর নয়, তির্য্যগ্‌জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন কি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুগণের ভিতর পর্য্যন্ত এই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহ্বা ব্যাঘ্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, সেও তাহার অনাহারে মুমূর্ষু স্ত্রী অথবা পুত্র কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অতএব দেখা যায়, সৃষ্টির ভিতরে এই দুই শক্তি পাশাপাশি কার্য্য করিতেছে—যেখানে একটী শক্তি দেখিবে, সেখানে অপর শক্তিটীরও অস্তিত্ব দেখিবে। একটী স্বার্থপরতা, অপরটী নিঃস্বার্থপরতা। একটী গ্রহণ, অপরটী ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে-- ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদায় কার্য্য ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষণের উপর স্থাপিত? জগতের সমুদয় কার্য্য, রাগ দ্বেষ বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত, এ কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? এই সকল প্রবৃত্তি যে জগতের অনেকাংশকে পরিচালিত করিতেছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। তাঁহাদের অপর শক্তিটীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কি অধিকার আছে? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম, এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র ভাবরূপিণী শক্তি? অপর শক্তিটী ঐ প্রেমশক্তিরই অন্যায় পরিচালন—ঐ প্রেমশক্তি হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি। অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল মঙ্গলবিধায়িনী শক্তির অপব্যবহার মাত্র। পথে যে ব্যক্তি ঐ আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিল, সেও হয়ত আপন সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ কার্য্য করিল। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে গুড়াইয়া তাহার সন্তানের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক বা অসীমই হউক, উহা সেই ভগবান বই আর কিছুই নহে।

অতএব সমগ্র জগতের পরিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত জিনিষ—উহা যে কোন আকারে ব্যক্ত হউক না, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ। বেদান্ত এই স্থানেই দ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের উপর ঝোঁক দেন। আমরা এই অদ্বৈত ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই এই জন্য যে, আমরা জানি, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিমান সত্ত্বেও আমরা জানি যে, একটী কারণ দ্বারা যেখানে কতকগুলি কার্য্যের ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্য্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সেই অনেকগুলি কারণ,পূর্ব্বোক্ত এক কারণের সহিতই সমান হইয়া পড়িল। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি যে, সেই একই অপূর্ব্ব সুন্দর প্রেম, সীমাবদ্ধ হইয়াই অসৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেমশক্তি দ্বারা সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের দুইটী কারণ মানিতে হইবে—একটী শুভশক্তি, অপরটী অশুভ শক্তি—একটী প্রেমশক্তি, অপরটী দ্বেষশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টী অধিক ন্যায়সঙ্গত? অবশ্য—এক শক্তির দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা।

আমি এক্ষণে এমন সকল বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদী-দের মতসঙ্গত নহে। আমার বোধ হয়, আমি অদ্বৈতবাদে বেশীক্ষণ থাকিতে পারি না। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ, উচ্চতম দার্শনিকধারণার সহিত অসঙ্গত নহে। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাট করিতে হয় না। বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত হইতে গেলে তোমাকে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন হইতে হয়। মনুষ্যের জ্ঞান, মনুষ্যের শুভের বিরোধী নহে। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ,—অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় ও অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার চরমাবস্থায় ব্রহ্মপ্রকাশ করে। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষের নিন্দা করিও না অথবা নিরাশ বা বিষণ্ণ হইয়া পড়িও না, অথবা ইহাও মনে করিও না, আমরা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—যতক্ষণ না অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য

ইহা দোষ নহে। কারণ, আশ্রীয়মাণ (যে উদাত্ত প্রভৃতি গুণকে আশ্রয় করিয়া আদেশ হইয়া থাকে) গুণ, ভেদক হইয়া থাকে। যেমন ;—'শুক্লমাল-ভেত কৃষ্ণমালভেত'। বেদে যে স্থলে, এই সকল আদেশবাক্যে, শুক্ল বা কৃষ্ণ পশু লাভের (যথার্থ পশু সংগ্রহের) আদেশ করা হইয়াছে ; সেখানে যে শুক্ল পশু লাভ কর্ত্তব্য হইলে, কৃষ্ণ পশু লাভ (সংগ্রহ) করিয়া থাকে, তাহার তদ্দ্বারা (কৃষ্ণপশু দ্বারা) বেদের যথোক্তরূপ বিধান প্রতিপালন করা হয় না। সুতরাং, যেহেতু উদাত্তাদি স্বরে কোনও ভেদ নাই, সেহেতু উদাত্তাদির গ্রহণ জন্য 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল। অসন্দেহার্থস্তর্হি তকারঃ। ঐজিত্যুচ্যমানে সংদেহঃ স্যাৎ কিমিমাবৈচাবোহোস্বিদাকারোঽপ্যত্র নির্দ্দিশ্যত ইতি। সন্দেহমাত্রমেতদ্‌ভবতি। সর্ব্বসন্দেহেষু চেদমুপতিষ্ঠতে। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নাহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি। ত্রয়াণাং গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। অন্যত্রাপি হ্যয়মেবং-জাতীয়কেষু সন্দেহেষু ন কঞ্চিদ্‌যত্নং করোতি। তদ্‌যথা। ওতোঽম্‌শসোরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—তবে, সন্দেহ না হয়, এই জন্য 'ত'কার উচ্চারণ প্রয়োজন। কারণ, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'আদৈচ্' না বলিয়া, কেবল 'ঐচ্' বলিলে সন্দেহ হইবে যে, কেবল কি ইহা 'ঐচ্'ই অথবা ইহার মধ্যে 'আ'কারও নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে (আ + ঐচ্ = ঐচ্)। এই সন্দেহ নিবারণের জন্যই 'ত'পর-বিশিষ্ট 'আদৈচ্' এইরূপ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র সন্দেহের জন্য 'আ'কার, 'ত'পরবিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য ? সকল সন্দেহেই ইহা (পরিভাষা) উপস্থিত হইবে যে,—ব্যাখ্যান দ্বারাই বিশেষ জ্ঞান জন্মে, সন্দেহ মাত্র দ্বারা কখনও তাহা অলক্ষণ হয় না। অতএব এখানেও তিন বর্ণের অর্থাৎ আকার, ঐকার, ঔকারেরই গ্রহণ হয় ; এইরূপ ব্যাখ্যা করিব। তাহা হইলে, (ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপত্তি করিতে হইলে) অন্যত্রও এই এই প্রকার জাতীয় সন্দেহসমূহে, কোনও যত্ন করিতে হইবে না। যেমন ;—"ওতোঽম্‌শসোঃ ।৬।১।৯৩। (ওকারের পরে, অম্ এবং শস্ প্রত্যয়ের

তাহার উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয় হয়। যেমন,—কপোত + অঞ্ = কাপোতম্। ময়ূর + অঞ্ = মায়ূরম্) এইস্থলে যেমন, অনুদাত্তাদিবিশিষ্ট শব্দের উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে, সেরূপ স্বরিতাদিবিশিষ্ট শব্দের উত্তরও প্রাপ্তি হইবে।

'অচ্' থাকিলে, 'আ'কার একাদেশ হয়) এই স্থলেও যে, আ+ঔতঃ=ঔতঃ, (ঔতঃ+অম্‌শসোঃ=ঔতোঽম্‌শসোঃ) হইয়াছে, কেবল 'ঔতঃ'ই নহে, ইহাও ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রতিপত্তি হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আন্তর্য্যতস্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রা চতুর্মাত্রা আদেশা মা ভূবন্নিতি। খট্বা ইন্দ্রঃ খট্বেন্দ্রঃ। খট্বা উদকম্ খট্বোদকম্। খট্বা ঈষা খট্বেষা। খট্বা ঊঢা খট্বোঢা। খট্বা এলকা খট্বৈলকা। খট্বা ওদনঃ খট্বৌদনঃ। খট্বা ঐতিকায়নঃ খট্বৈতিকায়নঃ। খট্বা ঔপগবঃ খট্বৌপগব ইতি। অথ ক্রিয়মাণেঽপি তকারে কস্মাদেব ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রা আদেশা ন ভবন্তি। তপরস্তৎকালস্যেতি নিয়মাৎ। নন্বু তঃ পরো যস্মাৎ সোঽয়ং তপরঃ নেত্যাহ। তাদপি পরস্তপরঃ। যদি তাদপি পরস্তপরঃ ঋদোরবিতি ইহৈব স্যাৎ। যবঃ স্তবঃ। লবঃ পব ইত্যত্র ন স্যাৎ। নৈষ তকারঃ। কস্তর্হি। দকারঃ। কিমত্র দকারে প্রয়োজনম্। অথ কিং তকারে। যদ্যসংদেহার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। অথ মুখার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। বৃদ্ধিরাদৈচ্।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহাই তপর করণের প্রয়োজন যে,—আন্তর্য্য (সদৃশতমতা) প্রযুক্ত, তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা বিশিষ্ট যে স্থানি, তাহার স্থানে তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ না হইতে পাবে। যেমন,—খট্বা+ইন্দ্রঃ=খট্বেন্দ্রঃ (৩ মাত্রা), খট্বা+উদকং=খট্বোদকম্ (৩ মাত্রা), খট্বা+ঈষা=খট্বেষা (৪ মা); খট্বা+ঊঢা=খট্বোঢা (৪ মা), খট্বা+এলকা=খট্বৈলকা (৪ মা), খট্বা+ওদনঃ=খট্বৌদনঃ (৪), খট্বা+ঐতিকায়নঃ=খট্বৈতিকায়নঃ (৪), খট্বা+ঔপগবঃ=খট্বৌপগবঃ (৪), এই সকল স্থলে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট 'খট্বা' শব্দের আকারের পরে, 'ইন্দ্র' ইত্যাদি এক মাত্রা বা দুইমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ থাকিলে, একত্রমিলিত হইয়া তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট করিলেও, কেন তিনমাত্রা চারিমাত্রা বিশিষ্ট স্থানিবর্ণ সমূহের স্থানে, তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না?

'তপরস্তৎকালস্য' (১) এই নিয়ম দ্বারাই তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না।

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যদি বল যে, 'ত'কার আছে পরে যার, এমন যে বর্ণ, সেই তপর; তাহা হইলেত 'আদৈচ্' এর 'ত'কারের পরে 'ঐ'কার থাকাতেও দুইমাত্রা বিশিষ্ট 'আ'কারেরই মাত্র গ্রহণ হইবে; কিন্তু দুই মাত্রা বিশিষ্ট 'ঐ'কার 'ঔ'কারের গ্রহণ হইবে না?

কেবল 'ত'কার আছে পরে যাহার, সেই যে 'ত'পর, তাহা বলা হইবে না। 'ত'কারের পরে যে বর্ণ আছে, তাহাকেও 'ত'পর বলা হইবে। তাহা হইলেই 'আদৈচ্'এর, 'ত'কারের পরে 'ঐ'কার'ঔ'কার থাকাতে, তিনমাত্রিক বা চারিমাত্রিক আদেশ 'খট্বৈতিকায়ন' প্রভৃতির 'ঐ'কারের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার প্রাপ্তি না হইয়া, দুইমাত্রিক 'ঐ'কারাদির প্রাপ্তি হইবে। (১)

যদি 'ত'কারের পরে যে বর্ণ, তাহাকেও তপর বলা যায়, তবে "ঋদোরপ্" (২) ৩।৩।৫৭। এই সূত্রে, 'ঋদ'এর তকারের পর হ্রস্ব 'উ'কার থাকাতে, একমাত্রা-বিশিষ্ট হ্রস্ব 'উ'কারান্ত 'যু'ধাতু এবং 'স্তু'ধাতুরই উত্তর 'অপ্'প্রত্যয় হইয়া "যবঃ""স্তবঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ 'ঊকারান্ত 'লূ এবং 'পূ' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয়ও প্রাপ্তি হইবে না; সুতরাং 'লবঃ' 'পবঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না?

এই দোষ এখানে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, ইহা (ঋদোরপ্) 'ত'কার নহে।

তবে কি?

'দ'কার।

এখানে, 'দ'কারের প্রয়োজন কি?

পুনরায় আমিও জিজ্ঞাসা করিব—আপনারই বা 'ত'কারের ('ঋদোরপ' সূত্রে) প্রয়োজন কি?

যদি সন্দেহ ('ঋ'কারে 'উ'কারে মিলিবা ক এবং তৎপরে 'অপ' করিয়া 'র্বপ্' সূত্র করিলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন্ ২ বর্ণ মিলিয়া 'র্বপ্' হইয়াছে) না হয়, এইজন্য 'ত'কার করিবার প্রয়োজন হয়, তবে 'দ'কারও সেই জন্যই

(১) 'খট্বৈন্দ্র' হইতে, 'খট্বৌঢ়া' পর্য্যন্ত চারিটী প্রয়োগ, 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিচারহ পুনঃ 'অদেঙ্গুণঃ' সূত্রেও উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া, পুনরুক্তি ভয়ে আর ভাষ্যকার 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য করেন নাই; ইহারই মধ্যে অন্তর্ভাব করিয়াছেন।

(২) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রয়োজন। আর যদি মুখসুখার্থ 'ত'কারের প্রয়োজন হয়, তবে 'দ'কারও সেই জন্যই (মুখের সুখের জন্যই) প্রয়োজন।

এই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল।

সূত্রমূল।—ইকো গুণবৃদ্ধী ১।১।৩।

ইকঃ।৬। গুণবৃদ্ধী।১। (১)

সূত্রার্থ।—'গুণ'শব্দ এবং 'বৃদ্ধি'শব্দ দ্বারা, যে স্থলে গুণ এবং বৃদ্ধি কার্য্য বিধান করা যাইবে, সেই স্থানে, সেই গুণ ও বৃদ্ধিরূপ কার্য্য, 'ইক্' প্রত্যাহারস্থিত বর্ণসমূহের স্থানে হয়, এইরূপ জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইগ্ গ্রহণং কিমর্থম্। ইগ্ গ্রহণমাৎসন্ধ্যক্ষরব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্ *। ইগ্‌গ্রহণং ক্রিয়তে। কিং প্রযোজনম। আকারনিবৃত্ত্যর্থং সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থং ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থঞ্চ। আকারনিবৃত্ত্যর্থং তাবৎ। যাতা বাতা। আকারস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে, সকল বর্ণের গ্রহণ না করিয়া, কেবল ইক্ প্রত্যাহারের গ্রহণ কেন করা হইল? (অর্থাৎ এইসূত্র কেন করা হইল?)

ইক্ গ্রহণ করা হইয়াছে, আকার, সন্ধি অক্ষর এবং ব্যঞ্জন-বর্ণ নিবৃত্তির জন্য। *। ইক্ প্রত্যাহারের গ্রহণ করা হইয়াছে কি প্রয়োজনে?

গুণ ও বৃদ্ধিরূপ কার্য্য—আকারেতে নিবৃত্তির জন্য,—সন্ধ্যক্ষরেতে (এ, ও, ঐ, ঔ তে) নিবৃত্তির জন্য, এবং ব্যঞ্জন বর্ণেতে নিবৃত্তির জন্য। আকার নিবৃত্তির জন্য যথা, যাতা, বাতা (যদি ইক্ ভিন্ন সর্ব্বত্রই গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; তবে এই স্থলেও 'আ'কারের গুণ হইয়া, 'অ'কার হইয়া যাইত, এবং 'যতা' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইতে লাগিত) ইত্যাদিস্থলে 'আ'কারের গুণ প্রাপ্ত হইত; ইক্‌প্রত্যাহারের (গুণবৃদ্ধিকার্য্যে) গ্রহণ করাতে, তাহা হইল না।

ভাষ্যমূল।—সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থম্। গ্লায়তি, ম্লায়তি। সন্ধ্যক্ষরস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সন্ধ্যক্ষর (২) নিবৃত্তির জন্য, যথা,—গ্লায়তি, ম্লায়তি।

---

(১) এক হইতে সাত পর্য্যন্ত যে কোন অঙ্ক থাকিবে, সেই শব্দকে সেই বিভক্তি এবং বিন্দুদ্বারা একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন জানিবে।

(২) অ ই, এবং অ উ যোগে, প্রযত্ন ভেদে, এ, ঐ, ও, ঔ হয়; সন্ধি অর্থাৎ বর্ণদ্বয় সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে সন্ধ্যক্ষর বলে।

ইক্‌প্রত্যাহার ভিন্ন সকল বর্ণে, গুণও বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, মৈ ও মৈ ধাতুর ঐকারের গুণ প্রাপ্ত হইয়া, 'এ'কার আদেশ হইত, অথচ 'আয়্' আদেশ হইয়া, ম্লায়তি, ম্লায়তি পদসিদ্ধ হইত না), সন্ধ্যক্ষরের গুণপ্রাপ্ত হইত। ইক্‌প্রত্যাহার গ্রহণ হেতু তাহা হইল না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্। উম্ভিতা। উম্ভিতুম্। উম্ভিতব্যম্। ব্যঞ্জনস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জন বর্ণে (গুণ, বৃদ্ধি) নিবৃত্তির জন্য। যথা;—উম্ভিতা, উম্ভিতুম্, উম্ভিতব্যম্, (এই স্থলে 'ভ'কারের ওষ্ঠ স্থান বলিয়া, গুণ হইয়া, 'ও'কার প্রাপ্ত হইত) এইস্থলে ব্যঞ্জনের গুণ প্রাপ্ত হইত; 'ইক্' গ্রহণ হেতু, তাহা হইবে না।

ভাষ্যমূল।—আকারনিবৃত্ত্যর্থেন তাবদর্থঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নাকারস্য গুণোভবতীতি। যদয়মাতোঽনুপসর্গে ক ইতি 'ক'কারমনুবন্ধং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। কিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনম্. কৃঙিতীত্যাকারলোপো যথা স্যাৎ। যদি চাকারস্য গুণঃ স্যাৎ কিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। গুণে কৃতে দ্বয়োরকারয়োঃ পররূপেণ সিদ্ধং রূপং স্যাদ্ গোদঃ কম্বলদ ইতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্য গুণো ভবতীতি। ততঃ 'ক'কারমনুবন্ধং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকার নিবৃত্তির জন্য, 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কেন না, আকারে যে গুণ হয় না, তাহা, শাস্ত্রের অন্যান্য স্থলে, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তিই (প্রয়োগ), জ্ঞাপন করিতেছে; যেমন এই আতোঽনুপসর্গে কঃ।৩।২।৩। ('আ'কারান্ত ধাতুর উপসর্গরহিত কর্ম্ম উপপদে থাকিলে, 'ক'প্রত্যয় হয়, অণ্ প্রত্যয় হয় না) সূত্রে, 'ক'কার অনুবন্ধ করিয়াছেন।

('ক'কার অনুবন্ধ করাতে আচার্য্যের প্রবৃত্তি) কিরূপে জ্ঞাপক হইল? উক্ত সূত্রে, 'ক'কার ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, ('ক'কার 'গ'কার 'ঙ'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর আকারের লোপ হয় (১) 'ক'কার ইৎ নিমিত্ত আকার লোপ যাহাতে হয়। যদি 'আ'কারের গুণই হয়; তবে এইসূত্রে. 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হয়, ('অ'প্রত্যয় করিলেই), 'আ'কারের গুণ করিলে পর ('আ'কারের গুণে,

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে, "আতোলোপ ইটি চ।৬।৪।৬৪। সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এক অকার, আর প্রত্যয়ের এক অকার) দুই 'অ'কারের পররূপ এক 'আ'কার হইয়া, গোদ, কম্বলদ, এইরূপ (পদ) সিদ্ধ হইবে। আচার্য্য (পাণিনি) দেখিয়াছেন যে, 'আ'কারের গুণ হয় না; এবং সেই হেতুই 'ক'কার অনুবন্ধ করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। উপদেশসামর্থ্যাৎ সন্ধ্যক্ষরস্য গুণো ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সন্ধ্যক্ষর (এ, ও, ঐ, ঔ তে গুণ) নিবৃত্তির জন্যও 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কেন না (অই, অ উ, র সংযোগেই যখন এ, ও, ঐ, ঔ, হইয়াছে, তখন পুনঃ এ ও ঙ্, ঐঔচ্ উপদেশ করা হইয়াছে কেন ?) এচ এর উপদেশ হেতুই সন্ধ্যক্ষরের (এ ও ঐ ঔ র) গুণ হইবে না। অর্থাৎ যদি এ ঐ প্রভৃতি বর্ণের গুণই হইত; তবে ইহাদের উচ্চারণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন ব্যঞ্জনস্য গুণোভবতীতি। যদয়ং জনের্ডং শাস্তি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। ডিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনং ডিতীতি টিলোপো যথা স্যাৎ। যদি ব্যঞ্জনস্য গুণঃ স্যাদ্ ডিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। গুণে কৃতে ত্রয়াণামকারাণাং পররূপেণ সিদ্ধং রূপং স্যাদুপ-সরজোমন্দুরজ ইতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যোন ব্যঞ্জনস্য গুণোভবতীতি ততোজনের্ডং শাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জনবর্ণসমূহে, গুণবৃদ্ধিনিবারণের জন্যও 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। যেহেতু, ব্যঞ্জনবর্ণের যে গুণ হয় না, তাহা আচার্য্যের (পাণিনির) অভিপ্রায়ানুসারেই জানা যাইতেছে। কেন না, তিনি (পাণিনি), 'জন' ধাতুর উত্তর, 'ড' প্রত্যয় শাসন (বিধান) করিয়াছেন।

'ড্'প্রত্যয় বিধানে, কিরূপে জানা গেল যে, ব্যঞ্জনের গুণ হয় না ?

এই স্থলে, 'ড্'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, 'ড্ক'ার ইৎপ্রযুক্ত (১) 'টি' (২) র, যাহাতে লোপ হয়। যদি ব্যঞ্জনেরও গুণ-হয়; তবে ড্ ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনাবশ্যক হইয়া থাকে। (যদি ব্যঞ্জনের গুণ হইত, তবে 'উপ'পূর্ব্বক 'সর'শব্দ পূর্ব্বক 'জন' ধাতু এবং 'মন্দুর' শব্দ পূর্ব্বক 'জন'ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় না করিয়া, কেবলমাত্র 'অ'প্রত্যয়

(১) 'ড'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'টি'র লোপ হয়।

(২) শব্দের অন্ত্যাবর্ত্তী যে 'অচ্' (স্বরবর্ণ), তদবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণ, তাহার 'টি' সংজ্ঞা হয়।

করিলেই, 'জন'ধাতুর 'ন্'কারের গুণে 'অ'কার, 'ন'কারস্থিত 'অ'কার, অথি প্রত্যয়ের 'অ'কার,) 'ন'কারের গুণ করিলে পর, এই তিন 'অ'কারের স্থানে, পর 'অ'কার রূপ একটী মাত্র অকার হইয়া, উপসরজ, মন্দুরজ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। (যদি 'অ'প্রত্যয় করাতেই প্রয়োজনীয় প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, তবে'ড্' ইংবিশিষ্ট প্রত্যয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না।) আচার্য্য (পাণিনি) দেখিয়াছেন যে, ব্যঞ্জনের গুণ হয় না, তজ্জন্ম 'জন' ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয়, বিধান করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতানি সন্তি জ্ঞাপকানি। যত্তাবদুচ্যতে। কিৎকরণং জ্ঞাপকং নাকারস্ত গুণো ভবতীতি উত্তরার্থমেতৎ স্যাৎ। তুন্দশোকয়োঃ পরিমৃজাপনু-দোরিতি। যত্তর্হি গাপোষ্টগিত্যনন্তার্থং ককারমনুবধ্নং করোতি।

এই সকল (ক্ ইৎ, ড্ ইৎ প্রত্যয় করা দ্বারা) আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ (জ্ঞাপন) করেনা।

যাহা উক্ত হইয়াছে যে, (আতোঽনুপসর্গে কঃ। এইসূত্রে) 'ক'কার ইৎ-বিশিষ্ট প্রত্যয় করাতে জানা যাইতেছে যে, আকারের গুণ হয় না; তাহা নহে। কেন না, এইস্থলে 'ক'কার ইৎ করা হইয়াছে, উত্তরোত্তর সূত্রে অনু-বৃত্তি (১) হইবার জন্ত। "তুন্দশোকয়োঃপরিমৃজাপনুদোঃ" এইসূত্রে 'ক'কারইৎ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইয়া যাহাতে প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারে।

আতোঽনুপসর্গে কঃ, এইসূত্রে 'ক'ইৎ'গ্রহণ না হয়, অন্ত সূত্রে চরিতার্থ ("তুন্দশোকয়োঃ" সূত্রে) হইল। কিন্তু তবে "গাপোষ্টক্ ।৩।২।৮" (উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকে, এমন যে, 'গা' ধাতু এবং 'পা'ধাতু, তাহাদের উত্তর টক্প্রত্যয় হয়। সামং গায়তীতি সামগঃ= সাম—গা+টক্। এইস্থলে, টক্প্রত্যয় 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট করিবার, 'গা' ধাতুর 'আ'কার লোপ ভিন্ন, অন্ত কোনও প্রয়োজন নাই।) এইসূত্রে, অন্ত কোন প্রয়োজন না থাকিলেও যে, 'ক'কার অনুবন্ধ (ইৎ) করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, 'আ'কারের গুণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। উপদেশসামর্থ্যাৎ সন্ধ্যক্ষরস্ত গুণো ন ভবিষ্যতীতি। যদি যদ্বৎসন্ধ্যক্ষরস্ত প্রাপ্নোতি তত্তদুপদেশসামর্থ্যাদ্বাধ্যতে। আয়াদয়োপি

(১) একটী সূত্রের সম্যক্ অংশ বা কতক অংশ পরবর্ত্তী সূত্রের পশ্চাৎ গমন করিয়া যে, সেই পরবর্ত্তী সূত্রের সম্যক্ অর্থ করিয়া থাকে, তাহাকে 'অনুবৃত্তি' বলে।

স্তর্হি ন প্রাপ্নুবন্তি। নৈষ দোষঃ। যং বিধিং প্রত্যুপদেশোঽনর্থকঃ স বিধি-র্বাধ্যতে। যস্য তু বিধের্নিমিত্তমেব নাসৌ বাধ্যতে। গুণং চ প্রত্যুপদেশো-ঽনর্থকঃ। আযাদীনাং পুনর্নিমিত্তমেব।

ভাষ্যানুবাদ।—অ+ই=এ, অ+উ=ও। এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণ,—'অ'কার, 'ই'কার, বা 'উ'কার যোগ হইয়াই যখন হইয়াছে, তখন পুনরায় "এ ওঙ্। ঐ ঔচ্।" এইসূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। (যেমন সূত্রে 'ক' একবার গ্রহণ করিয়া ষ পুনঃ গ্রহণ করাতে, 'ক্ষ' বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বর্ণ গ্রহণ করে নাই; যেহেতু, যখন যাহার প্রয়োজন হইবে, তখন 'ক,ষ' যোগ করিয়াই 'ক্ষ'এর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। সেইরূপ) এইস্থলে অ ই উ ণ্, এই সূত্র উপদেশের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইলেও যখন পুনঃ "এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্।" এই সন্ধিঅক্ষর (যুক্ত অক্ষর) উচ্চারণ করা হইয়াছে, তখনই জানা যাইতেছে যে, সন্ধিঅক্ষরের গুণ হয় না।

এই বলা হইল যে, উপদেশ-সামর্থ্য হেতুই সন্ধি অক্ষরের (এ, ও, ঐ, ঔর) গুণ হইবে না; তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে,—যদি সন্ধিঅক্ষরসমূহের যাহা যাহা বিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা উপদেশবলেই নিষেধ হয়; তবে ঐকারাদির স্থানে যে 'আয়্' প্রভৃতি আদেশ (স্ববর্ণ পরে থাকিলে, ঐকার স্থানে আয়্, ঔকারের স্থানে আব্ হয়, যেমন,—নৈ+অক=নায়ক) তাহাও প্রাপ্তি হইবেনা?

ইহা দোষ নহে। কারণ, যে বিধির প্রতি, ঐকারাদিসন্ধ্যক্ষর উপদেশ অনর্থক, সেই বিধিকেই বাধা করিবে; কিন্তু যে বিধির প্রতি ইহা (সন্ধ্যক্ষর) নিমিত্ত হইবে, তাহা (আয়্ প্রভৃতি আদেশ) বাধ করিবে না। গুণের প্রতি ঐ ঔ প্রভৃতি সন্ধ্যক্ষর উপদেশ অনর্থকই হইবে। আর আয়্ প্রভৃতি আদে-শের প্রতি ঐ ঔ প্রভৃতি নিমিত্তই হয়।

ভাষ্যমূল।—যদ্যপুচ্যতে জনের্ডবচনং জ্ঞাপকং ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি। সিদ্ধের্বিধিরারভ্যমানো জ্ঞাপকার্থো ভবতি। ন চ জনের্গুণেন সিদ্ধ্যতি। কুতো হ্যেতৎ। জনেগুণ উচ্যমানোঽকারোভবতি ন পুনরেকারো বাস্যাদোকারো-বেতি আন্তর্য্যতোঽর্দ্ধমাত্রিকস্য ব্যঞ্জনস্য মাত্রিকোঽকারোভবিষ্যতি। এব-মপ্যনুনাসিকঃ প্রাপ্নোতি। পরসবর্ণেন শুদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল যে, "আচার্য্য পাণিনি কর্ত্তৃক 'জন'ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করাতেই ইহা জ্ঞাপক হইয়াছে যে,—ব্যঞ্জনের গুণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা

(শ্রীম—লিখিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব

[সমাধি-মন্দিরে—সঙ্কীর্ত্তনানন্দে]

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে।

সকাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাহিতেছিল। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহ মধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মেজেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যানগৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণীঘাটের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ পূর্ব্বপশ্চিমে যাইতেছে। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ রহিয়াছে। উদ্যান-গৃহের পূর্ব্বধারে পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্ব ধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানার্থ জল লয়। উদ্যানগৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যানপথ, সেই পথের দক্ষিণপশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারাণ্ডায়ও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ বা

বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীর্তন চলিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনগৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত। তন্মধ্যে প্রতাপও আছেন।

* * * * * *

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে, আঁখর দিতেছেন—"সখি, হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়"। ঠাকুরের রাধাভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নির্ব্বাক্ হইলেন ; দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য ; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণস্বর। বলিতেছেন, "সখি, তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে ; তুইতো আমাকে কৃষ্ণ-প্রেম শিখায়েছিলি।"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি, যমুনায় জল আনতে আমি যাব না। কদম্বতলে আমি প্রিয় সখীকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন, 'আহা' 'আহা'।

কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কিষ্ট" কিষ্ট" (কৃষ্ণ কৃষ্ণ)। ভাবে মগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

এইবারে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তাহারা খোল করতালি সঙ্গে গাইতে লাগিল, "রাধে গোবিন্দ জয়।" ঠাকুর আঁখর দিতেছেন,

'ধনি দাঁড়ালোরে।
অঙ্গ ভঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালোরে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালোরে!
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালোরে।

ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত! ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুখে, "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সরলতা ও ঈশ্বরলাভ)

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে একটী অল্পবয়স্ক ভক্ত আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিতলোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসোছস্"!

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না কর্‌লে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এ সব থাক্‌তে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখ্‌ছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোকে বলে, "আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দঘোষ।"

ঠাকুরের ভক্তেরা সরল! ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন?

(ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সরল ছোকরা ভক্তের প্রতি)। দেখ্, তোর মুখে যেন একটা কাল আবরণ পড়েছে, তুই আফিসের কায করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসে হিসাব পত্র কর্‌তে হয় আরও নানা রকম কায আছে; সর্ব্বদা ভাব্‌তে হয়।

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি কর্‌ছিস্, তবে একটু তফাৎ আছে। তুই যার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস্—মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যদি মাগ্ ছেলের জন্য চাকরি কর্‌তিস্, তা হলে আমি বল্‌তুম, "ধিক্ ধিক্! শত ধিক্!

(মণিমল্লিকের প্রতি) "দেখ, এই ছোক্‌রাটি ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সে দিন বলে গেল যে আস্‌বে, আর এলো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপী-প্রেম।)

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল চেয়ার কয়েকখানা জড় করা ছিল, ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক বসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা, গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হয়ে গেল।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ! গৌরাঙ্গের ঐ রকম হয়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা, সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারুর হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর—ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর, তাঁতে অনুরাগ থাক্‌লেই হোল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে]

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আনা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে, এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন! ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া।

বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালকস্বভাব। বলিতে লাগিলেন, "কৈগো, এখনও যে দেয় না! স্বরেন্দ্র কোথায়?"

একজন ভক্ত। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়, রাম বাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখ্‌ছেন। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) রাম অধ্যক্ষ ! তবেই হয়েছে !

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেইখানে, এই রকমই হয়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) সুরেন্দ্র কোথায় ? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হয়েছে। বড় স্পষ্টবক্তা—কাকে ভয় করে কথা কয় না। আর দেখ খুব মুক্তহস্ত। কেও যদি তার কাছে সাহায্যের জন্য যায়, ত শুধু হাতে ফেরে না।

[ভগবান দাস বাবাজী ।

(মাষ্টারের প্রতি)। তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়াছিলে, কি রকম দেখ্‌লে ?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কালনায় গেছিলাম। ভগবানদাস খুব বুড়ো হয়েছেন। রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজনে খাইয়ে দিতে লাগ্‌লো, চেঁচিয়ে কথা কইলে শুন্‌তে পান। আপনার নাম শুনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, তোমাদের আর ভাবনা কি ? সেই বাড়ীতে নামব্রহ্ম ঠাকুরের পূজা হয়।

* * * * * *

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি) আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন আর বল্‌ছিলেন যে, মাষ্টারের কি অরুচি হয়ে গেল! (এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন।)

ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি মাষ্টারের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁগো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি ?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন

না ; সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)

"এমন যায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আস্‌তে পারে, এ যে একেবারে জাহাজ। (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) আচ্ছা, লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরিই সেবা করা, কি বল ? সব জীবের তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান, কি না, তাঁকে আহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে যায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

"হৃদে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বল্লুম, 'দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চল্লুম।'

(মহিমার প্রতি) আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খর্‌চ বেড়ে গেছে ? (সকলের হাস্য)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।]

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, আপনি একবার যাও, দেখ ওরা সব কি কর্‌ছে ; আর না হয় একটু পরিবেশন কর্‌লে!

মহিমাচরণ হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে

আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা ২ টার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন, ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয়, আমি পাহাড়ে গিয়েছিলুম (অর্থাৎ দারজিলিঙ্গে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় নি। তোমার কি অসুখ হয়েছে ?

প্রতাপ। আজ্ঞা, তাঁর (কেশবের) যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হয়েছে।

কেশবের কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছিল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ কত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে পড়্তেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। তাঁর ভক্তির সময়ে সময়ে এত উচ্ছ্বাস হতো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হতো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার]

একটি মহারাষ্ট্রদেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হয়েছেন। মহাশয় কি তার নাম শুনেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না ; তবে তোমার মুখে যা শুন্‌লুম, তাতে বোধ হচ্ছে যে, তাঁর লোক-মান্য হবার ইচ্ছে।

(ভক্তদের প্রতি) এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি কচ্ছি' এটি অজ্ঞান থেকে হয় ; 'হে ঈশ্বর, তুমি ক'রছ' এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা।

"আমি আমি করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাব্‌লে বুঝ্‌তে

পারবে। বাছুর 'হাম্ মা হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে, রোদ নাই বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোক খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয়নি। চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়ি গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় তুঁহু তুঁহু বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,' তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।"

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন করে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না কর্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কারু অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কেমন করে জানা যায় যে, ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করেছে তার চারটী লক্ষণ হয়—(১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু কাঁদে, এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপরে ন্যাংটা; বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে, তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারো অনিষ্ট কর্‌তে জানে না।

"পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল্ সোণার তরোয়াল্ হয়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারুর অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখ্‌লে, সব বল।

প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারি পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব যায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাযের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কায জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা—কি না কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে না। যেমন পূজা জপ তপ কর্‌ছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে কর্‌ছি, অনাসক্ত হয়ে কায কর্‌ছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব কর্‌লুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা কর্‌লুম, মনে কর্‌লুম যে, অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হয়েছে, জান্‌তে দেয় না।

"তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল, যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর।

এক জন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই, তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা—'হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও':

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা কর্ তে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যে টুকু কর্ম্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়'।

"কর্ম্ম ছাড়্‌বার যো নাই। আমি চিন্তা কর্‌ছি, আমি ধ্যান কর্‌ছি, এও কর্ম্ম।

"ভক্তিলাভ কর্‌লে বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। বিষয় কর্ম্ম আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

[জীবনের উদ্দেশ্য কি? কর্ম্ম না ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্মতো আদি কাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু বল্লে, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সে গুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা এই সব। আমি বল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পাল্লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্নে এলেন। এসে বল্লেন, তুমি বর লও, তাহলে তুমি কি বল্‌বে, 'আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল ডিসপেন্‌সারী করে দাও,' না, বল্‌বে, 'হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই'।

"হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কায বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি হতে পারে।

['এগিয়ে পড়']

"তাই বল্‌ছি, কর্ম্ম আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন কর্‌তে কর্‌তে আরও এগিয়ে পড়্‌লে শেষে জান্‌তে পারবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

"একটা গল্প বলি শুন। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছ্‌লো। হঠাৎ একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়।' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময়ে সেই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়্‌লো। তখন সে মনে মনে বল্লে, আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। এই রকমে কিছুদিন যায়। আবার একদিন মনে পড়্‌লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি! এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নি। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী কর্‌তে লাগ্‌লো। এত টাকা হলো যে, আণ্ডিল হয়ে গেল।

"আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাব্‌ছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপার খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্‌লে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, এগিয়ে পড়!

আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হলো।

"তাই বল্‌ছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ তপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, তাহলে

কর্ম্ম, নিষ্কাম করতে পারবে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও", আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যে টুকু কর্ম্ম রাখবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হয়ে করতে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।"

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবারে তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। শুনছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে কি নাকি ঝগড়া হয়েছে। যারা ঝগড়া করেছে, তারা তো সব হবে প্যালা পঞ্চা (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)। "দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে। আর যা সব শুন, তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি বল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

* * * * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) দেখ, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেস বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তার নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, আমাদের ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে। এই কথা শুনে আমি অবাক্। তখন একটা গল্প মনে পড়্‌লো। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে, এক গোয়াল ঘোঁড়া। এখন গোয়াল যদি হয়, তাহলে কখন ঘোঁড়া থাকৃতে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। একথা অসম্ভব কথা শুনলে লোকে কি ভাবে ? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নেই (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নেইই। গরুও নেই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে কি না বল্‌ছে নীরস।

এতে এই বোঝা যায় যে, ও ব্যক্তি ঈশ্বর যে কি জিনিষ, তা কখনও অনুভব করে নাই।

(প্রতাপের প্রতি উপদেশ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) দেখ তোমায় বলি। তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা! কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই। এসব তো অনেক হলো, লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ, অনেক তো হলো। আর কি এসব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দেও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দেও।

প্রতাপ। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এসব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসিয়া)। তুমি বল্‌ছো বটে, তাঁর নাম রাখ্‌বার জন্য সব কচ্ছো; কিন্তু কিছু দিন পরে এ ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শুন।

"একজন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর; অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছু দিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টল্‌ টল্‌ কর্ত্তে লাগ্‌লো; তখন সে ঘররক্ষার জন্য ভারি চিন্তিত হলো। বল্লে, হে পবন দেব, দেখো যেন ঘরটী ভেঙ্গনা বাবা! পবন দেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড়্‌ মড়্‌ কর্ত্তে লাগ্‌লো। তখন লোকটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়্‌লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া, অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গনা, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। কিন্তু ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে! অনেক বার 'হনুমানের ঘর' হনুমানের ঘর' করার পর দেখ্‌লে যে কিছু হলো না। তখন বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবা, লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর। তাতেও হোলো না। তখন বলে, বাবা, রামের ঘর, রামের ঘর, দেখো বাবা ভেঙ্গ না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হলো না, ঘর মড়্‌ মড়্‌ করে ভাঙ্গ্‌তে আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় বল্‌তে লাগ্‌লো, যা! শালার ঘর!

(প্রতাপের প্রতি) কেশবের নাম তোমায় রক্ষা কত্তে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জান্‌বে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে, তুমি কি করবে?

[জীবনের উদ্দেশ্য ; ডুব দাও।]

"তোমার এখন কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।"

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতে লাগিলেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

(প্রতাপের প্রতি)। "গান শুন্‌লে? লেক্‌চার, ঝগড়া, ওসব তো অনেক হলো, এখন ডুব দেও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মর্‌বার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর। মনে কোরোনা যে, এতে মানুষ বেহেড্ হয়। মনে কোরোনা যে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—

প্রতাপ। মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও আছে একটি ছোক্‌রা। তাই বল্‌ছি, আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ্, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি যে, এই সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা, মনে কর্, একখুলি রস আছে, আর তুই মাছি হইছিস্। তা কোন্ খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্‌লে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, কেন? কিনারায় বস্‌বি কেন? সে বল্লে, বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দসাগরে সে ভয় নাই, এ যে অমৃতের সাগর। ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড্ হয় না।

(ভক্তদের প্রতি)। 'আমি' আর 'আমার' এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক করে গেছেন। এ কথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হয়েছে। আমি কচ্ছি, এইটির নাম অজ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, এই-

টির নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এসব তোমার জিনিস—এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস।

"আমার জিনিস, আমার জিনিস, বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সব্বাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোক-গুলিকে ভাল বাসি, কি শুধু পরিবারদের ভাল বাসি, এর নাম মায়া, শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন"।

* * * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী কাঞ্চন।)

প্রতাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, যাঁরা আপনার কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হচ্ছেতো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি যে, সংসার করতে দোষ কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

[গৃহস্থের সাধন।]

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমা-দের বাড়ী'। কিন্তু মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে', 'আমার হরি মিষ্ট খেতে ভাল বাসে না'। কিন্তু আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর; জেনো যে, বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়, এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে; আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে"।

* * * *

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়, আজ-কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন, এ কথা মানেন না ?

প্রতাপ। মুখে তাঁরা যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক, তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেকেরই মান্‌তে হয়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হলেই হলো, শক্তিতো মানছে? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ। তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎকার্য্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয় এ কথা) ও মানেন।

* * * *

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। আর কি বল্‌বো তোমায়? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর এক কথা, কামিনী কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না—এই দেখনা, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে, ভাল—

প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল, কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া গেল। অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি একথা একেবারেই প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমুদয় ব্রহ্ম। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয় হয় জানিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবে।

তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, প্রকাশস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্কাম ও বাক্যশূন্য।

এই আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। তিনি ব্রীহি, যব, শ্যামাক অথবা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও সূক্ষ্ম। হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই আত্মা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এমন কি, সমুদয় লোক হইতেও বৃহৎ।

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্কাম, বাক্যশূন্য এই আত্মা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজিত। ইনি ব্রহ্ম, আমি মৃত হইয়া ইহাঁর স্বরূপ হইব। এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ইতি ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, অপরের সাহায্যে আমাদের কিছু হইতে পারে না। আমরা গুটিপোকার মত। আমরা আপনার শরীর হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্ত নয়। আমরা উহা হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে এই কর্ম্মজাল জড়াইয়াছি। আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি,আমরা যেন বদ্ধ; আর কখন কখন সাহায্যের জন্ত চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের সকল দেবগণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম, অবশেষে আমি দেখিলাম, আমি সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল আর ভ্রান্তিবশতঃ এতদিন নানারূপ কর্ম্ম করিতেছিলাম। সেই ভ্রান্তিকে নিরাস করিতে হইল। ইহাই এক মাত্র উপায়। আমি নিজে যে জালে আপনাকে জড়াইয়াছিলাম,তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে আর তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও আমার ভিতরেই রহিয়াছে। এ বিষয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের সদসৎ কোন প্রবৃত্তিই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয় কর্ম্মেরই সমষ্টিস্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলচুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি না করিলে আমি আজ যাহা, তাহা কখনই হইতাম না। আমি এক্ষণে আমার জীবন লইয়া বেশ তুষ্ট আছি। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় নানাপ্রকার অন্যায় কর্ম্ম করিতে থাক। আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও, পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্তরূপ হইতেই পারে না, কারণ, শিবত্ব ও শুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, আর, কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থস্বরূপ সর্ব্বদাই একরূপ।

আমাদের ইহা বুঝা আবশুক যে, আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্ব্বল। আমি পাপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভ্রমশব্দ ব্যবহার করা অধিক পছন্দ করি। আমাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা আপনারাই আপনাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছি। আমরা আপনাদের চক্ষে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করি-

তেছি। হাত সরাইয়া লও, তাহা হইলে দেখিবে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসনা। কোন পশু যে ভাবে অবস্থিত, সে তদতিরিক্ত অন্য কিছুরূপে থাকিতে চায়—সে দেখে, সে যে সকল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, সেগুলি তাহার উপযোগী নহে—সুতরাং সে একটী নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্ব্বনিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে উৎপন্ন হইয়াছে- আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরো উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমান। তুমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমান হয়, তবে আমি অনেক কায যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন? তুমি যখন এ কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র আমির দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই মানুষ হইয়াছে। কে তোমাকে এই মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্ব্বশক্তিমান? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরো অধিক উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার দুর্ব্বলতা নহে।

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার প্রকৃতিই অসৎ আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশ করি, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরো মন্দ হইবার পথ দেখান হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া হায়, বড় অন্ধকার, বড় অন্ধকার বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটী দেয়াশলাই জ্বালিলেই এক মুহূর্ত্তে গৃহ আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কায করিয়াছি,' বলিয়া চিন্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমরা যে নানাদোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বাল, এক মুহূর্ত্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে, সেই জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে—প্রকাশ কর—প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকল ব্যক্তিই এমন অবস্থা লাভ করুন যে,

অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী ভগবানকে দেখিতে পারেন আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারেন, 'হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়, উঠ; হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, উঠ; হে অজ, অবিনাশী, সর্ব্বশক্তিমান, উঠ, আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।' অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ স্মরণ, সদা সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্ব্বদা, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সদাশিব, নিষ্কাম বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর তিনি অকাম বলিয়াই অভয় ও ওজঃ-স্বরূপ, কারণ, কামনা, স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের জন্য কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ্ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদিগকে অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতেই মৃত। তখন আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ এ সকল ভাব চলিয়া যায়, ওগুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র—অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ, নিত্য ওজঃস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ আর তখন আমার সকল ভয় চলিয়া যায়। কে এই সর্ব্বব্যাপী আমার অনিষ্ট করিতে পারে? এইরূপে আমার সমুদয় দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়; তখন আর সকলের ভিতর সেই শক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য হয়। আমি দেখিতেছি, তিনিও সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। সুতরাং আমার তাঁহাকে শিখাইতে হইবে, তাঁহার সেই অনন্তস্বরূপ প্রকাশে আমাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে ইহাই বিশেষরূপ আবশ্যক। এই সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্ব্বতও তখন উৎপন্ন হয় নাই, যখন এই সকল মত প্রথম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সকল সত্যই সনাতন। সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই উহা নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। সকল আত্মার প্রকৃতিই সত্য। কোন ব্যক্তিবিশেষের উহার উপর বিশেষ দাবী নাই। কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে কারণ, তোমরা দেখিবে, উচ্চতম সত্যসকল অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে

উহার প্রচার আবশ্যক, যাহাতে উহা সমাজের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে—যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনের পর্য্যন্ত অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উহা জানিতে পারে। এই সকল ন্যায়ের কূট বিচার, দার্শনিক মীমাংসাবলি, এই সকল মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার দিয়া থাকিতে পারে কিন্তু আইস, আমরা এক্ষণে ধর্ম্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপাসক হইবেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ সত্যই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইবেন।

সমাপ্ত

জ্ঞানযোগের বিশেষ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানযোগ সমাপ্ত হইল। যে সকল গ্রাহক মহোদয় উদ্বোধন হইতে খুলিয়া ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইবেন, তাঁহারা চার পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে ইহার সূচী, ভূমিকা ও টাইটেলপেজ পাইবেন।

একটী স্বপ্ন।

গভীরা রজনী নাহি জীব সাড়া,
আঁধারের কোলে যেন মৃতধরা
সূচীভেদ্য অন্ধকার,   সাগরের নাহি পার,
উত্তাল তরঙ্গে ভাসে ফেনরূপী তারা।

অঘোরে ঘুমায় শ্রান্ত, কর্ম্মী, ভোগী,
জাগ্রত স্বপন দেখিতেছে যোগী,
মহাপ্রলয়ের মূর্ত্তি.   হৃদয়ে পাইল স্ফূর্ত্তি,
শ্মশান আসনে বসি অটল বিরাগী।

উছলিল সমুদ্র মহান্,
জলে জলে ধরা ভাসমান;
গ্রহতারা লক্ষ লক্ষ,   রবিশশী চ্যুতকক্ষ,
দেবতা মানব সঙ্ঘ ভয়ে হতজ্ঞান।

ভেঙ্গে পড়ে দিক্, দেশ, কাল,
অন্ধকারগরভে বিশাল;
জল বায়ু বহ্নিব্যোম—   একাকার,—মহাস্তোম,
"হতোহস্মি" অর্ব্বুদকণ্ঠে উঠিছে ভয়াল।

জীব জন্তু দেবতা মানব,
নিমিষেতে পুতিগন্ধ শব।
তেয়াগী মার্কণ্ডমুনি,   নাহি মরে মহাজ্ঞানী,
নাশিতে তাঁহার প্রলয়ের পরাভব।

তেয়াগী গেয়ানী নাহি মরে,
তাঁরে দেখি প্রলয় শিহরে;
বটপত্রে ভাসমান্   বলে প্রভু ভগবান্
"আমি তুমি অভিন্ন জানিও অতঃপরে"।

চমকি বিরাগী উঠিল সে ভাসে,
প্রলয়ের ছবি কোথা গেল ভেসে;
যে শ্মশান সে শ্মশান, দুড় দুড় করে প্রাণ
ভাঙ্গে স্বপ্ন—দেখা দিল আলো পূর্ব্বাকাশে।

তর্কবুদ্ধি।

সুবর্ণগ্রামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিতের বাস। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য জ্যোতিষ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত, উপনিষদাদি তাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত। সকলে বলিত, ইনি নিশ্চয়ই সরস্বতীর বরপুত্র। তাহা না হইলে—এত বিদ্যা একজনের কিরূপে আয়ত্ত হইতে পারে? পণ্ডিত-মহাশয় সাধকও ছিলেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া পরে কোন তান্ত্রিক গুরুর নিকট গোপনে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তান্ত্রিকা-ভিমানী স্বেচ্ছাচারিগণের ন্যায় ছিলেন না। তিনি তন্ত্রোক্ত নিয়মে প্রত্যহ গভীর রাত্রে স্বীয় ইষ্ট দেবতার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেন। স্বহস্তে পুষ্পচয়ন, স্বহস্তে ভোগ প্রস্তুত প্রভৃতি পূজার আয়োজন সব নিজে করিতেন। শেষে আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, নানাপ্রকার ন্যাস প্রভৃতি নানা অঙ্গসংকারে পূজা করিয়া শেষে প্রসাদ পাইতেন। দিবাভাগে শাস্ত্রালাপন, রাত্রে এইরূপ পূজার্চ্চনা। ব্রাহ্মণের নিদ্রা অতি অল্প ছিল।

এই সকল নানাগুণ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের এক দোষ ছিল। তিনি তর্কে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বপক্ষকে পরাস্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। যিনি যে কোনরূপ পূর্ব্বপক্ষ করুন না কেন, তিনি তাহাতে দোষ দর্শাইয়া বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। তাঁহার মেধার নিকট গ্রামের সকল পণ্ডিত পরাজয় মানিল।

একদিন পণ্ডিত মহাশয় বিষণ্ণমনে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছেন! বুঝি, ইহাঁর সংসারে থাকিতে আর রুচি নাই। ভাবিতেছেন, 'কই, কেহই ত আমায় কিছুই বুঝাইতে পারিল না। তবে এ সব ভূতের ব্যাগার কি বহিতেছি? সমুদয়ই কি মিথ্যা? শাস্ত্রের ত কোন মীমাংসাই করিতে পারিলাম না। ক্রিয়াই বা করা কেন? এও বোধ হয় পণ্ডশ্রম।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চিত্তের বেগ এতদূর প্রবল হইল যে, তিনি একবস্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

ঐ যে গৈরিকবসনধারী দীর্ঘকায় প্রতিভাপ্রমুখ, ওই সন্ন্যাসী কে?

সন্ন্যাসীর মুখ যেন চিন্তাপূর্ণ বোধ হইতেছে। সন্ন্যাসী আজ কাশীরাজের দ্বারে অতিথি। ইনি কুমারিকা হইতে হিমালয় ও আসাম হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়াছেন—সকল পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকেই তর্কে পরাস্ত করিয়াছেন। শুনিয়াছেন, কাশীরাজের গুরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। তাঁহার নিকট সন্দেহ ভঞ্জন হইবে আশা করিয়া তিনি এই দ্বারে অতিথি। আর তাঁহার তর্কে বড় রুচি নাই, এখন একটু শিখিতে ইচ্ছা—প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।

কাশীরাজগুরু বলিলেন, 'আপনি যদি আমার নিকট কিছু শিখিতে ইচ্ছা করেন, তবে অন্ততঃ সাত দিন আমার নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না; ইহাতে স্বীকৃত হইলে তবে আপনাকে শিখাইতে পারি।' তত্ত্বপিপাসায় ইনি এখন ব্যাকুল, কাযেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ভুলিয়া পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিবার প্রয়াস পান আর গুরু-দেব অমনি সংশোধন করিয়া দেন।

গুরু নূতন কিছুই বলিলেন না। জগতে নূতন কিছু আছে কি? তিন দিন অতীত হইলে শিষ্য গুরুচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, আমি জ্ঞান-লাভ করিয়াছি। আমার দোষ বুঝিয়াছি। আপনার কৃপায় আমার চৈতন্য হইল—আপনাকে প্রণাম।'

কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন বা বিবিদিষানন্দ স্বামী হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন।

ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ।

প্রজাপতি বলিতেন, নিষ্পাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্য-কাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন।' দেবাসুর উভয়েরই এই বাক্য শুনিয়া আত্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছা হইল। দেবতারা ইন্দ্রকে এবং অসুরেরা বিরোচনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি করিয়া আত্মবিদ্যাশিক্ষার্থ প্রজাপতির নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট গিয়া বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিলেন। বত্রিশ বর্ষ পরে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা যখন তাঁহাদের আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছা নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই চক্ষে যে পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তিনিই

আত্মা ; ইনিই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে প্রজাপতিবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, তিনি ছায়াকেই আত্ম' বলিতেছেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা বলিলেন, জলে যে ছায়া দেখা যায়, তাহাই আত্মা, না, আরসীতে যাহা দেখা যায়, তাহাই আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন, তিনি এই সমুদায়েই আছেন। এক সরা জল লইয়া তাহাতে আত্মাকে দেখ। যদি তখনও না জানিতে পার, তবে আমায় বলিও। তাঁহারা তাহা দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন, লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত তাহার অবিকল প্রতিরূপ দেখিতেছি। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া জলে দেখিতে বলিলেন, তাঁহারাও দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন সজ্জিত হইয়াছি, ঠিক সেইরূপ জলে আপনাদিগকে দেখিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, ইনিই অমৃত ও অভয়স্বরূপ ; ইনিই ব্রহ্ম। তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন, হায়, দেবাসুর উভয়েই আত্মজ্ঞান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিরোচন ত অসুরদের নিকট যাইয়াই তাহাদিগকে বলিল, প্রজাপতির উপদেশ, এই দেহই আত্মা। অসুরেরা সেই উপদেশ গ্রহণ করাতে অসুর-সম্প্রদায় এখনও দানরহিত, শ্রদ্ধাশূন্য, ভোগনিষ্ঠ ও দৈহিকপরায়ণ।

ইন্দ্র ও দেবগণের নিকট ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল যে, এই দেহ যখন সুন্দর বসন ভূষণে শোভিত হইলে তাহার ছায়াও তদ্রূপ হয়, সেইরূপ কোন অঙ্গহীন হইলে ইহার ছায়াও ত অঙ্গহীন হইবে—অতএব এই ছায়া কখন আত্মা হইতে পারে না। এই মনে করিয়া গুরুর নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গুরু আর বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া যে পুরুষ স্বপ্নে নানাবিধ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা, এই উপদেশ দিলেন। ইহাতে ইন্দ্র প্রথমতঃ তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার সন্দিগ্ধ হইয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন, স্বপ্নাবস্থায় মন দেহের ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন বটে, কিন্তু নানাপ্রকার দুঃখে মনের শোক ও চাঞ্চল্য ঘটে। গুরু তাঁহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া স্বপ্নশূন্য সুষুপ্তিই আত্মার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন, সুষুপ্তাবস্থায় 'আমি' জ্ঞানই যখন থাকে না, তখন উহাকে কি করিয়া অমৃতস্বরূপ আত্মা বলা যায়? তখন প্রজাপতি তাঁহাকে আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া আত্মার স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

হয় না," তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, কোনও বিধি যদি (স্বভাবতঃ বা প্রকারান্তরে) সিদ্ধই থাকে, এবং তখন যদি কোনও বিধির আরম্ভ করা যায়, তবে তাহা জ্ঞাপনের জন্য হইয়া থাকে, কিন্তু 'জন' ধাতুর 'ন'কারের গুণ করিলেও (উপসরজ) পদ সিদ্ধ হয় না। কারণ 'জন' ধাতুর 'ন'কারের গুণ করিলে, 'ন'কারের স্থানে, কেবল মাত্র গুণসংজ্ঞক 'অ'কারই হইবে, আর 'একার' অথবা 'ওকার' হইবে না।

অৰ্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনের (জন ধাতুর নকার প্রভৃতির) গুণসংজ্ঞক কোনও বর্ণ হইলে, তাহার সদৃশতমতা প্রযুক্ত একমাত্রাবিশিষ্ট একারই হইবে, (১) দুইমাত্রাবিশিষ্ট একার বা ওকার (সদৃশতম নহে বলিয়া) হইবে না।

এরূপ হইলেও (নকারের স্থানে সদৃশতম অকার হইলেও) অধিক সদৃশতম অনুনাসিক (অকার) বর্ণ প্রাপ্ত হইবে?

তাহা হইলেও অনুনাসিক বর্ণের পর সবর্ণ (২) হইয়া প্রয়োগ শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ 'জন' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় না করিয়া 'অ' প্রত্যয় করিলেও, নকারের গুণে অনুনাসিক 'অঁ'কার হইলে, তাহার পররূপ 'অ' প্রত্যয়ের 'অ'কার হইয়া, 'উপসরজ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—গমেরপ্যয়ং ডো বক্তব্যঃ। গমেশ্চ গুণ উচ্যমান ওকারঃ প্রাপ্নোতি। তস্মাদিগ্‌গ্রহণং কর্ত্তব্যম্।

যদাগ্‌গ্রহণং ক্রিয়তে। গ্নোঃ পন্থাঃ স ইয়মিতি এতেহপীকঃ প্রাপ্নুবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ড' প্রত্যয় ব্যর্থ নহে। কারণ, 'গম' ধাতুর জন্য (মকার ইৎএর জন্য) ও 'ড' প্রত্যয় বক্তব্য। নতুবা, 'গম' ধাতুর গুণ হয়, এইরূপ বলিলে, 'ম'কারের গুণ হইয়া 'ও'কার প্রাপ্তি হইবে। (৩) অতএবই 'ইক্' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—'জন ধাতুর 'ন'কারের স্থানপ্রযুক্ত সদৃশ 'গুণ সংজ্ঞক (অ, এ, বা ওকারের মধ্যে) কোনও বর্ণ নাই বলিয়া অপেক্ষাকৃত মাত্রাসাদৃশ্যপ্রযুক্ত, একার ওকার না হইয়া, অকারই হইতে পারে। কিন্তু মকারের ত স্থানপ্রযুক্ত

(১) স্থানেঽন্তরতমঃ ১।১।৫০। বহুবর্ণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সদৃশতম যে বর্ণ, তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

(২) অতো গুণে ৬।১।৯৭। পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণসংজ্ঞক বর্ণ থাকিলে পররূপ এক আদেশ হয়।

(৩) মকারের ওষ্ঠ স্থান; অতএব ওষ্ঠস্থানবিশিষ্ট ওকারই হইবে।

সাদৃশ্য, 'ও'কারেতেই রহিয়াছে ; অতএব, অনেক প্রকারের সাদৃশ্যের মধ্যে, স্থানপ্রযুক্ত সাদৃশ্যই বলবান্ হয় বলিয়া, অকার না হইয়া 'ও'কারই হইবে (১)। অতএব, যেহেতু 'ড'প্রত্যয় ব্যর্থ নহে, (চরিতার্থের অবকাশ আছে বলিয়া) সেই হেতুই 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে 'ইক্' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যদি 'ইক্' গ্রহণ করা যায়, তবেও দোষ হইবে। কারণ, দ্যৌঃ (২), পন্থাঃ (৩), সঃ (৪), ইমম্ (৫) ইত্যাদি স্থলেও 'ইক্' প্রত্যাহারের প্রাপ্তি হইবে ?

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞয়া বিধানে নিয়মঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা দ্বারা গুণ বা বৃদ্ধি বিধান করিলেই এই নিয়ম ('ইক্'এর উপস্থিতি) হইয়া থাকে।*

ভাষ্যমূল।—সংজ্ঞয়া যে বিধীয়ন্তে তেষু নিয়মঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। গুণবৃদ্ধিগ্রহণসামর্থ্যাৎ। কথং পুনরন্তরেণ গুণ-বৃদ্ধিগ্রহণমিকো গুণবৃদ্ধী স্যাতাম্। প্রকৃতং গুণবৃদ্ধিগ্রহণমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণ ইতি। যদি তদনুবর্ত্ততে। অদেঙ্ গুণবৃদ্ধিশ্চেত্যদেঙাং বৃদ্ধি-সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। সংবন্ধমনুবর্ত্তিষ্যতে। বৃদ্ধিরাদৈচ্। অদেঙ্ গুণঃ। বৃদ্ধিগা-

(১) যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ।

(২) দিব ঔৎ।৭।১।৮৪। ('দিব্' এই প্রাতিপদিকের উত্তর 'ঔ' হয়, 'সু'বিভক্তি পরে থাকিলে।) এখানে বৃদ্ধিসংজ্ঞক ঔকার, 'দিব্'এর 'ই'কার স্থানে প্রাপ্তি হইবে ; কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য 'ব'কার স্থানে প্রাপ্তি হইবে না।

(৩) পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ।৭।১।৮৫। পথিন্ মথিন্ ঋভুক্ষিন্ শব্দের 'আ'-কারান্ত আদেশ হয়, 'সু'বিভক্তি পরে থাকিলে। এই স্থলে, বৃদ্ধি আদেশ 'ইক্'-এর হয় বলিয়া, আকাররূপ বৃদ্ধি আদেশ ও পথিন্ শব্দের ইকারেরই প্রাপ্ত হইবে। অন্তের হইবে না।

(৪) ত্যদাদীনামঃ।৭।২।১০২। (ত্যদ্ প্রভৃতি অর্থাৎ ত্যদ্ শব্দ আদিতে, যে গণপঠিত শব্দের, তাহাদের অকারান্ত আদেশ হয়।) এই সূত্রে ইক্এর গ্রহণ প্রাপ্তি হইলে, তদ্ শব্দের মধ্যে ইক্এর অভাব হেতু, (গুণরূপ) অকারান্ত আদেশও হইবে না, 'সঃ' এইরূপ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

(৫) এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে, ত্যদাদিগণ পঠিত 'ইদম্' শব্দেরও অকারান্ত আদেশ না হইয়া, গুণসংজ্ঞক 'অ'কার আদেশ, ইদম্ শব্দের ইকারের হইবে ; সুতরাং 'ইমম্' এরূপ বিশুদ্ধ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

দৈচ্। তত ইকো গুণবৃদ্ধী ইতি। গুণবৃদ্ধিগ্রহণমনুবর্ত্ততে। অদেঙাদৈজ্‌গ্রহণং নিবৃত্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞাদ্বারা অর্থাৎ গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞাদ্বারা বিহিত যে আদেশ, তাহাতেই নিয়ম করা হইয়াছে। বিশেষার্থ, গুণশব্দ উচ্চারণ করিয়া যেখানে গুণ কার্য্য করা হইবে অথবা বৃদ্ধি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেখানে বৃদ্ধি কার্য্য করা হইবে, সেখানেই এই নিয়ম করা হইবে যে, গুণ এবং বৃদ্ধি কার্য্য 'ইক্'এর স্থানেই হয়। তাহা হইলে, 'দিব ঔৎ' সূত্রের ঔকারও, বৃদ্ধি শব্দের উচ্চারণ না করিয়া, ঔকার মাত্র উল্লেখ করাতেই, 'দ্যৌঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ইহা কি আবার বলিতে হইবে? অর্থাৎ 'গুণ' 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা দ্বারা বিধান করিলেই যে নিয়ম প্রাপ্তি হইবে, তাহার জন্যও কি আবার একটা সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার প্রয়োজন হইবে?

নিশ্চয়ই না।

না বলিলে, কিরূপে জানা যাইবে?

('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে) গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ বলেই জানা যাইবে যে, ইকেরই হয়।

যদি এইরূপই হয়, তবে গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ ভিন্নই কিরূপে 'ইক্'-এর যে গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তাহা বোধ হইবে?

এই প্রকরণে যে, গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অনুবৃত্তি হইবে। তাহা হইলেই গুণ এবং বৃদ্ধি যে ইক্‌এরই হয়, তাহাও বোধ হইবে।

কোথায় প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে?

'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ, এবং 'অদেঙ্‌গুণঃ' সূত্রে গুণ শব্দ, উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সূত্রদ্বয় হইতে 'বৃদ্ধি' ও 'গুণ' শব্দের অনুবৃত্তি আনিয়া কার্য্যসিদ্ধ করা হইবে।

যদি তাহাদের অনুবৃত্তি করা যায়, তবে এই দোষ হইবে যে,—'অদেঙ্‌গুণঃ' সূত্রেও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র হইতে, 'বৃদ্ধি' শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া, 'অদেঙ্' এর (অকার, একার, ওকারের) ও বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ, সম্বন্ধ অর্থাৎ কেবল 'বৃদ্ধি' শব্দের অনুবৃত্তি না করিয়া একত্র মিলিত যে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ('বৃদ্ধি' শব্দ এবং 'আদৈচ্' শব্দ একত্র মিলিত) সূত্রের অনুবৃত্তি করা হইবে। তাহা হইলেই, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'অদেঙ্-

গুণঃ' এইরূপ সূত্র হইবে। সুতরাং 'বৃদ্ধি' হইলে 'আদৈচ্' (আ, ঐ, ঔ)এরই হইবে; অদেঙ্ (অ, এ, ও) এর হইবে না। পূর্ব্বসূত্রে এইরূপ অর্থ হইবার পর, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' এইরূপ সূত্র করা হইবে। আর এই সূত্রে, পূর্ব্ব সূত্রদ্বয়ের মধ্যে যে, 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদেরই অনুবৃত্তি হইবে, কিন্তু 'অদেঙ্' এবং 'আদৈচ্'এর যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের নিবৃত্তি করা হইবে। তাহা হইলেই সর্ব্বত্র 'ইক্'এর গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।— অথবা মণ্ডূকগতয়োঽধিকারাঃ। যথা মণ্ডূকা উৎপ্লুত্য উৎপ্লুত্য গচ্ছন্তি তদ্বদধিকারাঃ।

অথবা একযোগঃ করিষ্যতে। বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্‌গুণঃ। ততইকো গুণবৃদ্ধী ইতি। ন চৈকযোগেঽনুবৃত্তির্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা অধিকার (অনুবৃত্তি) সমূহ মণ্ডূকের (ভেকের) গতির ন্যায়ও হইয়া থাকে; এইরূপ জানিতে হইবে। যেমন মণ্ডূকগণ লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, সেইরূপ অধিকারসমূহও হইয়া থাকে। সুতরাং 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রেও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র হইতে 'বৃদ্ধি' শব্দ এক লাফে 'অদেঙ্-গুণঃ' সূত্র অতিক্রম করিয়া গিয়া পড়িবে। তাহা হইলেই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে।

অথবা তিন সূত্রই একত্র সংযোগ করা হইবে। অর্থাৎ 'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্‌গুণঃ' এবং তৎপরে 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র, এই তিন সূত্র একত্র সংযোগ করা হইবে।

অতএব একত্র সংযোগ হওয়াতে অনুবৃত্তিও হইবে না। এইরূপে কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবাঽন্যবচনাচ্চকারাকরণাচ্চ প্রকৃতাপবাদো বিজ্ঞায়তে যথোৎসর্গেণ প্রসক্তস্যাপবাদো বাধকো ভবতি। অন্যস্যাঃ সংজ্ঞায়া বচনাচ্চকারস্য চানুকর্ষণার্থস্যাকরণাৎ প্রকৃতায়া বৃদ্ধিসংজ্ঞায়া গুণসংজ্ঞা বাধিকা ভবিষ্যতি। যথোৎসর্গেণ প্রসক্তস্যাপবাদো বাধকো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সূত্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্‌ই করিব; কিন্তু 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা করিয়া পুনঃ 'গুণ'রূপ অন্য বচন করাতে এবং গুণ শব্দের পরে 'চ'কার না করাতেই জানা যাইতেছে যে, ইহা (গুণ শব্দ), প্রকরণাগত বৃদ্ধি শব্দের অপবাদক। যেমন,—উৎসর্গ (সাধারণ) সূত্র দ্বারা কোনও বিধির প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে, অপবাদ (বিশেষ) সূত্র, তাহার বাধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্যসংজ্ঞাবোধক (অদেঙ্‌গুণঃ) বচন আরম্ভ করাতে এবং অনুবৃত্তির অর্থ-

প্রকাশক চকার 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের পরে) না করাতেই প্রকরণাগত বৃদ্ধি সংজ্ঞার বাধিকা, গুণসংজ্ঞা হইবে। যেমন,—সাধারণতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত উৎসর্গ সূত্রের প্রসঙ্গাগত বিধি, অপবাদক বিশেষ সূত্র বাধক হইয়া থাকে। এই স্থলে, যদিও 'বৃদ্ধি সূত্র, সাধারণতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, তথাপি 'অদেঙ্-গুণঃ' বিশেষ সূত্র করাতে, এবং এই পর সূত্রান্তে 'চ'কার না করাতে, পূর্ব্ব সূত্রকে বাধ করিয়া, অ, এ, ওরই গুণসংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবা বক্ষ্যত্যেতৎ। অনুবর্ত্তন্তে চ নাম বিধয়ো ন চানুবর্ত্তনা-দেব ভবন্তি। কিং তর্হি। যত্নাদ্ভবন্তীতি। অথবা উভয়ং নিবৃত্তং তদপেক্ষিষ্যামহে।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা এইরূপই বলা হইবে অর্থাৎ যেরূপ সূত্র আছে,সেরূপই বলা হইবে। তাহা হইলে, বিধিসমূহেরও অনুবৃত্তি হইবে, কিন্তু কেবল অনুবৃত্তি দ্বারাই কার্য্য হইবে না।

তবে কি?

যত্নবিশেষের দ্বারা হইবে। অর্থাৎ সূত্রের মধ্যে এমন কোনও চেষ্টা বিশেষ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রে, সেরূপ কোনও চেষ্টা না দেখিতে পাওয়াতে, বৃদ্ধিকার্য্যও হইবে না।

অথবা 'বৃদ্ধি' এবং 'গুণ' উভয়ের অনুবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া, তন্নিবন্ধন মনোগত ভাবের, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, অপেক্ষা করিব। তাহা হইলেই কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনরয়মলোন্ত্যশেষঃ। আহোস্বিদলোঽন্ত্যাপবাদঃ। কথঞ্চায়ং তচ্ছেষঃ স্যাৎ কথং বা তদপবাদঃ। যত্রৈকং বাক্যং তচ্ছেদং চ। অলোন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তি। ইকো গুণবৃদ্ধী অলোন্ত্যস্যেতি। ততোঽয়ং তচ্ছেষঃ। অথ নানাবাক্যম্। অলোঽন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তি। ইকোগুণবৃদ্ধী অন্ত্যস্য চানন্ত্যস্য চেতি। ততোঽয়ং তদপবাদঃ।

কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে যে, 'ইক্'-এর গুণ এবং বৃদ্ধি বিধান করা হইয়াছে, তাহা কি 'অলোন্ত্যস্য'(১) সূত্রের সহিত মিলিত হইয়া, অন্ত্যবর্ণ যদি 'ইক্' হয়, তাহারই গুণ এবং বৃদ্ধি হইবে? না, 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের অপবাদক হইবে?

---

(১) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে আদেশ, তাহা, তাহার অন্ত্যবর্ণ স্থানে হয়।

তচ্ছেষ পক্ষ (অর্থাৎ অন্ত্য ইক্‌এর স্থানে গুণবৃদ্ধি) অবলম্বন করিলেই বা কিরূপ হইবে, আর তদপবাদ পক্ষ (আদি, অন্ত্য কিংবা মধ্য, যে কোন স্থানে 'ইক্' থাকিলেই হইল) অবলম্বন করিলেই বা কিরূপ হইবে ?

যদি তাহা (অলোঽন্ত্যস্য) এবং ইহা (ইকোগুণবৃদ্ধী), এক বাক্য করা যায়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে যে, যাবতীয় বিধি অন্ত্যবর্ণেরই হয়, সুতরাং 'ইক্'এর গুণ বা বৃদ্ধি হইতেও অন্ত্যবর্ণেরই হইবে। অতএব এইটী 'তচ্ছেষ-পক্ষ' হইল।

আর যদি নানা বাক্য হয়, অর্থাৎ উভয় সূত্র ভিন্ন ভিন্ন বাক্যবিশিষ্ট হয় ; তবে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আদেশ, অন্ত্যবর্ণের স্থানে হইবে। আর ইক্‌এর স্থানে গুণ এবং বৃদ্ধি আদেশ, অন্ত্যেরও হইবে, অনন্ত্য অর্থাৎ আদি মধ্যেরও হইবে। সেই হেতু এইটী 'তদপবাদ'পক্ষ হইবে।

পক্ষদ্বয়ে বিশেষ (প্রভেদ) কি ?

বার্ত্তিকমূল।—বৃদ্ধিগুণাবলোঽন্ত্যস্যেতি চেন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বল যে, বৃদ্ধি এবং গুণাদেশ অন্ত্যবর্ণেরই হয়, তবে মৃদি, মৃজি, পুগন্ত, লঘু উপধাবিশিষ্ট ঋচ্ছ্ এবং দৃশ্ এই সকল ধাতু, আর ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দে, 'ইক্'প্রত্যাহারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। *।

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধিগুণাবলোঽন্ত্যস্যেতি চেন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। মিদেগু্র্ণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। পুগন্তলঘূপধস্য গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ঋচ্ছেলিটি গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ঋদৃশোঙি গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রয়োর্গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বৃদ্ধি এবং গুণ আদেশ অন্ত্য ইক্‌বিশিষ্ট বর্ণেরই হয়, তবে যে সকল শব্দের অন্তে ইক্ নাই, যেমন ;—মিদি ধাতু, মৃজ ধাতু, পুক্ অন্ত এবং লঘু উপধাবিশিষ্ট ধাতু, ঋচ্ছ ধাতু, দৃশি ধাতু, ক্ষিপ্র শব্দ এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দের, পূর্ব্ব-ইক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ সমূহের, গুণ বা বৃদ্ধি হওয়ার জন্য, 'ইকঃ' অর্থাৎ ইক্‌এর স্থানে গুণ বা বৃদ্ধি হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক দৃষ্টান্তের স্থল দেখান যাইতেছে, মিদেগু্র্ণঃ।৭।৩।৮২। (মিদ্ ধাতুর ইক্‌এর গুণ হয়, ইৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট শকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে,

'মেদতে') এই স্থলে, যাহাতে পূর্ব্ব ইক্‌এরও গুণ প্রাপ্তি হয়, এজন্য 'ইকঃ' (ইক্‌এর স্থানে হয়) এইরূপ বলা উচিত। কারণ, অন্যথা মিদ্ ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ইক্ না হওয়াতে, গুণপ্রাপ্তি হইবে না।

মৃজের্বৃদ্ধিঃ।৬।২।১১৪। (মৃজ্ ধাতুর ইক্‌এর বৃদ্ধি হয়, ধাতুপ্রত্যয় পরে থাকিলে, 'মার্ষ্টি') এই স্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। কারণ, অন্যথা 'মৃজ্' ধাতুর অন্তে, ইক্ না থাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না।

পুগন্ত লঘূপধস্য চ।৭।৩।৮৬। (পুক্ আছে অন্তে যার, এমন যে ধাতু, আর লঘু উপধাবিশিষ্ট যে ধাতু, তাহার অঙ্গস্থিত ইক্ প্রত্যাহারের গুণ হয়, সার্ব্বধাতুক এবং আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, 'বিভেদ') এই স্থানে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা, যেহেতু লঘু উপধাবিশিষ্ট ধাতুর অন্তে কখনও 'ইক্' থাকিতে পারে না, সেইহেতু গুণও প্রাপ্তি হইবে না।

ঋচ্ছত্যৃতাম্ ৭।৪।১১। (তুদাদিগণীয় ঋচ্ছ ধাতু, ঋ ধাতু এবং ঋৎধাতুর গুণ হয়, লিট্ বিষয়ক প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'আনর্চ্ছ') এইসূত্রানুসারে, 'ঋচ্ছ'ধাতুর লিট্ এ, গুণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা 'ঋচ্ছ'ধাতুর অন্তে ইক্ নাই বলিয়া গুণও প্রাপ্তি হইবে না।

ঋদৃশোঽঙি গুণঃ।৭।৪।১৬। (ঋবর্ণান্ত ধাতু এবং দৃশ ধাতুর গুণ হয়, অঙ্ পরে থাকিলে, 'অদর্শৎ') এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা 'দৃশ'ধাতুর অন্তে ইক্ না থাকাতে, গুণ হইবে না।

স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ।৬।৪।১৫৬। (এই সকল শব্দের যণাদি পরক কার্য্যের লোপ হয়, আর পূর্ব্বের গুণ হয়, ইষ্ঠন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এইসূত্রানুসারে, ক্ষিপ্র এবং ক্ষুদ্র শব্দের গুণ হইয়া থাকে। এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা, 'ক্ষিপ্র'ও 'ক্ষুদ্র'শব্দের অন্তে 'ইক্' না থাকাতে, গুণ প্রাপ্ত হইবে না।

'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে, তচ্ছেষ পক্ষ অর্থাৎ অন্ত্য ইকের গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রসমূহে ইকঃ' (পূর্ব্ব ইকের স্থানে আদেশ হইবার জন্য) এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদ, পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গশ্চানিগন্তস্য। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অন্ত্য ইকেরই গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তবে সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গও 'ইক্' অন্ত্য ভিন্ন অন্য বর্ণের হইবে।

ভাষ্যমূল।—সর্ব্বাদেশশ্চ গুণোঽনিগন্তস্য প্রাপ্নোতি। যাতা। বাতা। কিং কারণম্। অলোঽন্ত্যস্যেতি ষষ্ঠী চৈব হ্যন্ত্যমিকমুপসংক্রান্তা। অঙ্গস্যেতি চ স্থানষষ্ঠী। তদ্‌যদিদানীমনিগন্তমঙ্গং তস্য গুণঃ সর্ব্বাদেশঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। যথৈব হ্যলোঽন্ত্যস্যেতি ষষ্ঠী অন্ত্যমিকমুপসংক্রান্তা এবমঙ্গস্যেত্যপি স্থানষষ্ঠী। তদ্‌যদিদানীমনিগন্তমঙ্গং তত্র ষষ্ঠ্যেব নাস্তি কুতো গুণঃ কুতঃ সর্ব্বাদেশঃ। এবং তর্হি নায়ং দোষসমুচ্চয়ঃ। কিং তর্হি পূর্ব্বাপেক্ষোঽয়ং দোষঃ। হ্যর্থে চায়ং চঃ পঠিতঃ। মিদিমৃজপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্রক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণং সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গো হ্যনিগন্তস্যেতি। মিদেগুর্ণঃ ইক ইতি বচনাদন্ত্যস্য ন। অলোঽন্ত্যস্যেতি বচনাদিকো ন। উচ্যতে চ গুণঃ স সর্ব্বাদেশঃ প্রাপ্নোতি। এবং সর্ব্বত্র।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ইক্‌এর সহিত অন্ত্যবর্ণেরই সম্বন্ধ হয়, তবে যেখানে, ষষ্ঠী আছে, কিন্তু ইক্ নাই, সেখানে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' (অনেক বর্ণ বা শকার ইৎ বিশিষ্ট আদেশ হইলে, তাহা সমুদায় বর্ণের স্থানে হয়) এই সূত্রানুসারে, সর্ব্বাদেশ গুণও অনিগন্তেরই প্রাপ্তি হইবে। যেমন,—'যাতা' 'বাতা', এই স্থলে, আর্দ্ধধাতুক 'যা' ধাতুর এবং 'বা' ধাতুর সমুদায় অঙ্গের গুণ হইবে।

ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এই যে, 'অলোঽন্ত্যস্য' [illegible] ষষ্ঠী ও অন্ত্য ইক্‌কেই উপসংক্রমণ (অধিকার) করিয়াছে। আর এ দিকে 'অঙ্গস্য' ।৬।৪।১। এই অধিকারবাচক ষষ্ঠীও স্থানবোধিকা। সুতরাং যে স্থলের অন্ত্যবর্ণ ইক্ নহে, সেখানে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রও প্রাপ্তি হইবে না। 'অঙ্গস্য' এই ষষ্ঠীর স্থানে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হওয়া চাই, সুতরাং এই যে, ইগন্ত ভিন্ন অঙ্গ (যা, বা), ইদানীং তাহার সমুদায় অঙ্গের, অবাধে গুণাদেশ প্রাপ্তি হইবে। 'অলোঽন্ত্যস্য সূত্র,' 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' সূত্রের বাধক হইবে না, যে হেতু তাহা অন্ত্য 'ইক্' কে বিধান করিয়া থাকে।

এই দোষ এখানে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, যেমন নাকি 'অলোঽন্ত্যস্য' এই ষষ্ঠী, অন্ত্য ইক্‌এর সহিত উপসংক্রামিত হইয়াছে (মিলিত হইয়াছে), সেইরূপ 'অঙ্গস্য', এই স্থানবোধিকা ষষ্ঠীর সহিতও মিলিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি, 'ইক্' অন্তে না আছে, এমন অঙ্গের গুণ আদেশ হয়; তবে, যখন সেখানে ষষ্ঠীই নাই, তখন গুণই বা কোথা হইতে হইবে, আর সর্ব্বাদেশই বা কোথা হইতে হইবে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে।]

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালী পূজার পরদিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজি ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ সাল। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা চারিটা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার গাড়ি আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে বেষ্টিতে লাগিলেন। প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। তাহারই সম্মুখে দালান। সেই দালানে পরমহংসদেব উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালা ও (Sub-Judge) আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও নানাবর্ণের পতাকা, মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে মনোরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লবরাশি। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন—যে ধ্বনি আর্য্য-ঋষিদের মুখ হইতে [illegible] বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার সর্ব্বত্যাগী [illegible], ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভগবানের অবতার প্রেমবিহ্বল Jesusএর মুখ হইতে তাঁহার [illegible] সেই নিরক্ষর [illegible] শুনিয়াছিলেন—যে ধ্বনি

পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে মেঘগম্ভীরধ্বনিমধ্যে বিনয়নম্র, ব্যাকুলতাপূর্ণ, 'গুড়াকেশ কৌন্তেয়' শিষ্যের ভাবে সমরক্ষেত্রে সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু প্রমুখাৎ এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন।—

"যদক্ষরং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।
কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দররচিত বেদীপানে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইতেছে। আদালত দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইল।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, হ্যাঁ গা ঐ গানটী তোমাদের বেশ, 'দে মা পাগল করে,' ঐটী গাও না। তিনি গাইলেন ;—

"আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেমসাগরে ;
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,

কেহ নাচে আনন্দভরে;
ঈশা মুসা, শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে —
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।”

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—‘উপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, তাজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে’। কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান্ পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্য্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যানে নিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেরই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[হরিকথাপ্রসঙ্গে।]

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্ব্বের ঠিক সহজাবস্থা।

[“আমি সিদ্ধি খাব”]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) মা! আমি কারণানন্দ চাই না। আমি সিদ্ধি খাব।

[গীতা ও অষ্টসিদ্ধি]

“সিদ্ধি কি না বস্তু লাভ। অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, ‘ভাই, যদি দেখ যে

অষ্টসিদ্ধির একটী সিদ্ধি কারও আছে, তা'হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না'। কেন মা; সিদ্ধাই থাকলেই অহংকার থাকবে, আর অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

[ঈশ্বর লাভ কি ?]

"আর এক আছে, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক্। সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। যে ব্যক্তি সাধক, সে আরো এগিয়ে গেছে। লোক-দেখান ভাব কমে গিয়েছে। ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম ক'রে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েছে যে, ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'র্‌ছেন, যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'রেছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। শুধু দর্শন নয়, কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে।

'কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস এক রকম, আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি আর তৃপ্তিলাভ করা আর এক এক জিনিস।

'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকারবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) "একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'র্‌বে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'র্‌বে।

"মিছরীর রুটী সিদে ক'রে খাও আর আড় ক'রে খাও, মিষ্ট লাগ্‌বে। (সকলের হাস্য)।

[বিষয়ীর ঈশ্বর, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ।]

কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা কর্‌বার সময় পরস্পর বলে, আমার ঈশ্বরের দিব্য। আর যেমন কোন ফিট্ বাবু পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক (stick) ক'রে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে

একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, 'ঈশ্বর কি Beautiful ফুল ক'রেচেন।' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

"তাই বল্‌ছি, একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। ডুব দাও, ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতরে রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

গীত।

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।]

(ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক সব ক'রেছ', ঐ সব কথা আমাদের কায কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক্! কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক জন? বাবুকে খোঁজে দুই একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক'চ্চি। সত্যি বল্‌ছি। এ কথা কারেইবা বল্‌ছি, কেবা বিশ্বাস করে!

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law or Revelation)?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সব সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে কিন্তু তাঁকে পাবে না।

"শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো। কৃপা হলে তাঁকে দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য; ঈশ্বরের 'বৈষম্য-দোষ'।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশী আর এক জনের উপর কম? তা'হলে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেকি! ঘোড়াটাও টা, আর সরাটাও টা! তুমি যা ব'ল্‌ছো, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। ব'লেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন কারুকে কম দিয়েছেন? আমি বল্লাম, তিনি বিভুরূপে সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরও যেমনি, পিঁপ্‌ড়েটীর ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসে'ছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখ্‌তে এসেছি। তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার অত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে, সে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পালায়।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয়, তা'হলে কেশব সেনকে লোকে এত মান্‌তো কেন?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক বা Lecture দেওয়ার জন্যই হউক বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চয় জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)। মহাশয়, ইনি যা বল্‌চেন মেনে নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি)। তুমি কি রকম লোক! কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া যে কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখ্‌ছি!

ব্রাহ্মভক্তটী অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার; সংসার-ত্যাগ।)

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ কর্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন কর্‌তে হবে? সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জ্জনে থাক্‌তে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা কর্‌তে হয়। এমন একটী বাড়ীর কাছে আড্ডা কর্‌তে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনকরাজা অমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর, তবে তো জনক রাজা হবে। অমুক খুব তর্‌তর্ করে ইংরাজি লিখতে পারে, তা কি একেবারেই লিখ্‌তে পেরেছিল? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটো দুটো খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর্‌তর্ করে লিখ্‌তে পারে।

"কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সার্‌বে কেমন করে? রোগটী হয়েছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন ক'রে? আচার তেঁতুল—এই দেখো, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাক্‌লে কি হয়, সকলেই তো জান। মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল, আবার ভোগ-বাসনা জলের জালা। বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর সেই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাক্‌তে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তার পর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ ক'রে সংসারে এসে থাক্‌লে আর কামিনী কাঞ্চনে কিছু কর্‌তে পারবে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হতে পার্‌বে।

"কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়াব দরকার হয় না। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু কর্‌তে পাবে না। যদি নির্জ্জনে সাধন কোরে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ কোবে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসাব কর, তাহলে কামিনীকাঞ্চন তোমার কিছু কর্‌তে পারবে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখম্ তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখম্ যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা হলে সংসাবরূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসারবরূপ জলের উপর রাখ, তা হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে পারবে না।

"ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর এক হাতে কায কর্‌বে। যখন কায থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জ্জনে বাস করবে তাঁর কেবল চিন্তা আর সেবা কর্‌বে।

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া)। মহাশয় এ অতি সুন্দর কথা! নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটী আমরা ভুলে যাই, মনে করি বুঝি একেবারেই জনক রাজা হ'য়ে পড়েছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসার-ত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমাদের শান্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে; খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না, ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে [illegible] [illegible]

"এক জন তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ কোরে চল্লুম'। স্ত্রীটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে বল্লে, 'কেন তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে, যদি পেটের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তাহলে এই ঘরটাই ভাল।' [illegible]

"তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের

জন্য ভাবতে হবে না। রমণ স্বদারায়, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এঁরা জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন, এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্ম্মের।

[জ্ঞানীর লক্ষণ।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, জ্ঞান যে হয়েছে, তা কেমন করে জানবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে বোধ হয় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে, সেই পায়।

সদরওয়ালা। মহাশয়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন ?

(ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টধর্ম্ম ও পাপবাদ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) ঐ কেবল তোমাদের পাপ আর পাপ! এ সব বুঝি খ্রীষ্টানী মত। আমায় একজন একখান বই (Bible) দিলে, একটু পড়া শুনলুম, তা তাতে কেবল ঐ এক কথা! পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি বলেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা। মহাশয়, কেমন করে ঐ বিশ্বাস হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, "প্রভু, বিনে অনুরাগ, কোরে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা"। যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্যে তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর আর কাঁদ। মাগের ব্যামো হলে, কি টাকা লোক্‌সান হলে, কি কর্ম্মের জন্য লোকে এক ঘটী কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি ?

"আম্মোক্তারী দাও"।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। মহাশয়, এঁদের সময় কই ? ইংরেজের কর্ম্ম করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। তিনি যা কায কত্তে দিয়েছেন, তাই করো।

"বিড়ালছানার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই, মা মা করে। মা যদি হেঁশালে রাখে সেইখানেই প'ড়ে আছে। কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকে। আবার যখন মা গৃহস্থের বিছানায় রাখে তখনও সেই ভাব। নিশ্চিন্ত, মা মা করে।

সদরওয়ালা। মহাশয়, আমরা গৃহস্থ, কতদিন এ সব কর্ত্তব্য ক'রতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বৈ কি? ছেলেদের মানুষ ক'রতে হবে। স্ত্রীকে ভরণ ক'রতে হবে, ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় করে রাখ্‌তে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দ্দয়। দয়া শুক-দেবাদি রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষ নয়।

সদরওয়ালা। সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত। পাখী বড হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আস্‌তে দেয় না। (সকলের হাস্য)

(গৃহস্থের কর্ত্তব্য ; জ্ঞানোন্মাদ ও কর্ত্তব্য।)

সদরওয়ালা। স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে ধর্ম্মোপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ কর্‌বে। যদি সতী হয়, তা হলে তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় কর্‌তে হবে।

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন বালকার জন্য তুমি না ভাব্‌লে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাব্‌বেন। যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়। (সদরওয়ালার প্রতি) এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো?

বিজয় গোস্বামী। আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমন হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান্ নিজে বহন

করেন! নাবালকের অমনি 'অছী' এসে জোটে! আহা কবে সেই অবস্থা হবে? যাঁদের হয়, তাঁরা কি ভাগ্যবান্!

ত্রৈলোক্য। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বর লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) কেন গো, তুমি তো সারে মাতে আছ (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

(জ্ঞানীর লক্ষণ, জীবন্মুক্ত।)

ত্রৈলোক্য। সংসারে জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়বে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহ-বুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়; আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্ম-জ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়া কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে নড় নড় করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ যদি হয়ে থাকে, তা হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হয়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ দুঃখে আত্মার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। কামিনী-কাঞ্চনের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়। "কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।"

"যখন দেখ্‌বে, ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে; কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে। দেশলাই যদি শুক্‌নো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাটীগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে র'সে থাক্‌লে, কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাক্‌লে, ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

(উপায় ব্যাকুলতা — আপনার মা।)

ত্রৈলোক্য। বিষয়রস শুকাবার উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়-রস শুকিয়ে যাবে। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষুণি হয়। তিনি তো ধর্ম্মমা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আবদার কর। ছেলে ঘুড়ী কিনবার জন্য মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষুণি ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড করবি'। যখন ছেলে কাঁদতে সুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, তখন মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি'। এই কথা ব'লে চাবীটা দিয়ে কড়াৎ কড়াৎ কোরে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আবদার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের (Sikhs) ঐ কথা বলছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে এসেছিল, মা কালীর মন্দিরের সুমুখে বসে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারা বলেছিল, "ঈশ্বর দয়াময়," আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিসে দয়াময় ? তারা বল্লে, 'কেন মহারাজ, তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, সব দিচ্ছেন, আমাদের আহার যোগাচ্ছেন'। আমি বল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খপর তাদের খাওয়ার ভার বাপে নেবে না, তো কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে নাকি ?

সদরওয়ালা। মহাশয়, তবে কি তিনি দয়াময় নন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কেন গো ? ও একটা বল্লুম, তিনি যে বড় আপনার লোক, তাঁর উপর আমাদের জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে শালা ?'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(অহঙ্কার ও সদরওয়ালা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার জ্ঞানে হয় - না অজ্ঞানে হয় ?

"অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়ালে আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

"অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাক্‌বে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল। প্রতিমার সাজ গোজ দেখে বলছে, 'মা, যতই সাজো, গোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে' (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে বল্‌ছি, জজই হও আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ কর্‌তে হয়।

(ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য, লোক ভিন্নপ্রকৃতি।)

"সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ। তিন গুণের তিন রকম স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কায জড়ায, কাপড় পোষাক ফিট্, ফাট, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queen এর ছবি, যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী গরদ পরে; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোনার রুদ্রাক্ষ; যদি কেউ ঠাকুর-বাড়ী দেখ্‌তে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর বলে, 'এদিকে আসুন আরো আছে, শ্বেত পাথরের, মার্ব্বেল পাথরের মেজে আছে, ষোল ফোকর নাট মন্দির আছে'। আবার দান করে লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত, কাপড় যা তা; রোজকার পেট চলা পর্য্যন্ত; কখনও লোকের তোষামোদ করে ধন নেয় না; বাড়ীতে মেরামত নাই; ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না; মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না; ঈশ্বরচিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্চেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু এলেই তাঁকে পাবে।

(সদরওয়ালার প্রতি) তুমি বলেছিলে, সব লোক সমান, এই দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি!

(মানুষ কত রকম।)

"আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে,—(১) নিত্য জীব, (২) মুক্তজীব, (৩) মুমুক্ষু জীব, (৪) বদ্ধজীব— এই চার রকম মানুষ। নারদ শুকদেব এঁরা সব নিত্য জীব, যেমন Steam-boat (কলের জাহাজ) আপনিও পারে যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্তু, হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্যজীবেরা

নায়েবের স্বরূপ.; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন করতে যায়। আবার মুমুক্ষুজীব আছে, যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছে। এদের মধ্যে দুই একজন জাল থেকে পালাতে পারে ; তাদের বলে মুক্ত জীব। নিত্যজীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত কখনও জালে পড়ে না।

[বদ্ধজীব]।

"কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁস নাই, তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরি-কথা সম্মুখে হলে সেখান থেকে চলে যায়—বলে, হরিনাম মর্‌বার সময় হবে, এখন কেন ? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও. তা না হলে তেল পুড়ে যাবে', আর পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, হায় ! আমি মলে এদের কি হবে। আর, বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে, যেমন উটের কাঁটা-ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়্‌বে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে ; মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হলো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে; বলে, কি কর্‌বো, অদৃষ্টে ছিল ! যদি তীর্থ কর্‌তে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌বা'র অবসর পায় না—কেবল পরিবারদের পুঁটলী বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের পেটের জন্য আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ কোরে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, যারা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বোলে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি) মানুষ কত রকম দেখ, তুমি সব এক বল্‌ছিলে, তা দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি, কারুর বেশী শক্তি, কারুর কম।

[মৃত্যুকাল ও ঈশ্বরের নাম।]

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থে গেলে কি হবে ! সংসার আসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে, হয়তো বিকারের খেয়ালে হলুদ পাঁচ ফোড়ন তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। শুক-পাখী সহজেবেলা রাধাকৃষ্ণ বলে ; বিল্লি ধর্‌লে নিজের বুলি—ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

"গীতায় আছে, মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ জন্ম হলো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয় অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা করেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে, কি আবার এই সুখদুঃখময় সংসারে আস্‌তে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে আবার ধূলা কাদা মাখে। মন মত্তকরী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হলে আর ধূলা কাদা মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহলে শুদ্ধ মন হয়, আর সে মন কামিনী কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এতো কর্ম্মভোগ। লোকে বলে যে গঙ্গাস্নানের সময় পাপগুলো গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠ্‌ছ, অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)।

"দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা করতে রোজ অভ্যাস করতে করতে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।

ব্রাহ্মভক্ত। বেশ কথা হলো। অতি সুন্দর কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি এলোমেলো বল্লুম, তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; আমি ঘর, তিনি ঘরণী; আমি গাড়ী, তিনি Engineer আমি রথ তিনি রথী; যেমন চালান, তেমনি চলি; যেমন করান, তেমনি করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[সঙ্কীর্ত্তনানন্দে]

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিলেন। সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন।

আবার ভাবাস্তে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতে লাগিলেন;—

"নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;
আপনি নেচে, নাচাও গো মা,
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী;
সেই ভুবন-মোহনরূপে (একবার নাচ মা)।

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য। মাতৃগত প্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুম্বকে ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা—নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মত মা মা বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে বেদিতে বসিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়েভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! তা বলে, 'সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্চে, আর এক ঢেউ আসছে'। আমি বল্লুম, 'ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হয়েছে।' তোমার শাশুড়ী তাতে বল্লে, 'আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে! এখনও বিদ্যামায়া আর অবিদ্যা মায়ার পার হই নাই, শুধু অবিদ্যার পার হলে তো হবে না, আবার বিদ্যার পার হতে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে! আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এ কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণীপাল। (বিজয়ের প্রতি) মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন।

বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনায় কি দরকার! আপনাদের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য তরকারীর ব্যবস্থা। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিয়া) যে যেমন ভক্ত, সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণী ভক্ত পায়েস দেয়, রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদির উপর বসিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন।

* * * * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিজয়। (রামকৃষ্ণের প্রতি) আপনি অনুগ্রহ করুন, তার পর আমি বেদি থেকে বল্‌বো।

(বিজয়ের প্রতি উপদেশ।)

[ব্রাহ্মসমাজ ও Lecture। আচার্য্যের কার্য্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিমান গেলেই হলো। 'আমি লেক্‌চার দিচ্ছি, তোমরা শুন,' এ অভিমান না থাক্‌লেই হলো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয় না, অজ্ঞানে হয়। যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়, নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও হয় না, আর মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কসায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়, আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) বল্‌তে থাকে, তখন নিস্তার হয়। এখন আর হাম্বা, হাম্বা (আমি, আমি) বল্‌ছে না, বল্‌ছে তুঁহু, তুঁহু (তুমি, তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমিই সব।

[গুরুবাদ।]

"গুরু, বাবা ও কর্ত্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে যেন কাঁটা বেঁধে। আমি মার ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র।

"যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা, গুরু কিরে ?' এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি) আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানচে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। ঐ একটু মান, লোকে হদ্দ বলবে, আহা, 'বিজয় বাবু বেশ বল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী'। 'আমি বলছি,' এ জ্ঞান কোরো না। আমি মাকে বলি, 'মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; যেমন করাও, তেমনি করি, যেমন বলাও, তেমনি বলি।"

বিজয়। (বিনীতভাবে) আপনি বলুন, তবে আমি বেদীর উপর গিয়ে বোস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আমি কি বোলবো, চাঁদা মামা সকলেরই মামা। যদি আন্তরিক হয়, তা হলে কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যাও, যেমন পদ্ধতি আছে, তেমনি করোগে। আন্তরিক তাঁর উপর থাকলেই হোলো।"

* * * * *

তদনন্তর বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। সতরঞ্চ, গালিচা সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও আসন হইল, তিনিও বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

* * * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মা।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সেখানে মাষ্টারও ছিলেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব। Motherhood of God]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে, এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান্ বাপের চেয়ে বেশী।

"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমীদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাকড়িওয়ালা লাঠী হাতে দ্বারবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর ক'রে ধন সব কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তাহলে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কায করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা এই। কালী কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমার যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপে চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় করে তাঁর চিন্তা করলে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জান্‌তে পারবে। তখন জান্‌তে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে। আর একটী কথা,—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস হয়, তাই বিশ্বাস দৃঢ় করে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বোলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আরো কত কি হতে পারেন তিনি জানেন, আমি জানি না, বুঝ্‌তে পারি না।' মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহলে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।

(কালী ও ব্রহ্ম কখন অভেদ)

যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। অভেদ।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।

সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝনাবে মন ঠারে ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব কর্‌ছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাক্‌ছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে,—

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

"অধর্ম্ম কিনা অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কিনা বৈধী ধর্ম্ম—এতো দান কর্‌তে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।"

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌লে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা, এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহৈতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও আদ্যাশক্তি।)

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতি আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাব্‌লেই মণি ভাব্‌তে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাব্‌লেই আর একটাকে ভাব্‌তে হয়। কিন্তু এ অভেদজ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয়—অহংতত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। নেমে এসে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদ বিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি, এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌চো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ-বোধ, আমি একটী, তুমি একটী। এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্চেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব ভেদবোধ হচ্চে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি (Parsonal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে

দিয়েছেন, হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি তখন ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বল্‌বার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।]

বিজয়। এই আদ্যাশক্তি দর্শন আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো। এই রূপে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আর্শীতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তিকে দর্শন কর্‌বে। কিন্তু আগে আর্শী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়্‌বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখ্‌তে হয়, আর সূর্য্যকে দেখ্‌বার কোন-রূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্বসূর্য্য বই সত্যসূর্য্যকে দেখ্‌বার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আদ্যাশক্তি।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্ব ধরে সত্যসূর্য্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আর জ্ঞানযোগ বড় কঠিন পথ! ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। আমি তুমি সব স্বপ্নবৎ।

(ব্রাহ্মসমাজ ও বিবেষভাব)

"তিনি অন্তর্য্যামী। তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।

"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেওনাকো কার ঘরে;
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

পরমধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

"যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশ্‌বে, তখন সকলকে ভাল বাস্‌বে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখ্‌বে না। ও ব্যক্ত সাকার মানে, নিরাকার মানে না, ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান, এই বোলে নাক সিঁট্‌কে ঘৃণা কোরো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্‌বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশ্‌বে যতদূর পার। আর ভালবাস্‌বে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ কর্‌বে। 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।' নিজের ঘরে স্ব স্বরূপকে দেখ্‌তে পাবে।

"রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক্ হয়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।'

(সন্ন্যাস ও সঞ্চয়, অর্থের সদ্ব্যবহার)

রাত্রি দশটার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণীপাল রামলালের * জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণীপাল। মহাশয়, রামলাল আস্‌তে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া) ও বাবু বেণীপাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না। ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে কর্‌বে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হলো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ! যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি। এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

---

* রামলাল — ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীমন্দিরের পূজারী।

সমালোচনা।

রাজর্ষিকুমার। শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার প্রণীত। মূল্য আট আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। ধ্রুবোপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। ধ্রুবো-পাখ্যান কোন কালে হিন্দুর নিকট পুরাতন হইবার নয়। আমরা ইহা এক্ষণে আধুনিক কবিতার আকারে পাইয়া—পরম আনন্দিত হইলাম। ইহাতে অঙ্কিত চিত্রগুলি অতি মনোরম হইয়াছে। পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যেমন সুন্দর কাব্যরস আস্বাদন করিবেন, তেমনই উচ্চধর্ম্মভাবে বিভোর হইবেন। আমরা একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ধ্রুব আনন্দময়ের উপলব্ধি করিয়া আনন্দের গান গাহিতেছেন,—

"আহা কি মধুর আনন্দ অপার,
শান্তির হিল্লোল প্রাণের মাঝার।
আমি নাই,—শুধু আনন্দ কেবল,—
অনন্ত আনন্দ গভীর অচল!
আনন্দে পূরিত নক্ষত্রের পুরী,
ধরাতলে বহে আনন্দ লহরী।
নাহি দিক্‌দেশ—নাহি কালক্ষণ,
চিন্ময় আনন্দ জ্যোতি অতুলন।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ অনন্ত অম্বর,
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ বিশ্বচরাচর।
অনন্ত আনন্দ রাশির মাঝার,
কেন্দ্রভূত এক ক্ষুদ্র অহংকার।
ক্ষণে ক্ষণে কেন্দ্র হয়ে যায় হারা,
কেবল আনন্দ আপনা-পাশরা।
স্থির ধীর সেই আনন্দের রাশি!
স্নিগ্ধ সুধাময় এক পূর্ণ হাসি।
পূরিয়ে অন্তর পূরিয়ে বাহির,
এক অদ্বিতীয় অচল গভীর,—
অনন্তের অন্ত, অসীমের সীমা
মিলায়ে, বেথায় অপূর্ব্ব মহিমা!

ব্রহ্মাণ্ড পূরিত হাসিময় প্রাণ,
জাগ্রত প্রহরী মহাজ্যোতিষ্মান্!
চন্দ্র সূর্য্য তারা পাখী ফুল অলি,
এক প্রাণ সূত্রে গ্রথিত সকলি!
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল,
হাসির পাথার অনন্ত অচল!
নাহি জন্ম জরা নাহিক মরণ,
বিশ্ব পরিপূর্ণ এক সনাতন!
মহাকেন্দ্র এক অসীম শকতি,
অসীম জগৎ তাহার বিবৃতি।
মহাকেন্দ্রভূত মহাবীজ সেই,
অনন্ত জগতে বিকশিত যেই।
সেই কেন্দ্রে লীন অনন্ত জগত,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম মহতে মহত।
যেই মহাবীজে অনন্তের লয়,
তাহাতে আবার অনন্ত উদয়!
জয় জয় জয় ব্রহ্ম শকতির,
জয় জয় জয় অনন্ত শান্তির,
জয় জয় জয় অনন্ত জ্ঞানের,
জয় জয় জয় অনন্ত প্রাণের।"

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয়, বিগত ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ঢাকাস্থ "রামকৃষ্ণমিশন" গৃহে আসনোপরি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক রামকৃষ্ণ পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্মকথা পাঠ করা হয়। তৎপর হরিসংকীর্ত্তন ও কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত মণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিঃ রামকৃষ্ণমিশনের সভ্যগণ, ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। পর সংখ্যা আষাঢ়ে বাহির হইবে।

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, 'অনেকাল্‌শিৎ সর্ব্বস্য' সূত্র ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ষষ্ঠীবোধক 'অলোহন্ত্যস্য', 'ইকোগুণবৃদ্ধী' 'অনেকাল্‌শিৎ সর্ব্বস্য' এই যাবতীয় সূত্র একত্র মিলিত হইয়া যদি 'ইগন্ত অঙ্গের' বিধান করে, তবে ষষ্ঠীই অবশিষ্ট কোথায় থাকিবে যে, গুণ বা সর্ব্বাদেশ প্রাপ্তি হইবে? অতএব এইপ্রকারে, এই দোষসমূহও প্রাপ্তি হইবে না।

তাহাতেই বা কি হইল, পূর্ব্বের সহিত আপেক্ষিক এই দোষ বলিব। 'সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গশ্চানিগন্তস্য' এই বার্ত্তিকে যে, 'চ' কার পাঠ করা হইয়াছে, তাহা 'হি' শব্দের অর্থে। সুতরাং এক্ষণে এইরূপ অর্থ হইবে যে, মিদি, মৃজি, পুগন্ত, লঘূপধ, ঋচ্ছি, দৃশি, ক্ষিপ্র, এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি স্থলে,—'হি' অর্থাৎ যেহেতু ইগন্তাঙ্গ নাই, সেইহেতু অনিগন্তাঙ্গেরই সর্ব্বাদেশ প্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য 'ইক্‌' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন,— 'মিদেগুর্ণঃ' এইস্থলে, 'মিদ্‌' ধাতুর অন্তে, 'ইক্‌' না থাকাতে, আর গুণাদেশ ইকের হয় বলিয়া, অন্ত্য 'দ'কারের গুণ হইবে না। আবার, 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রে অন্ত্যবর্ণের গুণ হয় বলিয়া, 'মিদ্‌' ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে, 'ইক্‌' থাকাতে 'ই'কারেরও গুণ হইবে না। অথচ 'মিদেগুর্ণঃ' সূত্রে গুণের কথাও বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহারও প্রাপ্তি হওয়া চাই, অতএব সর্ব্বাদেশ অর্থাৎ 'মিদ্‌' এই সমুদায় বর্ণের গুণপ্রাপ্তি হইবে। কেবল এইস্থলেই নহে, 'মৃজ্‌'ধাতু প্রভৃতি যাবতীয় স্থলে, এইরূপ দোষ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি তদপবাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে তদপবাদ পক্ষই হউক।

বার্ত্তিকমূল।—ইগু মাত্রস্যেতি চেজ্জুসি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোগুর্ণে-ষনন্ত্যপ্রতিষেধঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গুণ বা বৃদ্ধি কার্য্য যদি 'ইক্‌' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ মাত্রেরই হয়, তবে, 'জুস্‌' প্রত্যয় পরে থাকিলে, সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, হ্রস্বাদির গুণপ্রাপ্তি হইলে, সেই সকল অন্ত্য ইকেরই কেবল না হয়, এইরূপ বলিতে হইবে। *

ভাষ্যমূল।—ইগু মাত্রস্যেতি চেজ্জুসি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোগুর্ণে-ষনন্ত্যপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ। জুসি গুণঃ। স যথেহ ভবতি। অজুহবুঃ। অবিভয়ুরিতি। এবমনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি কর্ত্তা হর্ত্তা নয়তি তরতি ভবতি। এবমীহিতা ঈহিতুং ঈহিতব্যমিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

হ্রস্বস্য গুণঃ। স যথেহ ভবতি হে অগ্নে হে বায়ো ইতি। এবং হে অগ্নিচিৎ। হে সোমসুৎ। ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

জসি গুণঃ। স যথেহ ভবতি অগ্নয়ো বায়ব ইতি। এবং অগ্নিচিতঃ সোমসুতঃ ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ঋতোঙি সর্ব্বনামস্থানযোর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি কর্ত্তরি কর্ত্তারৌ কর্ত্তার ইতি। এবং সুকৃতি সুকৃতৌ সুকৃত ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ঘেঙিতি গুণঃ। স যথেহ ভবতি। অগ্নয়ে বায়বে ইতি। এবং অগ্নিচিতে সোমসুতে ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ওর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি বাভ্রব্যামাণ্ডব্য ইতি। এবং সুশ্রুৎ সৌশ্রুত ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইগ্ মাত্র অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' বা 'গুণ' আদেশ করিতে হইলে যাবতীয় 'ইক্' বর্ণেরই গ্রহণ হয়; তবে, জুস প্রত্যয় বা সার্ব্বধাতুক আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, অথবা হ্রস্বাদির গুণ কর্ত্তব্য হইলে, তাহা অন্ত্য ইক বর্ণের না হয়, এইরূপ প্রতিষেধ করিতে হইবে।

জুসি চ।৭।৩৮৩। (অচ্ আদিতে আছে যার, এমন জুস প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইক্ অন্ত বিশিষ্ট অঙ্গের গুণ হয়) এই সূত্রানুসারে, 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে, যেমন,—'অজুহবুঃ' 'অবিভয়ু' (১) প্রভৃতি স্থলে গুণ হইয়া থাকে, সেইরূপ,- 'অনেনিজুঃ' 'পর্য্যবেবিষুঃ' (২) এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকযোঃ।৭।৩৮৪। (সার্ব্বধাতুক এবং আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, ইক্ অন্তবিশিষ্ট অঙ্গের গুণ হয়) এইসূত্রানুসারে, যেমন,—'কর্ত্তা' 'হর্ত্তা' 'নয়তি' 'তরতি' 'ভবতি' (৩) প্রভৃতি স্থলে গুণ হইয়া থাকে;

(১) 'হু'দানাদানয়োঃ। 'হু'ধাতুর লিঙে, 'ঝি'র জুসে, অজুহবুঃ। 'ইভি'ভয়ে 'হভি'ধাতুর জুসে প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

(২) নিজির্ শোধণে। নিজ্ ধাতু লিঙ্ এর জুস্। অনেনিজুঃ। 'বিষ্ল'ব্যাপ্তৌ ধাতু। লিঙের জুস 'পর্য্যবেবিষুঃ'।

(৩) কৃ, হৃ, নী, তৃ এবং ভূ ধাতুর স্থানে যথাক্রমে গুণ হইয়া কর্ত্তা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়াছে।

তেমন 'ঈহিতা' 'ঈহিতুম্' 'ঈহিতব্যম্' (১) এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

হ্রস্বস্য গুণঃ ।৭।৩।১০৮। (হ্রস্বের গুণ হয় সম্বোধনে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'হে 'অগ্নে', 'হে বায়ো' প্রভৃতি স্থলে, গুণ হইয়া থাকে, সেরূপ,—'হে অগ্নিচিৎ' 'হে সোমসুৎ' এইসকল স্থলেও গুণপ্রাপ্ত হইবে।

জসি চ ।৭।৩।১০৯। (হ্রস্বান্ত যে অঙ্গ, তাহার গুণ হয়, 'জস্' বিভক্তি পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,— অগ্নয়ঃ' 'বায়বঃ' এই সকল স্থলে গুণ হইয়া থাকে, সেরূপ,—'অগ্নিচিতঃ' 'সোমসুতঃ' এই সকল স্থলেও গুণ প্রাপ্তি হইবে।

ঋতোঙি সর্ব্বনামস্থানযোঃ ।৭।৩।১১০। (ঙি বিভক্তি এবং সর্ব্বনামস্থান-সংজ্ঞক বিভক্তি অর্থাৎ সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিলে, ঋদন্তাঙ্গের গুণ হয়) এইসূত্রানুসারে, যেমন, -'কর্ত্তরি' 'কর্ত্তারৌ' 'কর্ত্তারঃ' ইত্যাদি স্থলে গুণ হয়, সেরূপ,—'সুকৃতি' 'সুকৃতৌ' 'সুকৃতঃ' প্রভৃতি স্থলেও গুণ প্রাপ্ত হইবে।

ঘের্ঙিতি ।৭।৩।১১১। (ঘিসংজ্ঞা বিশিষ্ট যে শব্দ, তাহার উত্তর ঙিৎ অর্থাৎ ঙ কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় এবং সুপ বিভক্তি পরে থাকিলে, 'গুণ' হয়,) এইসূত্রানুসারে, যেমন,—অগ্নয়ে, বায়বে, প্রভৃতি স্থলে গুণ হয়; সেরূপ,—'অগ্নিচিতে' প্রভৃতি স্থলেও 'গুণ' প্রাপ্ত হইবে।

ওর্গুণঃ ।৬।৪।১৪৬। (উবর্ণান্তবিশিষ্ট 'ভ' সংজ্ঞক শব্দের গুণ হয়, তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'বাভ্রব্য' 'মাণ্ডব্য' প্রভৃতি স্থলে 'উ'কারের গুণ হইয়া থাকে, সেরূপ 'সুশ্রুৎ' শব্দের উত্তরও (তদ্ধিত বিহিত 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া) সৌশ্রুত হইলে, 'শ্রু'র 'উ'কারের 'গুণ' প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল দোষ প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূল।—পুগন্তলঘূপধগ্রহণমনন্ত্যনিয়মার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—পুক্ অন্ত এবং লঘু উপধা গ্রহণ, অনন্ত্যের নিয়মের জন্য। *।

ভাষ্যমূল।—পুগন্তলঘূপধগ্রহণমনন্ত্যনিয়মার্থং ভবিষ্যতি। পুগন্তলঘূপ-

(১) 'ঈহ' ধাতুর উত্তর তৃচ্, তুমুন্ এবং তব্য প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে ঈহিতা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়াছে।

ধন্তৈবানন্ত্যস্ত নান্ত্যস্যানন্ত্যস্যেতি। প্রকৃতস্যৈব নিয়মঃ স্যাৎ। কিং চ প্রকৃতম্। সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োরিতি। তেন ভবেদিহ নিয়মান্ন স্যাৎ ঈহিতা ঈহিতুম্ ঈহিতব্যমিতি। হ্রস্বাদ্যোর্গুণস্ত্বনিয়তঃ সোঽনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। অথাপ্যেবং নিয়মঃ স্যাৎ। পুগন্তলঘূপধস্য সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োরেবেতি।

এবমপি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োর্গুণোঽনিয়তঃ সোঽনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। ঈহিতা ঈহিতুম্ ঈহিতব্যমিতি। অথাপ্যুভয়তো নিয়মঃ স্যাৎ। পুগন্তলঘূপধস্যৈব সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োরেব পুগন্তলঘূপধস্যেতি। এবমপ্যয়ং জুসি গুণোঽনিয়তঃ সোঽনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। অনেনিজুঃ পর্য্যবিষুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'পুগন্তলঘূপধস্য চ'(১) এই সূত্রে, লঘু উপধা গ্রহণ,—অন্ত্য 'ইক্'এর গুণ না হয়, এই নিয়ম করিবার জন্য জানিতে হইবে। অর্থাৎ যদি কোনও স্থানে অন্ত্য 'ইক্' ভিন্ন অন্য 'ইক্'এর গুণ হয়, তবে কেবলমাত্র তাহা, লঘু উপধাবিশিষ্ট 'ইক্'এরই হইবে; এতদ্ভিন্ন (লঘুউপধা ভিন্ন) অন্য কোনও অন্ত্যরহিত 'ইক্'এর গুণ হইবে না।

প্রকরণবশতঃ পূর্ব্বাপর সকল 'ইক্'এরই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা (পুগন্তলঘূপধস্য চ) তাহাতে (প্রকরণপ্রাপ্তবিষয়ে) নিয়ম করিল।

সেই প্রকরণটি কি?

সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ(২) এই সূত্রানুসারে যাবতীয় ইগন্ত অঙ্গমাত্রেরই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই হেতু এই 'পুগন্ত' ও লঘু উপধার' জন্য নিয়ম করাতে, 'ঈহিতা, ঈহিতুম্, ঈহিতব্যম্' এই সকল স্থলে, 'ঈহ্' ধাতুর 'ঈ'কার উপধাভূত হইলেও লঘু না হইয়া গুরু হওয়াতে (৩) গুণ প্রাপ্তি হইল না; সুতরাং প্রয়োগসমূহও সিদ্ধ হইল।

ঐ সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেও, (হে অগ্নে, হে বায়ো, অগ্নয়ঃ, বায়বঃ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া) 'হে অগ্নিচিৎ', 'হে সোমসুৎ,' ইত্যাদির যে উল্লেখ

(১) এই সূত্রের এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, প্রকারান্তরে করা হইবে।

(২) অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(৩) দীর্ঘের গুরু সংজ্ঞা হয়, এবং সংযুক্তবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্বেরও গুরুসংজ্ঞা হয়।

করা হইয়াছে, সে সকল স্থলে, হ্রস্ব স্বর সমূহের গুণের ত কোন নিয়ম করা হয় নাই ; সুতরাং সেই স্থলে ত অনন্ত্য বর্ণেরও গুণ প্রাপ্তি হইবে ?

এই দোষ নিবারণ জন্য এইস্থলে, এইরূপ নিয়ম করা হইবে যে,—পুগন্ত-লঘূপধস্য সূত্রানুসারে যদি কোথাও লঘু উপধার গুণ হয় ; তবে 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধধাতুক' পরে থাকিলেই হয়, সুতরাং 'অগ্নিচিৎ' 'সোমসুৎ' প্রভৃতি স্থলে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে নাই বলিয়া লঘু উপধারও গুণ হইবে না।

এইরূপ লঘু উপধার নিয়ম করিলেও কিন্তু সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যে পূর্বেরই গুণ হইবে, কি মধ্যেরই হইবে, কি পরেরই হইবে, তাহার কোন নিয়ম করা হয় নাই, সুতরাং তাহা অন্ত্য ভিন্ন অন্য বর্ণেরও 'গুণ' প্রাপ্তি হইবে ? অতএব 'ঈহিতা', 'ঈহিতুম্', 'ঈহিতব্যম্' ইত্যাদি স্থলেও 'ঈ'কারের গুণ হইতে থাকিবে ?

এইরূপ দোষ হইলে তদ্দোষ নিবারণ জন্য, অনন্তর উভয় পক্ষেই নিয়ম করা হইবে ;—'পুগন্ত' এবং 'লঘু উপধার' যদি গুণ হয়, তবে 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধধাতুক' পরে থাকিলেই হইবে। আর 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধ-ধাতুক' পরে থাকিলে, যদি গুণ হয়, তবে 'পুগন্ত' এবং 'লঘু উপধার'ই হইবে।

এইরূপ নিয়ম করিলে, অন্যত্র বারণ হইলেও 'জুসি চ', এই সূত্রানুসারে, যেখানে 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, গুণ প্রাপ্তি হয় ; সেখানে কোন নিয়ম করা হয় নাই বলিয়া, অন্ত্য হয় নাই এমন যে 'ইক্', তাহারও গুণ প্রাপ্তি হইবে। যেমন,—'অনেনিজুঃ' 'পর্য্যবেবিষুঃ' ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—এবং তর্হি নায়ং তচ্ছেষঃ নায়ং তদপবাদঃ। অন্যদেবেদং পরিভাষান্তরমসম্বন্ধমনয়া পরিভাষয়া। পরিভাষান্তরমিতি চ মত্বা ক্রোষ্ট্রীয়াঃ পঠন্তি। নিয়মাদিকো গুণবৃদ্ধী ভবতো বিপ্রতিষেধেনেতি। যদি চায়ং তচ্ছেষঃ স্যাত্তেনৈব তস্যাযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। অথাপি তদপবাদঃ। উৎসর্গা-পবাদয়োরপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। তত্র নিয়মস্যাবকাশঃ। রাজ্ঞঃ ক চ। রাজকীয়ম্। ইকো গুণবৃদ্ধী ইত্যস্যাবকাশঃ। চয়নং চায়কো লবনং লাবক ইতি। ইহোভয়ং প্রাপ্নোতি মেদ্যতি মার্ষ্টীতি। ইকো গুণবৃদ্ধী ইত্যেতদ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ হইলে, তবে বলিব যে, ইহা না 'তচ্ছেষ' না 'তদপবাদ' ; ইহা একটী অন্য পরিভাষান্তর, ইহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ

নাই। আর ইহা একটী পরিভাষান্তর, এই মনে করিয়াই ক্রোষ্ট্রীয় ঋষিগণ পাঠ করিয়া থাকেন যে ;—বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধ হেতু নিয়ম অর্থাৎ 'অলোঽন্ত্যা' সূত্র দ্বারা অন্ত বর্ণের যে নিয়ম করা হইয়াছে, তদপেক্ষা 'ইকোগুণবৃদ্ধী' বিধানপর বলিয়া গুন বা বৃদ্ধিই হইবে।

যদি ইহা 'তচ্ছেষ' অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের আদেশ হইত, তবে 'বিপ্রতিষেধ' বলাই অসঙ্গত হইত। আর যদি 'তদপবাদ' অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণ বিধির বাধক হইত ; তবে, উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) এবং অপবাদ (বিশেষ বিধি) ইহাদের বিপ্রতিষেধও অসঙ্গত।

তত্র অর্থাৎ অন্যত্র নিয়মের (অলোঽন্ত্যবিধির) অবকাশ পড়িয়াছে ; যেমন ;—রাজ্ঞঃ ক চ ৪।২।১৪০। (বৃদ্ধ সংজ্ঞা প্রযুক্ত 'ছ'প্রত্যয় সিদ্ধ হইলে, তাহার সহিত সংযোগে, মাত্র 'ক'কার আদেশ বিধান হইয়া থাকে) এই সূত্রানুসারে, 'রাজন্' শব্দের অন্তস্থিত নকার স্থানে 'ক'কার হইয়া যাইবে ; সুতরাং 'রাজকীয়ম্' প্রযোগও সিদ্ধ হইবে।

আর 'ইকোগুণবৃদ্ধী' এইসূত্রের অবকাশ চিঞ্ চয়নে, ধাতুর উত্তর, 'ল্যুট্'প্রত্যয় করিলে 'চয়ন' আর 'ণক', প্রত্যয় করিলে 'চায়ক', এইরূপ পূঞ্ পবনে ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে 'পবন' এবং 'ণক' প্রত্যয় করিলে পাবক' হইবে) চয়নং ('চি'ধাতুর 'ই'কারের গুণ করিয়া), চাযকং ('চি' ধাতুর 'ই'কারের বৃদ্ধি করিয়া), পবনং ('পূ' ধাতুর উর গুণে), পাবকঃ (উকারের বৃদ্ধিতে), ইত্যাদি স্থলে হইবে। কিন্তু 'মেদ্যতি' এবং 'মাষ্টি' ইত্যাদি স্থলে উভয় অর্থাৎ 'অলোঽন্ত্যা' এবং 'ইকো গুণবৃদ্ধী' প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এইস্থলেই তুল্যবল বিরোধ হওয়াতে, পরকার্য্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' হইবে।

ভাষ্যমূল।—নৈষযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। বিপ্রতিষেধে পরমিত্যুচ্যতে। পূর্ব্বশ্চায়ং যোগঃ পরো নিয়মঃ।

ইষ্টবাচী পরশব্দঃ। বিপ্রতিষেধে পরং যদিষ্টং তদ্ভবতীতি। এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। দ্বিকার্য্যযোগো হি বিপ্রতিষেধঃ। ন চাত্রৈকো দ্বিকার্য্যযুক্তঃ। নাবশ্যং দ্বিকার্য্যযোগ এব বিপ্রতিষেধঃ। কিং তর্হ্যসম্ভবোপি। স চাস্ত্যত্রাসম্ভবঃ।

কোঽসাবসম্ভবঃ। ইহ তাবদ্বৃক্ষেভ্যঃ প্লক্ষেভ্য ইতি। একঃ স্থানী দ্বাবাদেশৌ ন চাস্তি সম্ভবঃ। যদেকস্য স্থানিনো দ্বাবাদেশৌ স্যাতাম্। ইহেদানীং মেদ্যতি মেদ্যতঃ মেদ্যন্তি ইতি। দ্বৌ স্থানিনৌ এক আদেশঃ।

ন চাস্তি সংভবঃ। দ্বয়োঃ স্থানিনোরেক আদেশঃ স্যাদিহেয়োহসম্ভবঃ। সতোতস্মিন্নসম্ভবে যুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। দ্বয়োর্হি সাবকাশয়োঃ সমবস্থিতয়োর্বিপ্রতিষেধোভবতি। অনবকাশশ্চায়ং যোগঃ। ননু চ ইদানীমেবাস্যাবকাশঃ প্রক্লৃপ্তঃ। চয়নং চায়কো লবনং লাবক ইতি। অত্রাপি নিয়মঃ প্রাপ্নোতি। নাপ্রাপ্তে নিয়মেঽয়ং যোগ আরভ্যতে। যাবতা চ নাপ্রাপ্তে নিয়মেঽয়ং যোগ আরভ্যতে ততস্তস্যাপবাদোঽয়ং যোগো ভবতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চাযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ।

ভাষ্যানুবাদ —এইস্থলে বিপ্রতিষেধ কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্ ।১।৪ ২।' (তুল্যবলবিরোধে পরকার্য্য হইয়া থাকে) এইসূত্রে, 'বিপ্রতিষেধে পরং' এইরূপ বলা হইয়াছে। আর এখানে এই যোগ অর্থাৎ 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র পূর্ব্বে করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়ম অর্থাৎ 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র পরে করা হইয়াছে। অতএব, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' কার্য্য পূর্ব্বে হইতে পারে না।

এইস্থলে দোষ হইবে না, কারণ, 'পর'শব্দ ইষ্টার্থবাচক বলিব, তাহা হইলেই 'বিপ্রতিষেধে পরং' এই বাক্যদ্বারা, যাহা অভীষ্ট, তাহাই হইবে।

এইরূপ করিলেও 'বিপ্রতিষেধ' বলা অসঙ্গত। যে হেতু দুইটী কার্য্য একত্র সংযোগ হইলেই 'বিপ্রতিষেধ' হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ত একস্থানে দুই কার্য্যের সংযোগ হয় নাই?

অবশ্য কেবল মাত্র একস্থলে দুই কার্য্যের সংযোগ হইলেই বিপ্রতিষেধ হয় না।

তবে কি?

অসম্ভব হইলেও বিপ্রতিষেধ হয়। সেই অসম্ভবই এইস্থলে হইয়াছে।

এই অসম্ভবের দৃষ্টান্ত কোথায়?

'বৃক্ষেভ্যঃ' 'প্লক্ষেভ্যঃ' প্রভৃতি এই সকল স্থলে,'স্থানী' এক (১) অথচ আদেশ দুইটী, সুতরাং ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

---

(১) সুপি চ ।৭।৩।১০২ (যঞ্‌ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদিবিশিষ্ট সুপ্‌ পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়) এইসূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ'শব্দের অন্ত্য 'অ'কারের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ছিল। আর 'বহুবচনে ঝল্যেৎ ।৭।৩।১০৩।' (বহুবচনস্থিত ঝল্‌প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদি বিশিষ্ট 'সুপ্‌'বিভক্তিস্থিত শব্দ পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের স্থানে একার হয়) এইসূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ' শব্দের

যদি একটী স্থানীর দুই আদেশই প্রাপ্তি হয় ; তবে সংপ্রতি 'মেত্ততি' 'মেত্ততঃ' 'মেত্তন্তি' (১) এই সকল স্থলে, দুই স্থানীরও এক আদেশ প্রাপ্তি হউক !

ইহা কথনও সম্ভব হইতে পারে না। দুই স্থানীর যে এক আদেশ হয় ; ইহা একান্তই অসম্ভব। অতএব এরূপ অসম্ভব হইলে বিপ্রতিষেধ হওয়া সঙ্গতই হইবে।

এরূপ করিলেও বিপ্রতিষেধ অসঙ্গত হইবে। কারণ দুইটী সূত্রের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্তির অবকাশ থাকিলে, সেই সকল স্থলে কার্য্য করিয়া, যদি আসিয়া একস্থলে প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তবেই বিপ্রতিষেধ হইয়া থাকে, কিন্তু এই যোগ অর্থাৎ ইকো গুণবৃদ্ধী সূত্র, অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইতে অবকাশ পায় নাই।

যদি বল যে, এক্ষণই ইহার অবকাশ উল্লেখ করা হইল ;—যেমন,—'চয়নং' 'চায়কঃ' 'লবনং' 'লাবকঃ' ইত্যাদি ?

এই সকল স্থলেও নিয়ম ('অলোঽন্ত্যস্য'সূত্র) প্রাপ্তি আছে ? অর্থাৎ 'চি' ধাতু এবং 'পু'ধাতুর মধ্যে যখন দুইটী 'ইক্' বর্ণ নাই, কেবল একটী করিয়া ইকার এবং উকার রহিয়াছে, আবার সেই ইকার উকারও ধাতুর অন্তেই অবস্থান করিতেছে, তখন এখানে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াও গুণবৃদ্ধি কার্য্য সমাধা হইয়া, 'চয়নং' 'চায়কঃ' 'লবনং' 'লাবকঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যেখানে নিয়মের ('অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের) প্রাপ্তি নাই, সেখানেই এইযোগ (ইকোগুণবৃদ্ধী সূত্র) আরম্ভ করা হইয়াছে।

যেহেতু, নিয়মের অলোন্ত্যসূত্রের অপ্রাপ্তিতে এই যোগ ('ইকোগুণবৃদ্ধী সূত্র') আরম্ভ করা হইয়াছে ; সেইহেতু ইহা, ঐসূত্রের ('অলোন্ত্য' সূত্রের) অপবাদক। অতএব 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) হওয়াতে,

---

'ভ্যস্' প্রত্যয় পরে থাকাতে 'এ'কারও প্রাপ্তি ছিল। অতএব এ স্থলে একমাত্র স্থানী 'বৃক্ষ' শব্দের 'ক্ষ'কার স্থানে 'দীর্ঘ'ত্ব এবং 'এ'ত্ব দুই আদেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

(১) 'মিদ্' ধাতুর [illegible] হয় বলিয়া 'ই'কারের গুণ, আর অন্ত্যবর্ণের গুণ হয় বলিয়া 'দ' কারের গুণ, এই উভয় কার্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল।

বিজ্ঞাপন :—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যাদ্বয় বন্ধ থাকার দরুন ১৫ই বৈশাখের অষ্টম সংখ্যার পর একেবারে ১লা আষাঢ়ের উদ্বোধন নবম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য, এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

"বেদ" নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম "বেদ"।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন "ধর্ম্ম" কেবল "কথার কথা" ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র "বেদ"।

অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি দেশীয় ধর্ম্মপুস্তক সমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্ব প্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ "বেদ" নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের

অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই "বেদ"।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতি নীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়া গৃহীত হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্ত্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্ত ভাগই নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায় সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ কাল পাত্র ভেদে অধিক ভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত বর্ণন মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন, এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধিমানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরক ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি? এবং সতত বিবদমান আপাত-প্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত সর্ব্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন,

স্বদেশীয় ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীয় ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্মনামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়? এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ, স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ লোকের হিতের জন্য আপনাকে প্রদর্শন করিতে

শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্তসংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এব প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার পুনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে, এই জন্য বেদমূর্ত্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারম্বার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়; প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান হইতেছে। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন, এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য, বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতনধর্ম্মের সমগ্রভাবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ, শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর, এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

ক্রমাভিব্যক্তিবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে ক্রমাভিব্যক্তিতেই (Evolution) জড় ও প্রাণিজগতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে চাহেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর

শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানবের মনে সেই ক্রমবিকাশবাদ এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জড়জগতের ক্রমোন্মেষণ যখনি জীব-জগতে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, সে স্থলে আগন্তুক চৈতন্যের কারণানুসন্ধানে অপারগ হইলেও, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে সকল যুক্তিকৌশল অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত পোষণ করিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচায়ক। ঐ মতের দোষগুণ বিচারে আমাদের প্রয়োজনাভাব। এতন্মতে জীবজগতে সুখদুঃখাদ্যনুভব (Feeling) অনুধ্যান (Reflection) এবং জ্ঞান (Knowledge) বিকাশের ক্রমভেদ বিচার করিয়া দেখিলে ক্রমোন্মেষণবাদী দার্শনিকগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ইহাঁরা বলেন, সুখদুঃখাদ্যনুভব মানবজীবনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। যদিও অন্তর্নিহিত কথঞ্চিৎ জ্ঞানের অভাবে সুখ দুঃখাদির অনুভব কল্পনার অযোগ্য হয়, তথাপি অনুভূতির প্রাবল্য দেখিয়া মানবমনের তাদৃশ প্রাথমিক স্ফুরণ অদোষ বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানবশিশুর যুগপৎ হাস্যক্রন্দনরূপ বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে ইহাঁরা জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আদিম অসভ্য জাতি, যাহা মানবসমাজের শৈশবাবস্থা, তাহা আজ সুসভ্য সমাজে পরিণত। ঐ সকল অসভ্য জাতির মধ্যে ভাবপ্রবণতার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও অসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য কারণেই আকস্মিক ভাবপ্রবণতা দৃষ্ট হয়। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিমনিবাসিগণ এক পেনির জন্য হয়ত একজনকে হত্যা করিয়া পরমুহূর্ত্তেই অন্য জনকে এক পাউণ্ড দান করিয়া ফেলিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, অসভ্যজাতির অনুভবশক্তি এত প্রবল যে, পদচিহ্ন দেখিয়া ইহারা ব্যক্তিবিশেষকে তখনি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। বালক ও অসভ্যজাতি এ উভয়েই দূরকারণানুমানে নিরতিশয় অপটু। প্রত্যক্ষই ইহাদের লীলাভূমি। কিন্তু বালকের বা অসভ্য জাতির বয়োবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কের ক্রমোন্মেষণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুধ্যানের (Reflection) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুধ্যানের সুশৃঙ্খল প্রবাহ ক্রমে জ্ঞানে (Knowledge) পরিণত হয়। সর্ব্বদেশীয় মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও (Psychologist) বলিয়া থাকেন, অনুভূতি (Feeling) হইতেই অনুধ্যান (Reflection) এবং অনুধ্যান হইতে জ্ঞান (Knowledge) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রমোন্মেষণবাদী পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, সুখদুঃখাদ্যনুভব মানবজীবনের জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা, ইহার প্রকৃত অর্থ কি? সকলেই বুঝিতে পারেন

যে, সুখদুঃখাদ্যনুভব বাহ্যবস্তুসাপেক্ষ। সুখ দুঃখাদি স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই প্রোক্তমতে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার্য্য। জ্ঞাতা যখন জ্ঞেয় পদার্থ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনি সে জ্ঞেয় পদার্থের ভাবে রঞ্জিত হইয়া থাকে। বাহ্যজগৎ বা জ্ঞেয় পদার্থ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পড়াই জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা। এ অবস্থায় মনের বহির্মুখী বৃত্তি নিরতিশয় প্রকাশ, সুতরাং বহির্জ্জগদনুসন্ধানে সবিশেষ যত্নবতী। দৃশ্যজগৎ দ্রষ্টাকর্ত্তৃক নানাভাবে অনুভূত হইয়াই প্রত্যেক জাতির আদিমাবস্থায় বোধ হয় সুখদুঃখাদ্যনুভবদ্যোতক কাব্যযুগের অবতারণা করিয়াছিল। যেন এ যুগে দ্রষ্টা দৃশ্যপদার্থের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহারই স্তব স্তুতিতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা জ্ঞেয় বা দৃশ্য পদার্থকে ক্রমেই অধীন করিয়া ফেলে; এবং অবশেষে বাহ্যদৃশ্যকে দ্রষ্টা স্বীয় অস্তিত্বে লীন করিয়া ফেলে; তখন আর দ্বৈতভানের সম্ভাবনা কোথায়? ইহার নামই বেদান্তমতে অদ্বৈত জ্ঞান।

প্রোক্তমতের পরিপোষকরূপে প্রবীণ দার্শনিক ভট্টমোক্ষমুলর আর্য্যজাতির বেদের ক্রমবিকাশ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদের ১ম ভাগে সেই জন্য ভাবপ্রবণ স্তব স্তুতি ও বাহ্যপদার্থ বর্ণনে অসাধারণ কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মকাণ্ডে তাহা ক্রমে অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া উপনিষদ ভাগে তাহার প্রবল অন্তর্মুখী গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুখদুঃখাদ্যনুভবে যাহার প্রাথমিক বিকাশ, কর্ম্মাদিতে যাহার অনুধ্যান, নিরপেক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানেই তাহার পর্য্যাপ্তি; ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমত যুক্তি।

ইহা অবিতথ সত্য যে, সর্ব্ব কালে এবং সর্ব্ব দেশেই ক্রমোন্মেষিত বুদ্ধি স্বতই ঐক্যে (Unity) বা অদ্বৈততত্ত্বানুসন্ধানে ধাবমান। সেই নিরপেক্ষ ঐক্যতে মিশিবার জন্য যে সকল চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের নামই বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র। ইহাদের মধ্যে যে শাস্ত্রগুলি বাহ্য বা জড়পদার্থ আলোচনায় তৎপর, তাহাদের নাম প্রাকৃতবিজ্ঞান; আর যাহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনায় তৎপর, তাহাদের নাম দর্শন শাস্ত্র। এই উভয় প্রস্থানই ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বে অবগাহনোন্মুখ। তবে যে বিজ্ঞান বা দর্শন সেই ঐক্যতত্ত্বে যত অগ্রসর, সেই বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে তত সমাদৃত হইয়াছে ও হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন গুলির মধ্যে যে দর্শন মানবমনের স্বাভাবিকী জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছে, তাহাই অস্মদ্দেশীয় বেদান্ত শাস্ত্র। অন্যান্য

দর্শনগুলি সকলেই সেই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞানের অল্পাধিক পরিপোষক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে য়ুরোপীয় দার্শনিক মতগুলি প্রায়ই তর্ক-প্রতিষ্ঠিত এবং অস্মদ্দেশীয় মতগুলি সরলতর্ক এবং আপ্তোপদেশ উভয়দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে ঐক্যতত্ত্বলাভে যেন সমধিক আশ্বস্ত করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুখদুঃখানুভব বাহ্য বা জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব-সাপেক্ষ। বস্তুতঃ আপাতপ্রতীয়মান বাহ্যপদার্থের অস্তিত্বে কেই বা সহসা সন্দিহান্ হইতে পারে? তাই অপ্রত্যক্ষপ্রমাণ আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, একমাত্র প্রত্যক্ষজগৎকে নিত্যজ্ঞান করিয়া চার্ব্বাকগণ কান্তালিঙ্গনাদিসুখ-সাধনকেই পরমপুরুষার্থ স্থির করিয়াছিলেন। চার্ব্বাকগণ জ্ঞানরাজ্যের নবজাত শিশু। বালকের ন্যায় সামান্য সুখদুঃখানুভব ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ অনুষ্ঠানের শক্তি চার্ব্বাকদর্শনে স্ফুরিত হয় নাই। শিশু বা অসভ্যজাতির ন্যায় চার্ব্বাকগণের বর্ত্তমানই বিলাসভূমি। প্রত্যক্ষ হইতে সামান্যযুক্তিবলে অনুমানে যাইবারও তাহাদের সামর্থ্য জন্মে নাই। তাই চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী। কিশোর বৌদ্ধগণ চতুর্ব্বিধ অবান্তর শাখাভেদ সত্ত্বেও বয়সাধিক্য বশতঃ সমধিক চিন্তাশীল। তাই তাহারা অনুভূতি (Perception) হইতে অনুধ্যানে (Reflection), বা প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে উপস্থিত হইয়াছিল। চতুর্ব্বিধ ভাবনাদ্বারা সমস্তই ক্ষণিকজ্ঞানে বৌদ্ধগণ সর্ব্বশূন্যবাদে উপস্থিত হইয়া ঐক্যানুসন্ধিৎসা পিপাসায় একপ্রকার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিন্তাশীলগণের জ্ঞানতৃষা সেখানেও মিটে নাই। বেদবিরোধী লৌকিক যুক্তি-প্রধান শূন্যবাদ মানবানুধ্যানের পর্য্যাপ্ত পরিসীমা হইতে পারে না। কারণ, ক্ষণিক বিধায় পূর্ব্বাপর বিচার্য্য বিষয়ের অন্যোন্য সম্বন্ধ (Reciprocal association) থাকে না। এতদ্দেশীয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ঐক্যানুসন্ধিৎসার যুবাবস্থা। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণবাদী প্রোক্তদর্শনদ্বয় অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ ঐক্যতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যুবক যেমন স্বতঃই নিজসামর্থ্যে একান্তবিশ্বাসী হইয়া পরোপদিষ্ট উপদেশ তেমন গ্রাহ্য করিতে চাহে না, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সেইরূপ প্রায়ই লৌকিক তর্কদ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আপ্তবাক্যের প্রমাণপরতা স্বীকার করিয়াও তাহার বেদান্তবিরোধী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন মানবানুধ্যানেরই প্রৌঢ়াবস্থা। ইহার প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান, বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত নিরপেক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানেরই ভূমিকাস্বরূপে যেন উপলব্ধ হইয়াছে।

উপনিষদ্‌বেদ্য অদ্বৈততত্ত্ব মানবানুধ্যানের বৃদ্ধাবস্থা। যে ঐক্যানুসন্ধিৎসা বহির্মুখী হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণাপেক্ষী হইয়াছিল, তাহাই আবার নানা অনুধ্যান সংযোগে বলবতী হইয়া অবশেষে অদ্বৈততত্ত্বরূপ মহাসাগরে স্যন্দমান হইয়াছে। অনুভূতিতে যাহার আরম্ভ, অনুধ্যানে যাহার পরিপুষ্টি, তাহাই আবার প্রত্যক্ষানুভূত ঐক্যতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে।

সত্যাদিযুগচতুষ্টয়ের ন্যায়, দর্শনেরও ৪টী যুগ কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রথমটী ব্যবহারিক যুগ (Empirical stage); ২য়টী অনুধ্যান যুগ (Reflective stage); ৩য়টী আধ্যাত্মিকযুগ (Spiritual stage) এবং ৪র্থটী ঐক্যযুগ (Unitarian stage)। এতদ্দেশীয় ব্যবহারযুগে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ; অনুধ্যানযুগে নৈয়ায়িক ও কাণাদগণ, অধ্যাত্মযুগে সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ এবং ঐক্যযুগে মীমাংসকগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ষড়্‌দর্শনেও মানবচিন্তার ক্রমোন্মেষণপ্রণালী পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। ষড়্‌দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্যও এই উপায়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

যাহারা নিতান্ত শিশু, তাহাদের বুদ্ধিতে সাধারণ জ্ঞান (Generalisation) ঝটিতি উৎপন্ন হয় না। একটী গো দর্শন করিয়া 'গোত্বের' জ্ঞান হয় না। তাই শিশু ভূয়োদর্শন করিতে করিতে পরে 'গোত্ব' জ্ঞান লাভ করে। 'গোত্বের' জ্ঞান হইতে পরে হয়ত জীবত্বে, জীবত্ব হইতে বস্তুত্বে, বস্তুত্ব হইতে ভূতত্বে, ভূতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রত্বে এবং অবশেষে জাতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা একত্বে অবস্থিত হওয়াই জ্ঞানের ক্রমোন্মেষণের পর্য্যাপ্ত পরিসীমা। বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সাধারণ জ্ঞানে বা একত্বে অবস্থিতি হওয়াই ক্রমোন্মেষণের চরম ফল। ভারতীয় দর্শনরাজ্যেও এই ক্রমবিকাশের পরিস্ফুট আভা চিন্তাশীল মাত্রেই দেখিতে পাইবেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বৈশেষিক ভাষ্যোপক্রমণিকায় কাণাদদর্শনকেই ষড়্‌দর্শনের প্রথম দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ন্যায়প্রস্থানই যে দার্শনিক রাজ্যের প্রথম সন্তান, সে বিষয়ে সমালোচকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পদার্থাদি বিচার প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে গৌতমপ্রণীত ন্যায় দর্শনকেই প্রাথমিক দর্শন বলিয়া মনে হয়। শিশু যেমন বহু পদার্থ দেখিয়া পরে জাতিজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপ যে যত অধিক পদার্থ স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়, সে দর্শনরাজ্যে তত প্রাথমিক। তাই প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থবাদী গৌতমন্যায়কেই প্রাচীনতম দর্শন

বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সপ্তপদার্থবাদী কণাদ সেই ষোড়শপদার্থকেই সপ্ততত্ত্বে পরিণত করিয়া ন্যায়োক্ত সমস্ত তত্ত্বই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করত জ্ঞানের ক্রমোন্মেষণ দেখাইয়াছেন। যে দর্শনের ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাধারণজ্ঞানে (Generalisation) কণাদের নিকট সপ্ততত্ত্বে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। অথচ ন্যায়োক্ত কোন পদার্থই বৈশেষিক দর্শনে অস্বীকৃত হয় নাই।

বিশেষ নামক (Differentia) কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া ষট্‌পদার্থবাদী হইলেও কাণাদদর্শন বৈশেষিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মতে সেজন্য বৈশেষিক দর্শনই ন্যায়ের পরবর্ত্তী দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

ভারতীয় দর্শনের দ্বিতীয় যুগে কপিল ও পতঞ্জলি দুই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কপিলকেই অগ্রজ বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি সপ্ত পদার্থকে ভাঙ্গিয়া দ্বিতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। তদুক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক প্রকৃতিরই বিভিন্ন পরিণাম। কিন্তু জড়াত্মিকা প্রকৃতির পুরুষশক্তিরূপে ভিন্ন স্বতঃ পরিণমন অসম্ভব বিধায় বিচার ক্রমে তিনি প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বিতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। পাঠকগণ দেখিবেন, যাহার ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্ত্বে পরিণমিত হওয়ায় জাতিজ্ঞান ক্রমেই একত্বাভিমুখী হইতেছে! পতঞ্জলি দৃষ্টতঃ ত্রিতত্ত্ববাদী হইলেও তিনি কপিলদেবের কনিষ্ঠ। কারণ, নিরীশ্বর সাংখ্যের পরিণামী চিন্তা সাধারণের ধারণায় অবিষয় হইয়াছিল। তাহারা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" শুনিয়াই কপিলকে বেদবিরোধী বলিয়া মনে করিল! সেই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ" সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও অলক্ষ্যে সাংখ্যতত্ত্বই উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়েই দ্বিতত্ত্ববাদী।

তৃতীয়যুগের দর্শনকার জৈমিনি ও বেদব্যাস সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্ত্বকেই আবার একতত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। তবে শিষ্য, জৈমিনি তাহা কর্ম্ম বা ধর্ম্মরূপ একতত্ত্বে এবং গুরু বেদব্যাস তাহা ব্রহ্ম বা আত্মরূপ একতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। জৈমিনি কেবল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগকেই 'বেদ' নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ম্মদ্বারা মুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানশরীর বেদব্যাস উপনিষৎকাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্মা বা ব্রহ্মরূপ একতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা উভয়েই একতত্ত্ববাদী। শিষ্য হইলেও জৈমিনিদর্শনকেই আবার উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর দর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণ জীবের ধর্ম্মাদির

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাসশিষ্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করিয়াছেন। পরম-জ্ঞানীর বিশ্রামস্থল নির্দ্দেশ জন্য বেদব্যাস বেদান্তদর্শন রচনা' করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গী বিচার বা অধিকরণ উভয় দর্শনেরই একরূপ। গুরুশিষ্যের বিরোধ আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও তাহা অধিকারিবিশেষের উপকার নিমিত্ত বা ক্রমোন্নতি কল্পেই রচিত। শ্রীরামানুজ স্বামী তাঁহার শ্রীভাষ্যে এইজন্য উভয় মীমাংসাদর্শনকেই এক পুস্তকের দুই অধ্যায় রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন: জৈমিনির মতে বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ বর্জ্জিত হওয়ায় একত্বরূপ মুক্তিতত্ত্বে অবস্থান ঘটে। বেদব্যাস তাহা পরম্পরাপক্ষে সহায়ী কারণ স্বীকার করিয়াও একত্বাবস্থিতিকে নিরপেক্ষ (Absolute) বলিয়া সিদ্ধান্তিত করেন। সে একত্ব কার্য্যকারণরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। একত্ব জ্ঞানের পর আর জাতি জ্ঞানের প্রসার নাই। ইহাই দার্শনিক জ্ঞানের চরম উন্নতি। এজন্য ক্রমোন্মেষণ মতে ব্যাস-দর্শন এতদ্দেশীয় দর্শনসমূহের শেষ দর্শন বলিয়া নির্ভয়ে সমর্থিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

দশম অধ্যায়। দেহদর্শন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [১৬৬ পৃষ্ঠার পর।

মহাপূর্ণ গুরুপাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাকাল মাত্র গৃহস্থের গৃহে অপেক্ষা করিয়া সমস্ত দিন গমন করিতে লাগিলেন। রজনীকাল কোনও ভাগ্যবান্ গৃহস্থের অলিন্দে যাপন করিতেন। এইরূপে চারি দিবসে কাঞ্চিপুরে উপনীত হইলেন, এবং শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিয়া মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহার আগমন কারণ অবগত হইয়া সেই রজনী তাঁহার আশ্রমে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ নানাবিধ শিষ্টালাপে তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে কাঞ্চিপূর্ণের সহিত শালকূপের অভিমুখে গমন করিলেন।

পথিমধ্যে কলসস্কন্ধ রামানুজকে দূর হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "আমার এক্ষণে মন্দিরে গমন করিতে হইবে, সুতরাং আমি বিদায় হই। আপনি রামানুজসমীপে গমন করিয়া আপনার মন্তব্য ব্যক্ত

করুন।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মহাপূর্ণ সেই দূরস্থ, পূর্ণকলসস্কন্ধ, পরম মনোহর, দিব্যদীপ্তিবিশিষ্ট, বিষ্ণুভক্তির অদ্বিতীয় আধার, নরাকার দেবতাকে সন্দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন হইতে স্বতঃই এই ভগদ্গুণাবলি নিঃসৃত হইল,

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচিঃ
মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ॥

ক্রমে শ্রীমান্ রামানুজ অতি সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাপূর্ণ আনন্দভরে ভগবৎপাদপদ্মে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

নমো নমো বাঙ্মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥

তিনি যামুনরচিত আরও কতিপয় শ্লোক পাঠ করিলেন। গতি স্থির করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রামানুজ দণ্ডায়মান হইলেন এবং একাগ্রচিত্তে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন; পরে অতি বিনীতভাবে, সুমধুর ভাষায় সেই পূজার্হ, কাষায়ধারী, বয়োবৃদ্ধ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল অতুলনীয় শ্লোকের রচয়িতা কে? আমি তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি, এবং আপনার ন্যায় মহানুভবকেও বার বার নমস্কার করি। অদ্য আমার সুপ্রভাত, কারণ, আপনার পবিত্র মুখ হইতে এই পবিত্র গাথা শ্রবণ করিয়া আমি আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "এই শ্লোকগুলি আমার প্রভু শ্রীমান যামুনাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।" যামুনাচার্য্যের নাম শুনিয়া রামানুজ সাতিশয় আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, শুনিয়াছি, মহর্ষি পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর কুশলে আছে তো? আপনি তাঁহার পদচ্ছায়া হইতে কতদিবস বঞ্চিত আছেন?" মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমি সম্প্রতিই তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে আগমন করিতেছি। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লই, তখন তাঁহার শরীর আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।" তাহাতে রামানুজ কহিলেন, "আপনার এখানে আসিবার কারণ কি? আপনি অদ্য কোথায় ভিক্ষা করিবেন? যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এ অধমের

গৃহে ভিক্ষা করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন, এই আমার প্রার্থনা।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "যাঁহার জন্য মহর্ষি যামুনমুনি সর্ব্বদাই চিন্তিত, তাঁহার অপেক্ষা কৃতার্থ ও ভাগ্যবান্ পুরুষ আর কে আছে? হে মহাত্মন্, মদীয় প্রভুর আদেশে আমি তোমারই নিকট আসিয়াছি।" রামানুজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর জীবকে সেই দেবতুল্য মহাপুরুষ স্মরণ করিয়াছেন? আমি কি তাঁহার স্মরণের যোগ্য? কি অভিপ্রায়ে তিনি আমায় স্মরণ করিয়াছেন?" মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমার প্রভু তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্যই তিনি আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর রোগের আক্রমণে অতি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ আছেন। সুতরাং যদি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তদ্দর্শনার্থে গমন করা উচিত।" এই সুসম্বাদে শ্রীমান্ রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মহাপূর্ণকে কহিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি এই জলপূর্ণ কলসটি মন্দিরে রক্ষা করিয়া আসি, পরে উভয়েই শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিব।" এই বলিয়া রামানুজ দ্রুতপদসঞ্চারে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। মহাপূর্ণ যামুনাচার্য্যের প্রতি রামানুজের স্বাভাবিক প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং এরূপ শুদ্ধ-ভক্তের সহিত বাক্যালাপ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি গাহিলেন,—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূৎ
অপি মে জন্ম চতুর্মুখাত্মনা॥

অনতিবিলম্বে রামানুজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত। মহাপূর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "গৃহে সমাচার দিবে না? তোমার অবর্ত্তমানে গৃহকর্ম্ম যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে, তদ্বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া আসা কি উচিত নয়?" রামানুজ কহিলেন, "অগ্রে ভগবান্ ও তদ্ভক্তের আজ্ঞাপালন, তৎপরে গৃহকর্ম্ম। আমার মন যামুনমুনিকে দর্শন করিবার জন্য নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া এখনই যাত্রা করিতে অনুমতি করুন।" মহাপূর্ণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি রামানুজকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। উভয়েই মহাপুরুষ সন্দর্শনার্থে

ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতে লাগিলেন। দিবাভাগে কোন গৃহস্থের ভবনে ভিক্ষা করিয়া, রজনীযোগে কাহারও অলিন্দে বিশ্রাম করিয়া চারি দিবসে কাবেরীতীরে অবস্থিত শ্রীশিরঃপল্লিতে (Trichinopoly) উপনীত হইলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাবেরীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী মঠাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সম্মুখে মহাজনতা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতাদৃশ জনতার কারণ কি?" জনৈক ব্যক্তি উত্তর করিল, "মহাশয়, বলিব আর কি? পৃথিবী আজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন। মহাত্মা আল্‌ওয়ান্দার্ পরমপদলাভ করিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়াই রামানুজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মহাপূর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক স্বীয়ললাটে করাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা প্রভো, দাসকে কি এইরূপে বঞ্চিত করিতে হয়? এই জন্যই কি আমায় কাঞ্চিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন?" ইহা কহিয়া অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া সংজ্ঞাহীন রামানুজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া জল আনয়নপূর্ব্বক মূর্চ্ছিতের নয়নে ও বদনে অর্পণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "বৎস, কি করিবে? যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবেই। সকলই নারায়ণের ইচ্ছা। যে মহাপুরুষের জন্য আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহারই বাক্যানুসারে সকলই মঙ্গলের জন্য হয়। শ্রীমন্নারায়ণের ইচ্ছার অনুগামী হইতে তিনি আমাদের বরাবর উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে তাঁহার উপদেশের প্রতি অনাস্থা করা কোন রূপেই উচিত নয়। চল, সমাধিগর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র বিগ্রহকে শেষদর্শন করিয়া লই।" রামানুজ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যলাভ করিয়া মহাপূর্ণের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে শিষ্যসমাবৃত আল্‌ওয়ান্দারের দেহমন্দিরের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, মহাপুরুষ দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মহাপূর্ণ পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় নয়নজলে তাহা ধৌত করিতে লাগিলেন। রামানুজ অবাক্ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়েরই শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। রামানুজ

স্থিরনেত্রে সেই পরম পবিত্র, সাত্ত্বতপ্রধানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। চিরনিদ্রিতের বদনে গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, সর্ব্বলাবণ্যহর মৃত্যুর তামসিক ছায়া সেই পবিত্র দেহে পতিত হয় নাই। মৃত্যুর সাধ্য কি যে, সে ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করে? রামানুজ এক দৃষ্টিতে সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। যেন অন্তরে অন্তরে দুজনে কি কথা কহিতেছেন। সকলে নিস্তব্ধ; তাদৃশ জনতার মধ্যে কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সকলে অবাক্ হইয়া সেই যুগলমূর্ত্তির—সেই জীবিত ও মৃতের সমাগম দেখিতেছেন।

কিয়ৎকাল পরে শ্রীরামানুজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতেছি, মহর্ষির দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আছে। জীবদ্দশাতেও কি একপ থাকিত?" পার্শ্বস্থ শিষ্যগণ কহিলেন, "না, উঁহার অঙ্গুলি সকল সাধারণ অঙ্গুলির ন্যায় সহজভাবেই থাকিত। অধুনা একপ থাকিবার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না।" ইহা শুনিয়া রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"অহং বিষ্ণুমতে স্থিত্বা জনানজ্ঞানমোহিতান্।
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নান্ দ্রাবিড়াম্নায়পারগান্।
প্রপত্তিধর্ম্মনিরতান্ কৃত্বা রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

"আমি বিষ্ণুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদবিশারদ, এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব।" ইহা বলিবামাত্র একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল। রামানুজ আবার কহিলেন,—

"সংগৃহ্য নিখিলানর্থান্ তত্ত্বজ্ঞানপরং শুভম্।
শ্রীভাষ্যঞ্চ করিষ্যামি জনরক্ষণহেতুনা॥"

"আমি লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বার্থ সংগ্রহ করিয়া মঙ্গলময়, তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব।" ইহা বলিবামাত্র আর একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল। রামানুজ আবার কহিলেন,—

"জীবেশ্বরাদীন্ লোকেভ্যঃ কৃপয়া যঃ পরাশরঃ।
সন্দর্শয়ন্ তৎস্বভাবান্ তদুপায়গতীস্তথা।
পুরাণরত্নং সংচক্রে মুনিবর্য্যঃ কৃপানিধিঃ।

তস্য নাম্না মহাপ্রাজ্ঞবৈষ্ণবস্তু চ কস্যচিৎ।'
অভিধানং করিষ্যামি নিষ্ক্রয়ার্থং মুনেরহম্॥

"যে কৃপাময়, মুনিবর পরাশর লোকের প্রতি দয়াবশতঃ জীব, ঈশ্বর, জগৎ, তাহাদের স্বভাব, ও তাহাদের উন্নতিপথ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া পুরাণ-রত্ন (বিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ঋণপরিশোধ করিবার জন্য আমি কোন এক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তন্নামে অভিহিত করিব।" ইহা বলিবামাত্র অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি খুলিয়া সরল হইয়া গেল! ইহা দেখিয়া সকলে নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ঐ যুবকই যে কালে আল্‌ওয়ান্দারের আসন গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সমাধিগর্ভে দেহকে স্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই শ্রীরামানুজ কাঞ্চিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। আল্‌ওয়ান্দারশিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথজীউ দর্শন করিয়া যাইতে বলায়, তিনি অভিমানভরে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "যে ভগবান্ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন না, যিনি আমার হৃদয়ের আরাধ্যদেবতাকে চিরদিনের জন্য অপহরণ করিয়া লইলেন, আমি সেই নিষ্ঠুর ভগবান্‌কে দেখিতে চাই না।" ইহা বলিয়া আপনার মনে, কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কাহারও কোনও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া রামানুজ স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই দিবস হইতে তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতবিকসিত বদন হইতে হাস্যরেখা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি যথাসময়ে কাঞ্চিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাল্যচপলতা গিয়া এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্কের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে যাপন করিতেন। সহধর্ম্মিণীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার সঙ্গ যথাসাধ্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেন। কেবল কাঞ্চিপূর্ণের সহবাসে কিছু আনন্দ পাইতেন।

(ক্রমশঃ)

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন, ৫ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

গীতায় ভগবান বলিতেছেন, ইহলোকে নিষ্ঠা দ্বিবিধ। ১ম, জ্ঞানযোগ, ২য়, কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান-

প্রাপ্ত না হইলেও কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র বাঁচিবার উপায় নাই। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রাকৃতিক গুণ মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর—কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বেদের প্রতিজ্ঞা কি। বেদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি, তাহাই বলেন। আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে, কি উপায়েই বা উহা লাভ হইতে পারে, বেদ সেই বিষয়ই বলেন। বেদ বলেন, সকলের ভিতর তিনি রহিয়াছেন। জীবজন্তু কীটপতঙ্গের ভিতর তিনি; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের ভিতরও তিনি। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের ভিতর রহিয়াছেন।

তাঁহাকে কে লাভ করিতে পারে? দৃঢ়তা যাহার আছে, যে সাহসী, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে সক্ষম। যে দুর্ব্বলদেহ, যাহার মন নিস্তেজ, এই আত্মজ্ঞান তাহার লাভ হওয়া কঠিন। তেজীয়ান হইতে হইবে, তাহা হইলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। বেদ সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ই বলেন। সনাতন ধর্ম্মের অর্থ এই:—যে ধর্ম্ম, কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলের মধ্যেই এক; যাহা সকল জাতিতে, সকল সময়ে এক, অপরিবর্ত্তনীয়। আর পুরাণাদি যুগধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করেন। দেশকালপাত্র বিবেচনায় নানাপ্রকার যুগধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কি, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহা এই:—নিজ ধর্ম্মমতে নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু অপরের ধর্ম্মকেও ভাল বাসিবে, ঘৃণা করিবে না। ইহা তিনি শুধু বলিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি নিজ জীবনে সাধন দ্বারা উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যত মত, তত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য; তবে যে যেরূপ অধিকারী, সে সেইরূপ পথ বাছিয়া লয়।

শাস্ত্রে বলে, সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে ভগবানে অপূর্ণতা দোষ হয়। যদি বলা যায়, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে পূর্ণ ছিলেন, তবে সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণতর হইলেন, বলিতে হয়। আর যদি বলা যায়, সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণ হইলেন, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, বলিতে হয়। এ উভয় পক্ষেই দোষ রহিয়াছে। 'পূর্ণতর' কথাটীই স্ববিরোধী আর যাহা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইল, তাহা বাস্তবিক অপূর্ণই ছিল, বলিতে হয়। পূর্ণের আবার বিকাশ কি? সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে তাঁহাকে আবার নিষ্ঠুরতাদোষে দোষী

করা হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ বা দরিদ্র, রুগ্ন ও মূর্খ; কেহ বা ধনী, সুস্থকায় ও বিদ্বান্। ভগবান যদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা দোষ অনিবার্য্য রূপে আসিয়া পড়ে। এই হেতু শাস্ত্র বলেন, সৃষ্টি অনাদি।

যখন ইহা সূক্ষ্মভাবে বীজরূপে থাকে, তখন ইহার প্রলয়াবস্থা, যখন স্থূলভাবে প্রকাশ, তখন সৃষ্টি। এইরূপ এক সৃষ্টি ও এক প্রলয় হইয়া এক কল্প। সৃষ্টি ও প্রলয় এইরূপ প্রবাহরূপে অনাদিকাল বর্ত্তমান। ইহা ভগবান ছাড়া কিছু নয়, তিনিই এই হইয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, তিনি ঈক্ষণ করিলেন, (আলোচনা করিলেন) আমি প্রজারূপে বহু হইব; আর তিনি এই সৃষ্টিরূপে বহু হইলেন। এই সৃষ্টি করিবার ভগবানের কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি পূর্ণ, তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উদ্দেশ্য কাহার থাকে? যাহার কোন অভাব আছে। সেই অভাবমোচনের জন্য সে নানাবিষয়ের সাহায্য লয়। ভগবানের কোন অভাব নাই। তাঁহার কিছু পাইবার আবশ্যক নাই, কারণ, তিনি পূর্ণ। অতএব তাঁহার এই সৃষ্টি করিবার কোন উদ্দেশ্যও নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে না। এই সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নাই বলিলে তাহারা মনে করে, ইহার কোন নিয়ম নাই, ইহা একটা পাগলামি মাত্র। উদ্দেশ্যহীন কোন কার্য্য হইতে পারে ইহা তাহারা মনে করিতে পারে না। কারণ, তাহারা নিজেদের অপূর্ণত্ব হইতে দেখিয়া থাকে, উদ্দেশ্যহীন কার্য্য সাধারণ মনুষ্যের দ্বারা কোন কালে হয় না। তাহাদের অভাব আছে বলিয়াই তাহারা কার্য্য করে। অতএব তাহারা অনুমান করে, সৃষ্টিকার্য্যও এইরূপে হইয়াছে। ভগবান কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই যুক্তিগুলি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহাতে ভগবান মনুষ্যতুল্য, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা তাঁহার খেলা, ইহা তাঁহার লীলামাত্র। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হইলে কখন কি কার্য্য হইতে পারে?. শাস্ত্রকারেরা বলেন, অবশ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত বালক। বালক যেরূপ পথে যাইতে যাইতে পতঙ্গ দেখিয়া তাহাই ধরিতে যায়, উদ্দেশ্যহীন অথচ নানাকার্য্য করে, ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যও তদ্রূপ। তিনি নানারূপ সাজিয়াছেন—ইহা তাঁহার খেলা।

দেখিতে পাই, সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী;

কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত। এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, ইহার কারণ কর্ম্ম। এই 'কর্ম্ম' শব্দ শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন, পৃথিবী নক্ষত্রাদি কর্ম্মসম্ভূত। এ কথার অর্থ কি? এখানে কর্ম্মের অর্থ বীজভাব হইতে কার্য্যকারণরূপে প্রকাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়া এবং এই পরিণতিকেই কর্ম্ম বলে। সৃষ্টি যখন অনাদি হইল, তখন সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ 'কর্ম্ম'ও অনাদি।

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যে কর্ম্ম কর না কেন, তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কেহই ইহার অন্যথা করিতে পারে না। মনে কোন চিন্তার উদয়রূপ মানসিক কর্ম্মেরও ফল আছে। কোন পাপচিন্তা উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফলস্বরূপ মন কলুষিত হয় এবং যখন এই পাপচিন্তা প্রবল হয়, তখন ইহা শারীরিক কার্য্যরূপে বাহিরে প্রকাশিত হয়। আমরা অনেক সময় কর্ম্মের ফল দেখিতে না পাইলেও কোন না কোনরূপে তাহা বর্ত্তমান আছে, ইহা নিশ্চিত। শরীরসম্বন্ধীয় অনিয়ম রোগরূপে আমাদের কষ্ট দেয়। রোগ ঔষধ দিয়া উপশম হয়। ইহাতে শারীরিক অনিয়মের ফল, ঔষধসেবনরূপ অন্য এক কর্ম্মফল দ্বারা রূপান্তর ধারণ করিল মাত্র। দুইটী ভিন্ন কর্ম্মের ফলই আমাদের উপভোগ করিতে হইল। কোনটীর বিনাশ হইল না, উভয় কর্ম্মফল মিলিয়া একটী কর্ম্মফলরূপে প্রতীয়মান হইল, এইমাত্র প্রভেদ। যেরূপ নৌকার মাস্তলে দড়ি বাঁধিয়া উভয় তীর হইতে গুণ টানিলে নৌকা কোন তীরে না গিয়া নদীর মধ্য দিয়া যাইতে থাকে, সেইরূপ দুই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের সংযোগে এক বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, এই মাত্র। কিন্তু কর্ম্মফলের নাশ কখনও নাই।

অনেকের বিশ্বাস, কোন এক অবতার বিশ্বাস করিলে আমাদের সমুদয় পাপ মোচন হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। স্বয়ং হরি, হর বা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হইলেও তোমার মোক্ষ তোমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে অবতারাদি কি করেন? তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মপরিণত জীবন আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আমাদের কি করিতে হইবে, তাহাই দেখান। আমাদের সম্মুখে একটী তয়েরী জীবন রাখিয়া দেন, যাহা দেখিয়া আমরা তদনুরূপ হইতে পারি। তাঁহারা একটী আদর্শ দেখাইয়া যান এবং উহা মনুষ্যজীবনে পরিণত করিবার সহজ উপায় বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে এক লক্ষ জন্মের কার্য্য শত জন্মে, এমন কি, এক জন্মে ভোগ হইয়া মানুষ ধর্ম্মের

চরম সীমায় উপনীত হয়। এ কথা স্বয়ং ভগবান গীতাদি শাস্ত্রে বারবার বলিয়া গিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র বলেন, কর্ম্ম ও তাহার ফল নিত্যসম্বন্ধ—কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। প্রলয়কালে ইহা বীজভাবে ও সৃষ্টিকালে বিকাশভাবে থাকে ; এই মাত্র প্রভেদ।

সচরাচর চারিপ্রকৃতির মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির লোক। তাঁহারা বিচার ভিন্ন কোন তত্ত্বই গ্রহণ করিতে চান না। লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য করিতে চান না। ২য়, ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক। ইঁহারাও বিচার করেন বটে, কিন্তু কেহ সত্য বলিতেছে দেখিলে তাহার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। ৩য়, কর্ম্মপ্রধান প্রকৃতির লোক। তাঁহারা পরোপকারাদি ধর্ম্মই একমাত্র কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্বদা কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৪র্থ, যোগপ্রধান প্রকৃতির লোক। ইঁহারা মানসিক শক্তিসমূহের তন্ন তন্ন বিচার করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন। মানুষ এই চারিটী ভাবের একটী মাত্র লইয়া অবস্থান করে, এরূপ বলা ভ্রম। তবে উহার মধ্যে একটী ভাব প্রত্যেকের মনে অধিক প্রবল থাকে, এই মাত্র। যাহার যে ভাব প্রবল থাকুক না কেন, এবং যে, যে পথ অবলম্বন করিয়া চলুক না কেন, উন্নতির চরম সীমায় সকলেই ভগবানের সহিত একতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্র এই একতা উপলব্ধির চারিটী বিশেষ পথ উপদেশ করিয়া থাকেন। উহাদের নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও রাজযোগ। ভগবানের সহিত আমাদিগকে যুক্ত করে বলিয়াই এই চারি মার্গ 'যোগ' শব্দে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কর্ম্মযোগের বিষয় বলিতেছি। অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া বাসনাশূন্য হইয়া ভগবানের জন্য কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। আহার বিহার প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করিবে, ভগবানের জন্য করিতেছি, এই ভাব মনে করিবে। আমি কিম্বা আমার জন্য ইহা করিতেছি, ইহা না ভাবিয়া ভগবানের জন্য করিতেছি, এই ভাবিবে।

বৈরাগ্য না উন্মত্ততা ?

একজন বিএ পাশ করা যুবকের মনে হঠাৎ কোন কারণে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। যুবক বড়মানুষের ছেলে—বাপ লাখপতি জমীদার। কলকেতায়

তাঁদের মস্ত বাড়ী ছিল। বাপ মা ভাই ভগিনী সব বর্ত্তমান—শুধু তা নয়, বছর চেরেক হইল বিবাহও হইয়াছে—ঘরে সেই যুবতী স্ত্রী। ছেলে পুলে কিছু হয় নাই। বয়স এখন বছর ২২।২৩ হবে। শরীরে কোন রোগ ছিল না—বেশ সুবলিষ্ট; বাড়ীর কারুর সঙ্গে একটু বকাবকি হবার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে হঠাৎ এরকম কেন হল? একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথা কোথা চলে গেছেন। সকলে কেঁদে আকুল। তাঁর বাপ মার ত আজ চারদিন অবধি কিছু খাওয়া দাওয়া নেই। আমরা ত সকলে মহাদুঃখিত—দাদাবাবুর অদর্শনে। দাদাবাবু আমার কখনো একটা চড়া কথা কাউকে বলেন না। মহাবুদ্ধিমান, অতি দয়ালু, নম্র প্রকৃতির লোক। আমি যতদিন এ সংসারে আছি, ততদিনের ভিতর এমন শোকাবহ ঘটনা কখন হয় নি।

বলিয়া রাখি, আমি এ বাড়ীর একজন পুরাতন সরকার, দশ বার বছর যাবৎ আছি, কিন্তু এমন সুখে আর কোথাও চাকরী করি নাই। আমরা সকলে এইরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছি, এমন সময় কর্ত্তাবাবু তাড়াতাড়ি একদিন এসে আমায় ডেকে বল্লেন, 'রাম, একটা গোপনীয় কথা আছে।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। কর্ত্তাবাবুর মুখ যেন একটু প্রফুল্ল। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন।

আমি মনে করিলাম, বুঝি দাদাবাবুর কোন খবর আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদাবাবুর কি কোন খবর পাইয়াছেন?' 'হাঁ, পাইয়াছিও বটে, আবার পাই নাইও বটে।' আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কর্ত্তাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'রাম, শোন, এই বয়সে এমন পুত্ররত্ন হারাইতে বসিয়াছি। যে কোনরূপে হউক, তোমায় তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতেই হইবে।' কর্ত্তার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। 'নগেন্দ্রের হঠাৎ এই লেখাটী পাইয়াছি। তুমি ভাল করিয়া তাহার খাতাপত্র খোঁজ—কিছু লিখিয়া গিয়া থাকিতে পারে।' লেখাটী লইয়া পড়িলাম, পড়িয়া তাঁহার খাতাপত্র খোঁজার স্পৃহা কতকটা হ্রাস হইল। বাবু বলিলেন, 'কি বুঝিতেছ?' বলিলাম, 'বৈরাগ্য দায়। দাদা বাবুর বিবেক জন্মিয়াছে। আশ্চর্য্য, আমরা এতদিন কিছু টের পাই নাই।' খাতাপত্র খুঁজিলাম, কিছুই সন্ধান করিতে পারিলাম না। সমুদয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। কোন ফল হইল না।

* * * * *

দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ক্রমে একটু একটু করিয়া সকলের শোক কমিল। কিন্তু স্মৃতি গেল না। একদিন এক তেজঃপুঞ্জকায় সন্ন্যাসী উপস্থিত। দেখিয়া চিনিলাম—সকলে চিনিলেন। শোক আনন্দ একত্রে উথলিল। মুখ প্রশান্ত, সুখে দুঃখে যেন অটল। ভক্তিজ্ঞান যেন মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বৃদ্ধ পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিলেন, 'ভগবানকে জীবনের লক্ষ্য কর, তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আর সব বাজে কাযমাত্র।' আমাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। দু একটী কথা যাহা কহিলেন, যেন মধুমাখা। বলিলেন, 'সদসৎ বিচার ভুলো না; তাহলে ক্রমশঃ সতের সঙ্গে দেখা হবে, পরমানন্দলাভ হবে।'

ঘণ্টা কয়েক থাকিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই অবধি আমার মনে যেন একটা দাগ থাকিয়া গেল। আমি পূর্ব্ব হইতেই দাদাবাবুর লেখা সেই কাগজগুলি কাছে রাখিয়াছিলাম। একটু মন খারাপ হলেই সেগুলি পড়ি—তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া ও তাঁহার বৈরাগ্যো-দ্দীপক লেখাগুলি পড়িয়া আমার মনে—আমি সংসারী হইলেও—বেশ এক এক বার চৈতন্য হয়। তাই মনে করিলাম, যদি সেইগুলি পড়িয়া অপর কোন সংসারীর কিছু উপকার হয়, তাই লেখাটী বেশ সুপ্রণালী ক্রমে বিন্যস্ত না হইলেও পাঠকগণকে উপহার দিলাম। বোধ হয়, দাদাবাবু কোন দিন নিজের ভাবে বিভোর হইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া লিখিতেছিলেন—

ইতি, কোন সরকার।

"কেন ঘুরিয়া মরি!—

লোকে সচরাচর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই বলিয়া থাকে, আমাদের সংসারের কাযে দিন রাত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, ঈশ্বরচিন্তা করি কখন? যেন তাঁদের কে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে, সংসারের কায করুয়ে বাবা কর্, না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। আচ্ছা, এঁদের কি কখন এক একবার চকিতের মত মনে উদয় হয় না যে, এইযে সব কাযে ব্যস্ত রয়েছি, এ আমার নিজের দোষে—আমি নিজে কায না কোরে থাক্‌তে পারিনি বোলে। আমাকে যদি কেউ জোর করে সব কায ছাড়িয়ে দিয়ে খালি বলে ঈশ্বরচিন্তা কর্, তা হলে আমি হাঁফিয়ে মরি। এ চিন্তা কি কখন তাঁদের উদয় হয় না?

শুভ মুহূর্ত্তে অবশ্য সকল প্রাণে ক্ষীণ বা স্পষ্ট স্বরে এই বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ উহাকে চাপা দিয়ে নানারকম হেত্বাভাস দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে চায়—আর দোষ চাপায়—সমাজের উপর, ঘটনাচক্রের উপর, আবার সর্ব্বোপরি—বিধাতার উপর। কেন ঘুরে মরি? ঘুরিতে সুখ পাই বলিয়া। সংসারের কর্ম্মে কেন এত ব্যস্ত? সংসারের কর্ম্মে সুখ পাই বলিয়া। মোহ বলে একটা জিনিষ আছে—সেইটে আমাদের টেনে টেনে নিয়ে বেড়ায়—একটু রূপ দেখ্‌লে একেবারে উন্মত্ত হই—এতটুকু জিহ্বার স্বাদের জন্য, এতটুকু সুগন্ধের জন্য, এতটুকু সুখস্পর্শের জন্য আমরা বিচার ভূলে যাই। স্থির-ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করা কথার কথামাত্র, যত ভাবা চিন্তা যায়, তত কায কমে যায়। যা কিছু কায হয়, তাও বড় পবিত্র ভাবে হয়।

এখন কথা হচ্চে এই, স্রোতে গা ভাসান দেওয়া ভাল, না বিচার করে—সদসৎ বিচার করে বুঝে শুঝে চলা ভাল? বিচার যদি না কল্লুম, তা হলে পশু আর আমি ত এক।

মানুষের মনুষ্যত্ব কোন্ খানে? মানুষের বিচারশক্তিতে। মানুষ কাষ করিতে করিতে এক একবার চকিতের মত পেছন দিকে চেয়ে কি কচ্চি ভাব্‌তে পারে বলে, মানুষের ভিতর চৈতন্যশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে বলে। তা না হলে জড়ের সঙ্গে মানুষের সমান ভাব হোতো। মানুষ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারে বলেই জড়ের সঙ্গে তার প্রভেদ। মানুষের ভিতর দেবতা অসুর দুইই আছে। অসুর রূপরসের জন্য উন্মত্ত—দেবতা বলেন, ভাবিয়া কায কর—ভাবো। দেবতা ভাবময়—দেবতা কেবল অসুরের কার্য্যের সমালোচনা করে। দেবতা কেবল বলে—কি কোচ্চো?

মানুষ সর্ব্বদা ভোগে মাতিয়া থাকিতে পারে না। ভোগটা যেন নেশার মত, ত্যাগটা যেন আকাশের মত পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। মানুষের মন হাজার অসৎ দিকে যাক্ না কেন, ত্যাগে আকৃষ্ট হবেই। তাই সহস্র কষ্ট সত্ত্বেও ত্যাগের জীবনের, সন্ন্যাসিজীবনের শ্রেষ্ঠতা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখ্‌চেন—'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।' বাস্তবিক, যার অগাধ ঐশ্বর্য্য আছে, বিষয়মদিরা পানে যে অন্ধ,সে নহে, যার এই মদের নেশা ছুটেছে, যার ঘুম ভেঙ্গেছে,যার সব স্বপ্ন বোধ হয়েছে,সেই সুখী। সেই আনন্দময় পুরুষ। আর সকলে আনন্দকে ভেংচাইতেছে মাত্র। পঞ্চাশ পর্দ্দার ভেতর দিয়ে সেই আনন্দের ঝিকিমিকি।

মানুষ মাতিয়া যায়, তাই ঘোরে। একটুখানি রূপ, একটুখানি রস, একটুখানি গন্ধ, একটুখানি শব্দ, একটুখানি স্পর্শ মানুষকে কুহকমন্ত্রে ভুলাইতে সমর্থ। কে এ যাদুকর, যে এই সব দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে ? মন, এ চিন্তা কি কখন করেছ ? না করে থাক, কর, থাম , কোথায় সামনের দিকে ছুটেছ, একবার পেছনে চেয়ে দেখ। একবার দেখ, কোথায় চলেছ। এ আলেয়ার আলো—কোথায় তেপান্তর মাঠে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হবে। আপনার তেজ আপনি বোঝ্‌বার চেষ্টা কর—সমুদয় কর্ম্মের রহস্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। তোমার যা নিজের আনন্দ আছে, তোমার যা নিজের তেজ আছে, তাই তোমার নিজস্ব। তুমি কেন অপরের ধনে গৃধ্নু হও ? তুমি নিজেকে অপূর্ণ মনে কর্‌ছো—তাই তোমার এত ঘোরাঘুরি, তাই তোমার এত কর্ম্ম। কিন্তু একবার যদি কর্ম্মের রহস্য বুঝ্‌তে পার, তা হলে দেখ্‌বে, তুমি সর্ব্বশক্তিমান হয়ে, সর্ব্বজ্ঞানময় হয়ে, ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা করে বেড়াচ্ছ। অভিমান কিসের ? যে এত বড় লোক যে, তার তুলনা হয় না, তার কোটি মুদ্রার অভিমান কিসের ? যে স্বয়ং সুন্দরের সুন্দর, অতি সুন্দর, যার সৌন্দর্য্যে জগৎ আলো, তার এত টুকু রূপের অভিমান কেন ? মন, জান না কি,ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, সেখানে সূর্য্যের জ্যোতি জোনাকির আলো। তাই বলি মন, 'আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না কো কারু ঘরে, যা চাবি, তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে'। কর্ম্মাভিমানিন্‌, কত কর্ম্ম কর্‌বে ? তোমা থেকেই যে সব কর্ম্ম—তোমা থেকেই যে সব। মন, যখন স্থির হয়ে ভাবি, তখন হাসি পায় তোর চেষ্টা দেখে। শাস্ত্রে বলেছেন, তুই অন্ধ। তা ঠিকই বটে। তুই যদি চক্ষুষ্মান্ হতিস, তা হলে তোর এত দিন লজ্জা উপস্থিত হত। তুই নটীর মত নাচ্চিস্ আর আমাকেও তার সঙ্গে জড়িয়েছিস্—তাইতে আমিও নাচ্চি বোধ হচ্চে, আমি ত তুই নই। তুই নাচ্‌বি নাচ্। আমি জেনে রাখ্‌ব, বুঝে রাখ্‌ব, তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুই ত সত্ত্ব, রজঃ, তমের নানা রকম ক্রিয়া দেখাবি। দেখা না, দেখি আর আনন্দ করি।

একটী কবিতায় পড়েছিলুম, একের পৃষ্ঠে শূন্য দি যত, শূন্যের মূল্য বাড়ে তত, একে ভুলি, শূন্যগুলি সারজ্ঞান করেছি।' বাস্তবিক আমাদের হয়েছে তাই। আমাকে নিয়েই আমার যত জ্ঞান, যত চেষ্টা, যত কর্ম্ম, যত ঘোরাঘুরি , কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই 'আমি'কে ভুল হয়ে গিয়েছে—এখন 'আমার' লইয়া ব্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বাসের কথা বলিতেছি না, কাযের কথা বলিতেছি।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 'আমার' কি আছে? তবু এই ভ্রান্তবুদ্ধি যায় না।

একবার আমি কোন লোকের ছাতা নিয়ে এসেছিলাম। সেই ছাতাটী তাকে ফিরিয়ে দিতে গেলাম। গিয়া খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া উঠিব বলিয়া উঠিয়াছি, একটু বাহিরে আসিয়া দেখি, ছাতাটী 'আমার' মনে করিয়া হাতে করিয়া আসিয়াছি। এইরূপ হওয়াতে হাসি আসিল। এই কথার আলোচনা করিতে করিতে ফের রাখিতে গেলাম—ফের উঠিয়া আবার ছাতা লইয়া আসিতে উদ্যত। অল্প খানিক সঙ্গে থাকাতে এত 'আমার' বুদ্ধি! কি ভয়ানক! ভাবিয়া দেখিলে সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হইবে না। যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইবে। সুখ প্রলোভনকে বিভীষিকাময়, ভ্রান্তিময়, মায়াময় পিশাচিনী বোধ হবে। কি ভয়ানক! ইহারি মধ্যে বাস। মোহ যাবে কিসে? ঘোরাঘুরি নিবৃত্তি হবে কিসে?

উপায় আছে।

উপায় আছে। যে সংসারের রহস্য বুঝিয়াছে, তাহাকে চিরকাল এই যন্ত্রণায় থাকিতে হইবে না। তাহার পক্ষে আশাবাণী আছে। ওই যে প্রাণের ভিতর—কেমন করে মায়ার পারে যাব, এই ইচ্ছা হয়েছে, ঐ হচ্চে প্রমাণ যে, পারে যেতে পারা যাবে। যে পরিমাণে এই ইচ্ছার, এই শুভ বাসনার বিকাশ, সেই পরিমাণে উহার উপলব্ধি।

সংসারের কপটতাটা আগে ছাড়তে হবে। আমাদের জীবন বড় আইন কানুন সভ্যতা শিষ্টাচারে বেষ্টিত কিন্তু এই সভ্যতা শিষ্টতা, বাহিরে মধুর হাঁসি, সুখের রাশির ভিতর কি? ভেতরে জ্বলছে তুষানল, যেগুলিকে নীচ প্রবৃত্তি বলে অথবা যাহাকে নীচ প্রকৃতি বলা যায়,—তারই রাজত্ব। কামনা যার আছে, সে নীচ, ছোট লোক, তা আর বোলতে। মন, একবার ভরসা করে, ভেতরবার এক করে ফেল দেখি। বলুক লোকে পাগল, বলুক লোকে ভ্রান্ত, লোকের তোয়াক্কা কি? লোকে তোকে কি সাহায্য কত্তে পারে? তুই আপনি ভাল থাক্‌লেই জগৎ ভাল, সব ভাল।

সত্য কি, জানলুম না, কেবল ঘুরে মলুম। সময় পেলুম না, সত্য কি জান্‌তে আর সব কাযের সময় পেলুম। হায় হায়, আপনার গালে আপনি চড়াতে ইচ্ছা করে যে। মন, এখনো বোঝ্‌, বিচারবান পুরুষদের সঙ্গ কর্‌। একটু স্থির হয়ে ভাব্‌তে শেখ্‌—কর্ম্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে শেখ্‌।"

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকার বিশেষণযুক্তপুরুষকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই বল' হইতেছে। "কবি" অতীতদর্শী (অর্থাৎ) সর্ব্বজ্ঞ, "পুরাণ" চিরন্তন, "অনুশাসিতা" সকল জগতের প্রশাসিতা, "অণু" সূক্ষ্ম হইতেও "অণীয়ান্" সূক্ষ্মতর, "সকলের ধাতা" সকল প্রকার কর্ম্মফলের বিভাগকারী, বিচিত্র কর্ম্মফলনিচয়ের যথাযোগ্য বিভাগপূর্ব্বক প্রদাতা, "অচিন্ত্যরূপ" যাঁহার রূপ নিয়ত হইলেও কেহই চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে না, "আদিত্যবর্ণ" আদিত্যের ন্যায় নিত্যচৈতন্যপ্রকাশরূপ বর্ণ যাঁহার আছে, তিনিই আদিত্যবর্ণ, এই প্রকার বিশেষণযুক্ত পুরুষকে যে কোন ব্যক্তি অনুসরণ করে, সেই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই পূর্ব্ব বাক্যের সহিতই ইহার সংবন্ধ আছে। ৯।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়। প্রয়াণকালে অচলেন মনসা ভক্ত্যা যোগবলেন চ যুক্তঃ ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য চ স তং পরং দিব্যং পুরুষং উপৈতি। ১০।

মূলানুবাদ। মরণকালে নিশ্চলহৃদয় সেই ব্যক্তি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ আবিষ্ট করিয়া ভক্তি এবং যোগবলে সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

ভাষ্য। কিঞ্চ প্রয়াণকালে মরণকালে মনসাঽচলেন চলনবর্জ্জিতেন ভক্ত্যা যুক্তো ভজনং ভক্তিঃ তয়া যুক্তো যোগবলেন চৈব যোগস্য বলং যোগবলং তেন সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতচিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যক্ অপ্রমত্তঃ সন্ সএবং বুদ্ধিমান্ যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষং উপৈতি প্রতিপদ্যতে দিব্যং দ্যোতনাত্মকম্। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। প্রয়াণকালে অর্থাৎ মরণকালে নিশ্চলহৃদয়ে ভক্তিযুক্ত ও যোগবলযুক্ত হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ীদ্বারা ভূমিজয়ক্রমে প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া সম্যক্ অপ্রমত্ত সেই বুদ্ধিমান যোগী, সেই কবিপুরাণ ইত্যাদি নামের প্রতিপাদ্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই পুরুষ দিব্য—অর্থ

দ্যোতনাখ্য। এই শ্লোকে ভক্তিশব্দের অর্থ ভজন, যোগের বল এই তাৎপর্য্যে যোগবল এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, সমাধিসংস্কারসমূহের দ্বারা উৎপাদিত যে চিত্তস্থৈর্য্য, তাহাই এই স্থলে যোগবল শব্দের অর্থ। যোগীর এই প্রকার অবস্থার পূর্ব্বে হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারণা দ্বারা চিত্তকে বশীকৃত করিতে হয়, তাহার পর ভূমিজয় ও সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রাণকে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিতে হয়। (ভূমিজয় শব্দের অর্থ পঞ্চভূতের বশীকরণ)। ১০।

যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়োবীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

অন্বয়। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি বীতরাগা যতয়ঃ যৎ বিশন্তি যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

মূলানুবাদ। বেদবিদ্‌গণ যে অবিনাশি বস্তুর বর্ণনা করিয়া থাকেন, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ যে পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া (ব্রহ্মচারিগণ) ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সংক্ষেপে সেই (ব্রহ্ম)পদ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিতেছি। ১১।

ভাষ্য। পুনরপি বক্ষ্যমানেন উপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণো বেদবিদ্‌বদনাদিবিশেষণবিশেষ্যস্যাভিধানং করোতি ভগবান্। যদক্ষরং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং অবিনাশি বেদবিদো বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। "তদ্বাএতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি"। ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তকত্বেন অভিবদন্তি। অস্থূলমনণু ইত্যাদি। কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগ্‌দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং যদ্‌যতয়ঃ যতনশীলাঃ সংন্যাসিনঃ বীতরাগা বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্তি তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ তেন সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। যাহাকে বুঝিবার জন্য, অর্জ্জুন, অভিলাষী বেদবিদ্‌গণ যাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি নানা বিশেষণের যাহা বিশেষ্য, সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব বক্ষ্যমাণ উপায়ের দ্বারা ভগবান্ পুনর্ব্বার প্রতিপাদন করিতেছেন। যাহার ক্ষরণ অর্থাৎ ধ্বংস হয়, তাহাকে ক্ষর কহে, যাহা ক্ষর নহে, তাহাই অক্ষর।

"বেদবিদ" বেদার্থজ্ঞব্যক্তিগণ যাহাকে "অক্ষর" অবিনাশী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন (কারণ) শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই পরমাত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন" অর্থাৎ সকল প্রকার ভেদবিনির্ম্মুক্ত, এইকারণ তাহা স্থূল নহে সূক্ষ্মও নহে, ইত্যাদি প্রকারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আরও 'যতি' প্রযত্নপর সংন্যাসিগণ "বীতরাগ" (অর্থাৎ যাহাদের রাগ নিবৃত্ত হইয়াছে) হইয়া সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্তির পরে যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যে অক্ষরকে ('বুঝিবার জন্য" এই অংশটুকু বাক্যের মধ্যে পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে) অভিলাষ করিয়া (ব্রহ্মচারিগণ) গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই"অক্ষরনামকপদ" (চরমগন্তব্য বস্তু) আমি তোমাকে সংগ্রহে বলিতেছি—সংগ্রহ শব্দের অর্থ সংক্ষেপ অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতেছি, ইহাই তাৎপর্য্য। ১১।

ভাষ্য। "স যোহবৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ইতি তস্মৈ স হোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" ইত্যুপক্রম্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত" ইত্যাদিনা বচনেন "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" ইতি চ উপক্রম্য "সর্ব্বে বেদাযৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওঁ ইত্যেতৎ॥" ইত্যাদিভিশ্চবচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎপ্রতীকরূপেণ চ পরব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্য ওঁকারস্য কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেব ইহাপি "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং" "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইতি চ উপন্যস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণ পূর্ব্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্য ওঁকারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং প্রসক্তানুপ্রসক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে (আগের ভাষ্য)—। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। "হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করিয়া থাকে, সে কোন্ লোককে জয় করিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ তিনি তাহাকে বলিলেন যে, হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার, ইহা পর ও অপর" উপক্রমে এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি এই ত্রিমাত্র ওঁকারের দ্বারা সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে," ইত্যাদি; আবার শ্রুতির অন্যস্থানে—"যাহা ধর্ম্মের দ্বারা পাওয়া

যায় না ও যাহা অধর্ম্মের দ্বারাও পাওয়া যায় না” এই প্রকার উপক্রম করিয়া পরে অভিহিত হইয়াছে যে, “সকল বেদ যে পদকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সকল তপস্যা যাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করে, যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই পদ আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। ওঁকারই সেই পদ”। এই সকল বচন দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ওঁকার পরব্রহ্মের বাচক এবং প্রতিমাদির ন্যায় ওঁকার পরব্রহ্মের ধ্যেয়মূর্ত্তি। যাহারা মন্দবুদ্ধি অথবা মধ্যমবুদ্ধি, তাহাদের পক্ষে এইভাবে ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই যে বিষয়টী বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এইক্ষণে প্রতিপাদন করিবার জন্য উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে। (শুধু বেদে কেন) এই গীতা শাস্ত্রেও “কবি পুরাণ ও অনুশাসিতা” “বেদবিদ্গণ যে অক্ষর বিষয়ে উপদেশ দেন” ইত্যাদি বাক্যে যে পরব্রহ্মের উপন্যাস করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের প্রতিপত্তির সাধন ওঁকার পূর্ব্বোক্তপ্রকারে হইয়া থাকে, সেই ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপফলের সাধন হয়, তাহাই এইক্ষণে যোগধারণার সহিত বলিতে হইবে এবং তাহার প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিতে হইবে, এই কারণে উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ করা হইতেছে, (দ্বাদশ শ্লোকের আশয় ভাষ্য)। ১২।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।

মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২॥

অন্বয়। সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য হৃদি মনো নিরুধ্য আত্মনঃ প্রাণং মূর্দ্ধ্নি আধায় চ যোগধারণামাস্থিতঃ (ভবেৎ)। ১২।

মূলানুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিয়া ও আত্মপ্রাণ মূর্দ্ধদেশে আহিত করিয়া (সাধক) যোগ ধারণাকে অবলম্বন করিবে।

ভাষ্য। সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণি উপলব্ধৌ, তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা মনোহৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা নিষ্প্রচারতামাপাদ্য তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্দ্ধ্বগামিন্যা নাড্যা ঊর্দ্ধমারুহ্য মূর্দ্ধনি আধায় আত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুং। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। সর্ব্বদ্বার অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ ইন্দ্রিয়রূপ সকল দ্বারকে সংযত করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তাহার

বিক্ষেপ বন্ধ করিয়া সেইস্থানে বশীকৃত অন্তঃকরণের দ্বারা হৃদয় হইতে উর্দ্ধ-গামিনী নাড়ীর ভিতর দিয়া উর্দ্ধে মূর্দ্ধদেশে আপনার প্রাণকে তুলিয়া যোগ-ধারণা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত (হইবে)। ১২।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥

অন্বয়। ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (তথা) মাং অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি স পরমাং গতিং যাতি। ১৩।

মূলানুবাদ। (তাহার পর) ওঁ এই অক্ষররূপ ব্রহ্মটী উচ্চারণ করত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহপরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩।

ভাষ্য। তত্রৈব চ ধারয়ন্ ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূত-মোঙ্কারং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্ তদর্থভূতং মামীশ্বরং অনুস্মরন্ অনুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং ত্যজন দেহমিতি প্রয়াণ-বিশেষণার্থং দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেন ইত্যর্থঃ। স এবং ত্যজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। সেই স্থানেই প্রাণকে স্থাপিত করিয়া যে ব্যক্তি ওঁ এই একটী অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচকশব্দটীকে উচ্চারণ করিয়া এবং সেই ওঁকারের অর্থ ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে "দেহ" শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যুলাভ করে, এখানে দেহ পরিত্যাগ করা বিষয়ে যে কথা বলা হইল, তাহা দ্বারা মৃত্যুরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেহের সহিত সম্বন্ধনাশই আত্মার মৃত্যু, আত্মার স্বরূপ নাশের দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে না (কারণ আত্মা অবিনাশী) এই প্রকার ভাবে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রয়াণ করে, সে "পরম" প্রকৃষ্ট গতিকে লাভ করিয়া থাকে। ১৩।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥

অন্বয়। হে পার্থ! সততং অনন্যচেতাঃ (সন্) যো মাং নিত্যশঃ স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ। ১৪।

মূলানুবাদ। হে পার্থ, সর্ব্বদা অনন্যচেতা হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ হই। ১৪।

ভাষ্য। কিঞ্চ অনন্যচেতাঃ নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়মনন্যচেতা যোগী সততং সর্ব্বদা যোমাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ। সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে। ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা কিংতর্হি যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ পার্থ। নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ। যত এবমতোঽনন্যচেতাঃ সন মযি সদা সমাহিতো ভবেৎ। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। আরও "অনন্যচেতাঃ" অন্য বিষয়ে যাহার চিত্ত থাকেনা। সেই ব্যক্তিই অনন্যচেতাঃ। এইরূপ অনন্যচেতাঃ যে যোগী "সতত" সর্ব্বদা আমাকে (অর্থাৎ) পরমেশ্বরকে নিত্য স্মরণ করিয়া থাকে। সতত এই শব্দের দ্বারা নৈরন্তর্য্য কথিত হইতেছে নিত্যশঃ এই শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া। ছয়মাস নহে, একবৎসর নহে, কিন্তু যতদিন বাঁচিবে, ততদিন নিরন্তর যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। সেই "নিত্যযুক্ত" সর্ব্বদা সমাহিত যোগীর, হে পার্থ, আমি সুলভ অর্থাৎ অনায়াসলভ্য। যে কারণ এইরূপ, এইজন্য আমাতে অনন্যচেতা হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত হইবে।১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়। মহাত্মানঃ মাং উপেত্য পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (সন্তঃ) দুঃখালয়ং অশাশ্বতং জন্ম পুনর্ন প্রাপ্নুবন্তি। ১৫।

মূলানুবাদ। মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমসিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য জন্মলাভ করেন না। ১৫।

ভাষ্য। তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ভবতি মামুপেত্য মাং ঈশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপন্ন পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি কিং বিশিষ্টং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি তদ্বিশেষণমাহ দুঃখালয়ং দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং আলয়ং আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি ইতি দুঃখালয়ং জন্ম। ন কেবলং দুঃখালয়মশাশ্বতং অনবস্থিতস্বরূপং চ নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানঃ যতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং পরমাং প্রকৃষ্টাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। তুমি সুলভ হইলে কি হয়? ইহারই উত্তর দেওয়া যাইতেছে। আমি সুলভ হইলে যাহা হয়, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর। আমাকে (অর্থাৎ) ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আমার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া "পুনর্জন্ম" পুনরুৎপত্তি লাভ করে না। সে পুনর্জন্ম কিরূপ, যাহাকে প্রাপ্ত হয় না? তাহার বিশেষণ বলিতেছেন, "দুঃখালয়" আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখের আলয়; যাহাতে সকলপ্রকার দুঃখ আলীন থাকে,সেই জন্মকেই দুঃখালয় বলা যায়। কেবল দুঃখালয়ই যে, তাহা নহে, "অশাশ্বত" অনবস্থিতস্বভাব। যাঁহারা "মহাত্মা" যতি সংন্যাসী, তাঁহারা এই প্রকার পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। (কেন?) যে হেতুক তাঁহারা মোক্ষনামক প্রকৃষ্টসংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়, তাহারাই সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ১৫।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (ভবন্তি) হে কৌন্তেয়, মাং উপেত্য তু পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ১৬।

মূলানুবাদ। হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোকের সহিত সকললোকই এ সংসারে পুনর্ব্বার আবর্ত্তন করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬।

ভাষ্য। কিং পুনস্ত্বত্তোঽন্যৎপ্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে? ইত্যুচ্যতে আব্রহ্ম-ভুবনাৎ ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানি ইতি ভুবনং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোকঃ। ইত্যর্থঃ। আব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ; হে অর্জ্জুন, মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। তবে তুমি ছাড়া অন্য কাহাকেও পাইলে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়? তাহারই উত্তর এই হইতেছে যে, "ব্রহ্মভুবন" যাহাতে প্রাণিগণ উৎপত্তি লাভ করে, তাহার নাম ভুবন; ব্রহ্মের (চতুরাননের) ভুবন ব্রহ্মভুবন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মভুবন হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের সহিত আর সকল লোকই পুনরাবর্ত্তী অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তনস্বভাব। হে অর্জ্জুন! আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কিন্তু হে কৌন্তেয়, পুনরুৎপত্তি হয় না। ১৬।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণোবিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাম্‌তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। অহোরাত্রবিদো জনা যৎ সহস্রযুগপর্য্যন্তং তদ্ব্রহ্মণঃ অহর্বিদুঃ (তথা) যুগসহস্রান্তাং (ব্রহ্মণো) রাত্রিং বিদুঃ।১৭।

মূলানুবাদ। অহোরাত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ জানিয়াছেন যে, ব্রহ্মার দিন এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত, এবং ব্রহ্মার রাত্রিও এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত। ১৭।

ভাষ্য। ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্ত্তিনঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথম্ সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তঃ পর্য্যবসানং যস্যাহ্নঃ তদহঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতের্বিরাজঃ বিদুঃ রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তাং অহঃপরিমাণামেব। কে বিদুরিত্যাহ তে অহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদঃ জনা-ইত্যর্থঃ। যত এবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেঽতএব পুনরাবর্ত্তিনঃ লোকাঃ। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মলোকের সহিত সকল লোকই কেন পুনরাবর্ত্তন করে? যেহেতুক সকললোকই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিরূপ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন? তাহাই বলা হইতেছে। "সহস্র যুগ পর্য্যন্ত" সহস্র যুগ যাহার পর্য্যন্ত অর্থাৎ পর্য্যবসান, তাহার নাম সহস্রযুগপর্য্যন্ত। অহঃ অর্থাৎ দিন, ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতিবিরাজের দিনের পরিমাণ এক সহস্র যুগ, তাঁহার রাত্রিও এইরূপ যুগসহস্রপর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার দিনের যাহা পরিমাণ, রাত্রিরও সেই পরিমাণ। এই পরিমাণ কাহারা জানে? সেই অহোরাত্রবিদ্ অর্থাৎ কাল-পরিমাণজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রকার ব্রহ্মার দিন রাত্রির পরিমাণ জানেন। যে কারণে ঐ সকল লোক কালপরিচ্ছিন্ন, এই কারণেই তাহারা পুনরাবর্ত্তন-স্বভাব, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। অহরাগমে সর্ব্বাব্যক্তয়ঃ অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি রাত্র্যাগমে তত্রৈব অব্যক্তসংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে। ১৮।

মূলানুবাদ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলব্যক্তিই সেই ব্রহ্মের দিনকালে অব্যক্ত হইতে প্রকাশিত হয় এবং রাত্রির আগমনে আবার তাহারা সেই অব্যক্তে বিলীন হয়। ১৮।

ভাষ্য।—প্রজাপতেরহনি যদ্ ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে। অব্যক্তাৎ অব্যক্তং-

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্বপ্রকাশিতের পর।]

একাদশ অধ্যায়। দীক্ষা।

এই অনিষ্টপাতের অন্যূন ছয় মাস পূর্ব্বে রামানুজকে আর এক বিষম মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। পুত্রপ্রাণা পতিপরায়ণা কান্তিমতী পুত্রের মায়া কাটাইয়া পতিপদতলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজপত্নী জমাম্বা একণে গৃহিণী। তিনি পরমরূপবতী ছিলেন। স্বাভাবিক পতিভক্তি থাকিলেও, বাহিক আচার প্রতিপালনে বা দেহের শৌচ ও সৌষ্ঠব বিধানে তাঁহার অধিকতর ভক্তি ছিল। আপনার স্বার্থে হস্ত না পড়িলে, তিনি সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা পতিকে যথাসাধ্য প্রীত ও সন্তুষ্ট করিতে যত্নবতী হইতেন।

কাঞ্চিপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি রামানুজের গৃহকর্ম্মে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া জমাম্বা অন্তরে তাদৃশ সুখী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। হৃদয়ে রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও, বাহিরে তাহার কোনও আকার প্রকাশ করিতেন না।

রামানুজ অধিকাংশ কালই শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিকট থাকিতেন। তাঁহার বদন সর্ব্বদাই মলিন, মনে তাদৃশ সুখ নাই। কাঞ্চিপূর্ণ ইহা দেখিয়া একদা তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "বৎস, মনে কষ্ট পাইও না। শ্রীবরদরাজে ভক্তিমান্ হও। তাঁহার সেবার জন্য যেমন প্রতিদিন জল আনয়ন করিতেছ, সেইরূপ কর। তাঁহার প্রসাদে পরম মঙ্গল হইবে। আলওয়ান্দারের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, এইজন্যই তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে নিত্যশান্তি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার সম্মুখে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, একণে তাহা সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হও।" ইহাতে রামানুজ কহিলেন, "আপনি আমায় শিষ্য করুন। আপনার পদচ্ছায়ায় আমায় বিশ্রাম করিবার অনুমতি দিন।" এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ ব্যস্ত হইও না। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। শূদ্রের ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের অধিকার নাই। ভবিষ্যতে আর আমার সম্মুখে এরূপ প্রণাম করিও না। শ্রীমন্নারায়ণ তোমার জন্য শীঘ্রই গুরু প্রেরণ করিবেন। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না।" ইহা কহিয়া কাঞ্চিপূর্ণ মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রামানুজ মনে মনে ভাবিলেন যে, ইনি আমায় হীন-অধিকারী বিবেচনা করিয়া কৃপা করিতেছেন না। যাহা হউক, আমি উঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। যিনি বরদরাজের সহিত অহরহ বিহার করেন, তাঁহার আবার জাতি কুল কি? তাঁহার কটাক্ষে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে।" ইহা ভাবিয়া তিনি সেই দিবস সায়ংকালে কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিয়া অতি অনুনয় সহকারে পরদিবস তাঁহার আলয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন, "কল্য আমি তোমার স্থায় পরমভক্তের অন্নগ্রহণ করিয়া রজস্তমোময় আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিব এবং তাহা হইলে শ্রীমন্নারায়ণ আর কখনও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিবেন না। অহো! আমার পরম সৌভাগ্য।

শ্রীরামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে পরদিবস প্রাতঃকালে উত্তম পাক করিতে কহিলেন। তিনি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া জমাম্বা স্নান সমাপনান্তে পাক আরম্ভ করিলেন। বেলা এক প্রহর না হইতে হইতেই নানাবিধ ব্যঞ্জন সহিত অন্ন রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। রামানুজ তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কাঞ্চি-পূর্ণকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীমদ্বরদরাজসেবক রামানুজের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অন্যপথ দিয়া তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন, এবং জমাম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতা, অদ্য আমায় শীঘ্র শীঘ্র মন্দিরে যাইতে হইবে; যাহা কিছু পাক হইয়াছে তাহাই সন্তানকে অর্পণ করুন। আমি কালবিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আপনার ভর্ত্তা কোথায়?" জমাম্বা ইহা শুনিয়া কহিলেন, "মহাত্মন, তিনি আপনার অন্বেষণেই গমন করিয়াছেন, এখনই আসিবেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।" কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "না মা, আমি একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমি স্বীয় উদর ভরণার্থ প্রভুর সেবায় অবহেলা করিতে পারিব না।" জমাম্বা ইহা শুনিয়া, পাছে অভ্যাগত বিমুখ হইয়া যান, সেইভয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, কাঞ্চিপূর্ণকে আসন ও পাদার্ঘ-উদক অর্পণ করিলেন, এবং যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় একে একে পরিবেশন করিয়া নিমন্ত্রিতকে বহুসমাদরে ভোজন করাইলেন। আহার শেষ হইলে কাঞ্চিপূর্ণ স্বয়ং উচ্ছিষ্ট পত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্থানকে গোময়লিপ্ত

করিলেন এবং মুখশুদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক জমাম্বাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহিণী আহার্য্যের অবশিষ্টাংশ কোনও শূদ্রকে দিয়া পাত্রাদি মার্জ্জিত করিয়া লইলেন, এবং পাকগৃহ সংস্কার পূর্ব্বক স্নান করিয়া আসিয়া ভর্ত্তার জন্য পুনঃ পাক আরম্ভ করিলেন।

রামানুজ প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার গৃহিণী সদ্যঃস্নাতা হইয়া পুনরায় পাককার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যাহা কিছু পাক করা হইয়াছিল, তাহার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন? তুমি পুনরায় পাক করিতেছ কেন? প্রাতঃকাল হইতে যাহা রন্ধন করিয়াছিলে, সে সমুদয় কোথায়?" জমাম্বা উত্তর করিলেন, "মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম কিন্তু তিনি ভগবৎসেবার জন্য শীঘ্র মন্দিরে যাইবেন বলিয়া এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং আমি তোমার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে, যাহা পাক করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই দিয়াছি। তাঁহার ভোজন সমাপ্তির পর তিনি স্বয়ংই স্থান পরিষ্কার করিলেন, এবং আমিও যে সকল অন্ন ব্যঞ্জন অবশিষ্ট ছিল, তাহা শূদ্র প্রতিবেশিনীকে দিয়াছি এবং তোমার জন্য পুনরায় স্নান করিয়া পাক করিতেছি। শূদ্রের ভুক্তাবশিষ্ট তোমায় কি করিয়া দিই বল?" ইহাতে রামানুজ নিরতিশয় ব্যথা পাইলেন, এবং অতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অয়ি মূঢ়ে, তোমার কোনও কার্য্যা কার্য্য বিচার নাই। তুমি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অতি ক্ষুদ্রচিত্তের কর্ম্ম করিয়াছ। আমার অদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের প্রসাদ ঘটিল না। আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন।" এই বলিয়া ক্ষোভে মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে বৃক্ষমূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে কাঞ্চিপূর্ণ বরদরাজকে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভো, এ তোমার কি ব্যবহার? আমি তোমার ও তোমার ভক্তের দাস্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, তাহা না হইয়া কি না আমায় একটা মহাপুরুষ করিয়া তুলিলে? সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার শ্রীমান্ রামানুজ আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত হইয়া, অদ্য আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোথায় আমি তোমার ও তোমার ভক্তগণের চিরস্থর পূজা করিব, তাহা না হইয়া স্বয়ংই পূজ্য হইতে চলিলাম? অনুমতি কর, আমি তিরুপতিতে গিয়া তোমার বালাজী মূর্ত্তির সেবা করি।" বরদরাজ,

আজ্ঞা দিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তিরুপাতিতে গমন করিয়া বালাজীর সেবায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। পরে এক দিবস নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, "কাঞ্চিপুরে গ্রীষ্মাতিশয্যে আমি অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছি। তুমি সেইখানে যাইয়া আমাকে ব্যজন কর।" ইহাতে কাঞ্চিপূর্ণ পুনরায় কাঞ্চিপুরে আগমন করিলেন।

ইতিমধ্যে এক তৈলস্নান দিবসে* আহারাভাবে শীর্ণকলেবর শূদ্রদাস রামানুজের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে আসিলে, তাহাকে দেখিয়া তাঁহার করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে কহিলেন, "যদি গতদিবসের পর্য্যুষিত অন্ন থাকে, তাহা হইলে এই দরিদ্রদাসকে দাও। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন এ তিন চারিদিবস অনাহারে রহিয়াছে।' তাহাতে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "পর্য্যুষিত অন্ন কিছুই নাই। এত প্রাতে অন্ন কোথায় পাইব?" ইহা কহিয়া তিনি স্নানার্থে প্রস্থান করিলেন। শ্রীরামানুজ ভার্য্যার বাক্যে সন্দেহ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, প্রভূত পর্য্যুষিত অন্ন রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় দাসকে দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিপূর্ব্বক তৈলমর্দ্দন করিতে অনুমতি দিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ তিরুপতি হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া রামানুজ তাঁহাকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। বহুকালের পর পরমমিত্রকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। নানাবিধ বাক্যালাপের পর রামানুজ বরদসেবককে কহিলেন, 'মহাত্মন্, কতিপয় সন্দেহ আমার হৃদয়কে নিরন্তর উদ্বেলিত করিতেছে। আপনি বরদরাজকে কহিয়া সেই সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিলে, আমি শান্তি লাভ করি। নতুবা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দুঃখের কথা আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে কহিব?" কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "আমি প্রভুকে এবিষয় নিবেদন করিব।"

পর দিবস রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, "বৎস, তোমার সম্বন্ধে গতরজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ কহিয়াছেন,—

"অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে ॥

---

* প্রতি সপ্তাহে আপাদমস্তক তৈলে সিক্ত করিয়া উষ্ণোদকে স্নান দাক্ষিণাত্যবাসিদের চিরন্তন প্রথা। ইহাকেই তৈলস্নান কহে।

মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে॥
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্।
ইতি রামানুজার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্॥"

"(১) আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ, পরব্রহ্ম। (২) হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ (৩) মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণই একমাত্র মুক্তির কারণ। (৪) মদীয় ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। (৫) দেহ ত্যাগ হইলেই আমার ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (৬) সর্ব্বগুণসম্পন্ন, মহাত্মা, মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি এই সকল কহিয়াছি, ইহা শীঘ্র তুমি রামানুজাচার্য্যকে গিয়া বল।"

ইহা শুনিয়া রামানুজ উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে উন্মূলিত হইয়া গেল। এ সমুদয় সন্দেহের কথা তিনি কাঞ্চিপূর্ণকে কিছুই বলেন নাই। উক্ত মহাপুরুষ সত্যই বরদরাজের মুখস্বরূপ। নিষেধ করিলেও তিনি সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া, শ্রীরঙ্গমে মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এদিকে আলওয়ান্দারের অদর্শনের পর হইতে, শ্রীরঙ্গমের মঠে সেরূপ সুমধুরভাবে শাস্ত্রের রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে আর কেহই সমর্থ হইতেন না। তিরুবরঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি পরম ভাগবত ও বহুশাস্ত্রদর্শী, কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তাঁহার তাদৃশ পটুতা ছিল না। তাঁহার অধিকাংশ সময় ভগবদারাধনাতেই যাইত। তাঁহার পরমদাস্য ভাবে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কাহাকেও কোন আদেশ করা দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই অন্যের আদেশ-পালনে ব্যগ্র। তাঁহার দেবতুল্যস্বভাব সকলকেই বশীভূত করিয়াছিল। মঠে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় প্রকারেরই ভক্ত থাকিতেন। বিবাহিতগণের ভার্য্যা মঠের বাহিরে, নগরে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তবন্দনার্থ তথায় আসিতেন। মঠস্থ ভক্তগণ ভগবদারাধনা ও তন্নামসংকীর্ত্তনে দিবস অতিবাহিত

করিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল। পরে একদিবস তিরু-বরাঙ্গ সমুদয় ভক্তগণকে মিলিত করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, অদ্য একবৎসর হইল, আমাদের প্রাণস্বরূপ মহাত্মা যামুনমুনি পরমপদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার অদর্শনাবধি আমরা সেই সুমধুর ভাষায় ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন, ও শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে বঞ্চিত রহিয়াছি। যদিও সেই মহাপুরুষ এই ক্ষুদ্র দাসের উপর তোমাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, এবং সুতরাং ইহা বহনযোগ্য, তথাপি এক্ষণে বুঝিতেছি, আমার ন্যায় হীনবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বহনীয়। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, মহামুনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাঞ্চিপুরস্থ শ্রীমান রামানুজকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য মহাপূর্ণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পণ্ডিতপ্রবর, কাঞ্চিপূর্ণপ্রিয়, যামুনমুনিনির্ব্বাচিত মহাপুরুষই এইভার বহন করিবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। আমাদের মধ্যে কেহ যাইয়া তাঁহাকে পঞ্চসংস্কার যুক্ত করতঃ দীক্ষা দিয়া এখানে আনয়ন করুন। তিনিই যামুনমুনির মত সমগ্রভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। সমাধি-স্থলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং মুনিবরের মুষ্টিমোচন এখনও আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

সমবেত ভক্তমণ্ডলি ইহা শুনিয়া একবাক্যে তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন, এবং রামানুজকে দীক্ষা দিয়া শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিবার জন্য মহা-পূর্ণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন; "যদি কাঞ্চিপূর্ণের সহবাস ত্যাগ করিতে আপাততঃ তাঁহার অনিচ্ছা দেখ, তাহা হইলে তাঁহাকে আসিবার জন্য কোনও অনুরোধ করিও না। শ্রীরঙ্গনাথের ইচ্ছায় তাঁহাকে এখানে আসিতেই হইবে, শীঘ্রই হউক, বা কিছু বিলম্বেই হউক। তুমি তাঁহাকে তামিলপ্রবন্ধ অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শী করিও। তজ্জন্য তোমার অন্যূন একবৎসরকাল তথায় থাকিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা যে, তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া যাও। আমরা যে তোমায় তাঁহাকে এখানে আন-য়নের জন্য প্রেরণ করিয়াছি, ইহা যেন তিনি কিছুই জানিতে না পারেন।" এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। দিবস-দ্বয় গমন করিয়া তাঁহারা মদুরান্তক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এক সুবৃহৎ সরোবর। তাহারই তীরে তিনি সস্ত্রীক বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন যে, যাঁহার জন্য তিনি মঠ ত্যাগ

করিয়া কাঞ্চিপুরে গমন করিতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যগ্র হইয়াছিল, সেই রামানুজ স্বয়ংই আসিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। অকস্মাৎ প্রিয় ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। পরে রামানুজকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি তোমায় এখানে দেখিতে পাইব, এরূপ আশাই করি নাই। সকলই শ্রীমন্নারায়ণের কৃপা। তোমার এস্থানে আসিবার কারণ কি?" রামানুজ কহিলেন, "সত্যই ইহা নারায়ণের অত্যন্ত কৃপা। আমি আপনারই শ্রীপাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়াছি। বিধাতা অনায়াসেই তাহা মিলাইয়া দিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের মুখ দিয়া সাক্ষাৎ বরদরাজ আপনাকেই আমার গুরুরূপে স্থির করিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে আমায় দীক্ষা-দ্বারা পবিত্র করুন।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "চল, আমরা সকলে কাঞ্চিপুরে গিয়া বরদরাজের সম্মুখে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করি।" ইহাতে রামানুজ কহিলেন, "মহাত্মন্, আমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে রুচি হইতেছে না।

স্বপন্তমপি ভুঞ্জানং গচ্ছন্তমপি বর্ত্মনি।
যুবানমপি বালম্বা স্ববশে কুরুতে বিধিঃ॥

দেখুন, মৃত্যুর সময়াসময় জ্ঞান নাই। মনুষ্য নিদ্রিতই হউক, ভোজনই করুক, পথেই গমন করুক, যুবকই হউক, বা বালকই হউক, মৃত্যু সকল অবস্থাতেই তাহাকে আপনার বশে আনয়ন করেন। আপনার সহিত, কত আশা করিয়া যামুনমুনিকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, দগ্ধ বিধাতা সে আশা আমার পূর্ণ করে নাই। এখনই বা তাহাকে বিশ্বাস কি? সুতরাং আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমায় আপনার পদতলের ছায়ায় আশ্রয় দিন।" মহাপূর্ণ এই সুমধুর বৈরাগ্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, এবং শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে বৃহৎ সরোবরতীরস্থ বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট কুসুমিত, সৌরভসমাকীর্ণ পরমরমণীয় বকুলতরুর মূলে, আহবনীয়াগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে দুইটি আয়সী মুদ্রা স্থাপন করিলেন। তাহাদের মধ্যে একটী চক্রচিহ্নিত ও একটি শঙ্খচিহ্নিত। মুদ্রাদ্বয় উত্তপ্ত হইলে, মহাপূর্ণ শ্রৌত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চক্রচিহ্নিতের দ্বারা রামানুজের দক্ষিণবাহুমূল এবং শঙ্খচিহ্নিতের দ্বারা বামবাহুমূল অঙ্কিত করিলেন, ও পরিশেষে আলওয়ান্দারের শ্রীচরণধ্যান পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে বৈষ্ণব মন্ত্র অর্পণ করিলেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুবন্দনপূর্ব্বক রামানুজ, গুরু এবং গুরুপত্নীর সহিত কাঞ্চিপুরে গমন করিলেন।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণের শুভাগমনসম্বাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। ভক্তসম্মিলনে পরম আনন্দের উদয় হইল। রামানুজের অনুরোধে মহাপূর্ণ তাঁহার পত্নী জমাম্বাকেও শঙ্খ ও চক্রদ্বারা অঙ্কিত করিলেন। এইরূপে পতি পত্নী উভয়েই দীক্ষিত হইয়া, মহাপূর্ণের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন। রামানুজ স্বীয় গৃহের অর্দ্ধাংশে মহাপূর্ণের আবাসবাটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিন তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তামিল্ প্রবন্ধ পাঠ করিতে থাকিলেন। (ক্রমশঃ)

ধ্রুবচরিত্র।

প্রথম অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুনীতির কুটীর, ভূমিতলে অর্দ্ধশয়ানা সুনীতি।)

সুনী। কি জানি কোন্ দিকে ভেসে যায় প্রাণ।
না মানে উজান, না মানে তুফান।

(গাহিতে গাহিতে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। সাগরসঙ্গমে বুঝি হয় ধাবমান?

সুনী। সাগরে তুফান আছে, যাবনা সাগর কাছে,
ভাঙ্গিবে হৃদয়তরী তরঙ্গ প্রহারে,

তপ। প্রেম নাবিক হৃদয়ে, আছে যার সে কি ভয়ে,
ফিরায় তরণী সই তরঙ্গ নেহারে।

সুনী। সাগর লবে না তরী, ডুবাবে নয় দিবে ফিরি,
ডুবিলে অতল জলে কে রাখে আমারে,

তপ। হরে মুরারে, হরে মুরারে।

তপ। ম্লান কেন হেরি আজ ও মুখ পঙ্কজ?
কেন সই এত ভাব দিবানিশি?
গোমুখীর জলস্রোত
বহে অবিরাম নয়ন হইতে;
সম্বর সম্বর সই নীরব রোদন।
চেয়ে দেখ মম মুখপানে, সই,

শোক দুঃখ পরাজয় মানিয়াছে,
তাই, আনন্দে নাচিছে প্রাণ দিবানিশি।

সুনী। ভগিনি!
নহে এ নীরব দুঃখের রোদন,
শোকে শুধু বারিধারা বহে না নয়নে,
জান ত, সজনি!
প্রেমানন্দে কভু কভু আঁখি ভাসে নীরে।
আজ মম বিগত প্রেমের জোয়ার,
হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গি,
দুকুল নয়ন বহি বহে অবিরত।
ভগিনি! ভাবি দিবানিশি,—
বিরহ যন্ত্রণা নহে এ ভাবনা।
বনবাস ক্লেশে,
ভাবি সেই স্বামীর চরণ দুটী;
এ ভাবনা অনন্ত সুখের—
অমৃতের মহা সিন্ধু,
তাহে প্রাণ দিতেছে সাঁতার।
সত্য বটে, বারি ধারা ঝরিছে নয়নে,
সত্য বটে, দিবানিশি
বহিছে সুদীর্ঘ শ্বাস,—
কিন্তু এ ক্রন্দনে, নীরব নিশ্বাসে,
ঢালে প্রাণে মধুর আশ্বাস।

তপ। ধন্যা নারী তুমি।
স্বামী তোমা দিল বনবাসে,
তথাপিও একদিন
তিলমাত্র অসন্তোষ নাহি প্রকাশিলে।
বনবাস— বিনা দোষে বনবাস!
স্ত্রৈণ রাজা, রূপের কিঙ্কর,
নাহি জানে গুণের মহিমা,
নাহি জানে প্রণয় কি ধন,

তোমা হেন অমূল্য রতন
চিনিতে নারিল রাজা !

সুনী। নাহি নিন্দ হেন ভাবে স্বামীরে আমার।
ভগিনি। স্বামী চোর নহি আমি জ্ঞানী,
স্বামী বুঝিবেন যাহা,
আমি নারী—কি বুঝিব তাহা ?
যা কিছু করেন স্বামী, আমারই মঙ্গল তরে ;
আমি জানি, স্বামী মম
বাম নহে আমা প্রতি।

তপ। তাই তোমা দিল বনবাস ?

সুনী। বনবাস নহে ইহা স্বর্গবাস মোর,
পরিহাস নাহি কর।

তপ। ভাল, পরিহাস না করি আর,
ফিরে চল রাজার নিকটে,
রাজারে বুঝায়ে মোরা,
স্থাপিব তোমায় পুনঃ রাজসিংহাসনে।

সুনী। না, ভগিনি ! না,
হেন শিক্ষা দিও না আমারে,
স্বামী আজ্ঞা নারিব লঙ্ঘিতে,
বনবাস থাকুক আমার।

তপ। স্ত্রৈণ স্বামী তব,
ঘোর মোহাচ্ছন্ন,
তা, না হ'লে, সুরুচির কথা শুনি
হেন রত্ন দিল পায়ে ঠেলে।

সুনী। জন্মে জন্মে হেন স্বামী হউক আমার ;
জন্মে জন্মে হোক সুরুচি আবার,
জন্মে জন্মে থাকি বনবাসে আমি,
পূর্ণ হোক স্বামিমনোরথ।
ক্ষতি নাই আমি মরি,—
স্বামীর চরণে কাঁটা দিব না ফুটিতে ;

যাব না স্বামীর কাছে।
সুখে থাকি রাজা সুরুচি প্রণয়ে,
আমি গেলে কণ্টক হবে সুখে।

তপ। এস ভগ্নি।
তবে আমার স্বামীরে ভজ,
পাবে হৃদে অনন্ত আরাম।

সুনী। কেন কর উপহাস?
আজন্ম কুমারী তুমি;
কে তোমার স্বামী?
আজ এ নূতন কথা শুনি তব মুখে।

তপ। বিবাহ হ'য়েছে মোর,
জনম অবধি স্বামী আছে,
নিগূঢ় প্রণয়ে বদ্ধ আছি তাঁর সনে।

সুনী। ভাল, না দেখিনু একদিনও স্বামীরে তোমার।
কি রূপ তাঁহার?
কিবা নাম ধরে?

তপ। প্রভাত প্রকাশে, পূরব আকাশে,
জ্যোতির্ম্ময় স্বামী মোর খল খল হাসে,
নব রাগ ভরে, দিক আলো করে,
জাগায় জগৎজীব রূপের উচ্ছ্বাসে।

সুনী। এ ত সূর্য্য। সূর্য্য কি তোমার স্বামী?

তপ। না, এ তাঁর একটী রূপ মাত্র।

সুনী। অন্য রূপ কিছু আছে?

তপ। কোটী কোটী—অনন্ত অনন্ত।
নীলাতপ তলে, যামিনী আঁচলে,
চন্দ্র হ'য়ে স্বামী বসেন আমার,
তারা সিংহাসনে, জ্যোৎস্না ভূষণে,
রাজ রাজেশ্বর রূপে খুলে দরবার।
নীচেতে সাগর, তটিনী নির্ঝর,
কল কল স্বনে বন্দনা রূপে গায়,

তরঙ্গ উত্তাল, মৃদঙ্গের তাল,
ধাইয়া আঘাত করে তটগায় ॥

স্থনী। এ ত আকাশ, নক্ষত্র, সাগর, নদী, চন্দ্র ;
এই সব কি তোমার স্বামী ?

তপ। না, শুধু তা নয় ; স্বামী রাজা, স্বামীই ভূষণ, স্বামীই বন্দী, তিনি সর্ব্বরূপে এই বিশ্বমাঝে প্রকাশিত। স্বামী আবার আপনি রাজা, আপনি বন্দী, আপনি মৃদঙ্গ, আপনি গান, আপনার সঙ্গীতে আপনিই মোহিত।

স্থনী। এ গভীর ভাব ভাল বুঝ্‌তে পারলুম না।

তপ। কুয়াসা আবৃত তপনের মত আবছা আবছা দেখা যায়। আবার শোন, আরও স্পষ্ট দেখ্‌বে।

বন উপবনে, বিহঙ্গম সনে,
সমীরণে স্বামী বাঁশরী বাজায়,
ফুলের পরাগ, করিয়া সোহাগ,
সমীরে মিশায়ে অঙ্গে মাখায়।
ঐ বাজে পাতা, স্বামী কয় কথা,
ঐ ডাকে মোরে, দুলায়ে শাখা ;
যে দিকেতে চাই, দেখিবারে পাই
স্বামীর মূরতি জগতে আঁকা ;
বিশ্বগায়ে হেরি স্বামী নাম লেখা ॥

স্থনী। এ ত অনেক।

তপ। না, স্বামী এক, একমাত্র ;
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর।
বিকাশিত স্বামী
বিশ্বমাঝে অনন্ত আকারে ;
পূজ তাঁরে ভক্তিভরে।

স্থনী। পূজিব তাঁহায়,
কিন্তু নারিব ভুলিতে মোর বিবাহিত স্বামী।
তিনি মোর গৃহের দেবতা ;
গৃহদেবতায় পূজি অগ্রে
বিশ্বদেবতায় পাব তবে.

স্বামী মোর
স্ফটিক নির্ম্মিত স্বচ্ছ দেবমূর্ত্তি ;
হেন দেবতার মধ্য দিয়া
হেরিব সে বিশ্বস্বামী শ্রীমধুসূদন।

তপ। ভাল দুই স্রোত একাধারে হউক মিলিত ;
স্বামিপ্রেমে হরিপ্রেমে হোক আলিঙ্গন।
এস ভগি! গাই দোঁহে প্রেমগান।

উভয়ে। হরে মুরারে, মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

তপ। জয় প্রাণেশ্বর, প্রেমের আকর,
জয় জয় স্বামী মুকুন্দ মুরারে।

সুনী। নির্ঝর সাগর, চন্দ্র দিবাকর,
খেচর ভূচর গাও সমস্বরে,
"হরে মুরারে হরে মুরারে।"

উভয়ে। গাও মেঘদল, চপলা চঞ্চল,
গাও গরজিয়া হরে মুরারে,
গাও গাও প্রাণ এ গম্ভীর গান,
গাও মেঘ সনে গরজ গভীরে॥

(গাইতে গাইতে তপস্বিনীর প্রস্থান ও কুটীর মধ্যে
সুনীতির প্রবেশ।)

(ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রধ্বনি)

(উত্তানপাদের প্রবেশ)

উত্তান। কি ভীষণ ঝড়!
মহীরুহ দলে করে কোলাকুলি,
কেহ কেহ চুমে পৃথ্বীতল।
ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জন,
ঝকমকি চমকে চিকুর,
ধূলিরাশি উঠে শূন্যদেশে ;
ঘোর অন্ধকার।
কোথা যাই—পথ নাই,

দৃষ্টি নাহি চলে;
কোথা ছিনু কোথা বা আইনু,
রথ রথী অনুচর কোথা পলাইল,
ছিন্ন ভিন্ন হ'ল সৈন্যদল!
দিক্ ভ্রম জন্মিল আমার।
কোথা স্থান পাই,
কে দিবে আশ্রয়—
এ নিবিড় বনমাঝে
লোকালয় পাই কোথা?

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

ঐ দূর কুটীর ভিতরে
জ্বলে ক্ষীণ দীপালোক;
কে আছ কুটীরে
বিপন্নে আশ্রয় দেহ—
কে আছ—কে আছ—
দুয়ারে অতিথি আশ্রয় মাগিছে।
যাই দ্বারে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।

(কুটীরের নিকট যাইয়া দ্বারে আঘাত)

(সুনীতির বাহিরে আগমন ও নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান)

কে তুমি এ বনমাঝে বনদেবী রূপে?
নিস্পন্দ প্রতিমা সম কেন দাঁড়াইলে?
কি দেখিছ একদৃষ্টে চাহি মোর পানে?
দেবী না দানবী বুঝিতে না পারি,
শঙ্কিত হইল প্রাণ;
কথা কও—না পাই উত্তর কেন?

সুনী। (স্বগতঃ) একি। একি আজ হেরি আচম্বিতে।
চির অন্ধকার অদৃষ্ট আকাশে
উদিল অযুত ভানু!
রাজা, স্বামী, প্রিয় প্রাণেশ্বর
উপনীত দুঃখিনী কুটীরে।

উত্তান। কি ভাবিছ? কথা কও; দেহ পরিচয়।

সুনী। (স্বগতঃ) কি দিব উত্তর?

আত্মপরিচয় দিব কি রাজায়?

যদি নাম শুনি মোর,

ঘৃণা করি না লন আশ্রয়,

অধিনী কুটীরে,

তবে ফুটন্ত আশার ফুল,

মুকুলেই হইবে মুদিত।

ব্যাকুল, কাতর রাজা, পরিচয় জানিবারে।

উৎকণ্ঠায় স্বামী দুঃখ পায় কত—

আত্মসুখ তরে,

স্বামীরে এ দুঃখ দেওয়া উচিত ত নয়।

দিই পরিচয়—

যা হয় অদৃষ্ট লিপি হোক।

(পদতলে পতিত হইয়া)

মহারাজ! প্রাণনাথ!

কি ভাবিব আর—

ভাবি তব চরণপঙ্কজ।

প্রভো! নহি দেবী আমি,—

চিরদাসী তব চরণ আশ্রিত।

তব শুভ আগমনে,

কৃতার্থ হইল প্রাণ,

কৃতার্থ কুটীর,—কৃতার্থ সুনীতি।

উত্তান। সুনীতি! সুনীতি!

একি! একি! তুমি কি সুনীতি?

এই তপোবনে বাস তব?

আহা! বহুদিন পরে

মিলাইল বিধি

নির্ব্বাসিতা সুনীতির প্রিয় দরশন।

সুনী। যদি বিধি বহু পুণ্যবলে মম,

মিলাইল রাজদরশন দুঃখিনী কুটীরে,
কৃপা করি দেহ অনুমতি প্রভো!
করি তব শ্রীচরণ পূজা।
মুনিপত্নীগণ পাশে,
ভিক্ষা করি, করি জীবন ধারণ,
ভিক্ষা করি আনি ফল মূল,
দিব তব পদে উপহার।
রাজোচিত শয্যা নাহিক আমার—
নব কিশলয় পাতি শয্যা বিরচিব।
কি আছে আমার—
আমি দীন ভিখারিণী দাসী তব।
কৃপা করি,
কুটীর ভিতরে আসি করুন বিশ্রাম।

(কুটীর মধ্যে উভয়ের প্রবেশ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উত্তান পাদের কক্ষ।

উত্তান। (স্বগতঃ) মৃগয়ায় হেন ক্লেশ কভু নাহি পাই,
কভু দেখি নাই হেন ঝঞ্ঝাবাত,
ছিন্ন ভিন্ন কৈল মোর সৈন্যরাশি;
মন্ত্রী আদি অনুচর কে কোথায় গেল,
নাহিক উদ্দেশ।

(রাজার অজ্ঞাতসারে সুরুচির আগমন)

আমি নিরাশ্রয়, বিপন্ন সে বনমাঝে,
কুটীরে পাইনু স্থান।
কে দিল আশ্রয়?—
আহা সেই সুনীতি—
আমার সেই নির্ব্বাসিতা স্ত্রী।
সেই দিন আমি চিনিয়াছি তারে;
আহা,—কত তার ভালবাসা,

কত যত্ন, কত ভক্তি,

এক রাত্রে দেখাইল মোরে।

সুনীতিহৃদয়ে এত প্রেম গভীরে নিহিত

কভু নাহি জানি—

জানিলাম সেই দিন।

কিন্তু আমি কি কোরেছি তার?

প্রতিদান প্রণয়ের কি দিয়েছি আমি?

দিয়াছি তাহায় বনবাস নারীর কথায়।

সুনীতি!—সুনীতি। কত ক্লেশ দিতেছি তোমায়,

চিনি নাই আমি তোমা—চিনিয়াছি এবে।

তুমি দেবী—আমি নরাধম।

(সুরুচির সম্মুখে আগমন)

সুরু। একি মহারাজ!

উন্মাদের প্রায়

প্রলাপ কহিছ আপনা আপনি;

কোন্ নারী লভিয়াছে হৃদয় তোমার?

উত্তান। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ।

সুরুচি শুনেছে বুঝি সব।

পড়িনু সঙ্কটে এবে।

সুরু। কি ভাবিছ রাজা?

কেন নাহি দিতেছ উত্তর?

বুঝিয়াছি আমি।

অন্তরালে থাকি

শুনিয়াছি তব গুপ্ত প্রণয়ের কথা।

মনে মনে তব এত কুটিলতা?

আমি নারী—সরল হৃদয়,

জানি শুধু সরল প্রণয়;

জানিতাম তব হৃদি সরল—অমৃতমাখা;

জানিলাম আজি অমৃতে গরল ভরা।

ছি ছি রাজা!

তেয়াগিলে যেই সুনীতীরে,
যাহারে ঘৃণিত বলি দিলে বনবাস,
যাহার প্রণয়ে তুমি দিলে জলাঞ্জলি,
তাহারই দুয়ারে হইলে অতিথি?
তাহারই কুটীরে যাপিলে যামিনী?
সাক্ষাতে আমার প্রণয় উচ্ছ্বাস দেখাও নিয়ত,
অসাক্ষাতে মম,—গোপনে গোপনে
প্রাণ তব ধায় সুনীতির পানে।
ভাল রাজা! থাক তুমি সুনীতি সহিত
চলিলাম আমি।

উত্তান। রাণি! রাণি! রাণি!
কোথা যাও—কোথা যাও?
নাহি কর রোষ,
ক্ষম মোরে চন্দ্রাননে!

সুরু, দাও ছাড়ি রাজা!
তোমার আলয়ে না চায় থাকিতে প্রাণ!
যাই চলে দেশ ছাড়ি দুনয়ন যায় যথা।

উত্তান। (পদতলে পতিত হইয়া)
সম্বর পঙ্কজমুখি! সম্বর এ রোষ।
প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি! ধরি রাঙ্গাপায়,
ক্ষম মোরে ক্ষম লো মানিনি!
দোষী যদি হোয়ে থাকি চরণে তোমার,
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার,
বিধান করহ বিধুমুখি।

সুরু। রাজা! গিয়েছিলে তুমি সুনীতির পাশে,
ভাল, যদি তার গর্ভে, জন্মে পুত্র তোমার ঔরসে,
কহ সত্য করি, তাবে না করিবে রাজা;
নাহি দিবে তারে তিল অংশ রাজত্বের ভোগ?
সুনীতিরে কভু নাহি দিবে স্থান প্রাসাদে তোমার?
কহ মোরে সত্য করি, আমরণ বনবাসে রাখিবে তাহার।

উত্তান। (নিরুত্তর)

সুরু। একি রাজা!

কেন নাহি দিতেছ উত্তর?

বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি,

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি তোমার।

যাও পুনঃ সুনীতির পাশে

নাহি প্রয়োজন আমাতে তোমার।

(প্রস্থানোদ্যত।

উত্তান। মহিষি! মহিষি! যেও না—যেও না,

দেহ ক্ষণকাল ভবিষ্যৎ ভাবিতে আমায়—

বিবেচনা করি দিতেছি উত্তর।

সুরু। কি হইবে রাজা ভাবিলে এখন?

ভবিষ্যৎ বিবেচনা ভবিষ্যতে হবে,

বর্ত্তমান প্রতীকার করহ এখন।

চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি করহ প্রতিজ্ঞা,

নতুবা বিশ্বাস আমি করি না তোমার

অবিশ্বাসী তুমি রাজা!

প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা রাজা,

অন্য কথা না শুনিব আর।

উত্তান। (স্বগত) অস্থির হইল প্রাণ।

চিন্তাস্রোত হইল বর্দ্ধিত,

ঘুরে উঠে মস্তক আমার।

পতিব্রতা সাধ্বী সুনীতির আজীবন বনবাস!

আহা! এখনও যে পড়ে মনে তার

মলিন বিষাদ ভরা সেই মুখখানি

প্রদোষ পঙ্কজ যথা রবির বিহনে।

রূপ আছে—গর্ব্ব নাই,

আভা আছে—জ্যোতিঃ নাই,

শীতের শিশির মাখা শশীর কিরণ যথা।

না, না, পারিব না—পারিব না প্রতিজ্ঞা করিতে।

কিন্তু—কি করি উপায় ?
সম্মুখে সুরুচি মহাভয়ঙ্করী
রোষে আছে যেন বিস্তারিয়া ফণা দংশিতে আমায়
কুটিল ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া উহার আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ,
কি বলি এখন ?

সুরু। মহারাজ! আর কতক্ষণ
লইবে সময় চিন্তা করিবারে ?
বিলম্ব করিতে নারি।

উত্তান। রাণি! আজি প্রাণ অসুস্থ আমার,
আজ আমি না পারিব প্রতিজ্ঞা করিতে।
(বেগে প্রস্থান)

সুরু। মহারাজ। কোথা যাও—কোথা যাও প্রতিজ্ঞা না করি ?
(প্রস্থান।)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

আসল ও নকল।

সব জিনিষেরই আসল ও নকল আছে। গয়লা দুধে জল দেয়—ঘিওলা ঘিয়ে চর্বি মিশায়—মিঠাইওয়ালা পূর্ব্বদিনের অবিক্রীত বস্তুগুলি দ্বারা নূতন করিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। সেইরূপ নকল মানুষ আছে—নকল সাধু আছে, নকল বৈরাগ্য আছে, নকল জ্ঞান আছে, নকল যোগসিদ্ধি আছে—নকল ভক্তি আছে, নকল দেশহিতৈষিতা আছে; ফল কথা, সব জিনিষেরই নকল আছে।

এক দল লোক আছেন, তাঁরা সংসারে নকল দেখে দেখে ব্যথিত হয়ে বিরক্ত হয়ে ভীত হয়ে নিরাশ হয়ে গেছেন। তাঁদের এমন হয়েছে যে, সত্য কিছু দেখলেও ভান বোধ হয়। তাঁরা সহজে সত্য বলে কিছু নিতে চান না। এমন কি, অনেকের এমন পর্য্যন্ত যেন ধারণা হয়ে যায় যে, সত্য বুঝি বাস্তবিকই কিছু নাই।

এ শ্রেণীর লোককে আমরা দোষ দিতে পারি না। তাঁরা নিজে ভুগে ভুগে ঠেকে ঠেকে এইরূপ শিখেছেন—তাই সদাই ভয়, সদাই আতঙ্ক। দেখলেন,

আজ একটা বিশ্বাস করিলেন—কাল সেই বিশ্বাসে এমন আঘাত লাগিল যে, এইরূপ সকল অবলম্বন গুলিই তাঁদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া এখন তাঁরা যেন নিরবলম্ব হয়ে বসে আছেন।

'যেন' বলিবার মানে আছে। বাস্তবিক নিরবলম্ব থাকিবার যো নাই। নকল কথাটী দ্বারাই আসলের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইবে কিরূপে? তুমি আসল জিনিষ খুঁজিয়া পাও নাই, একথা সত্য হইতে পারে; তাই বলিয়া উহার অস্তিত্বের অপলাপ করিও না—আসল নাই বলিয়া লোককে আসলের অন্বেষণে বিরত হইতে উপদেশ দিও না। আসল জিনিষ অতিশয় আয়াসলভ্য—কঠোর সাধনলভ্য। কোথায় তোমার সেই আয়াস? কোথায় তোমার সেই সাধন?

নকলকে ক্রমাগত গালাগাল দিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে আসল জিনিষ পাইবার চেষ্টা কর—আসল মানুষ নিজে হইবার চেষ্টা কর। এই নকলের রাজ্যে, এই মায়ার রাজ্যে অতি সুন্দর জিনিষও অতি কুৎসিৎ রূপ ধারণ করে। অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতায়, শুষ্কতায় ও অহম্মন্যতায়, যোগসিদ্ধি বুজরুকিতে, ভক্তি ভণ্ডামীতে, সন্ন্যাস যথেচ্ছাচারে, ক্রিয়াকলাপ কপটাচারে, নিষ্ঠা গোঁড়ামীতে পরিণত হয়। এ হইবেই, এ কেউ বারণ করিতে পারে না। কোনরূপ আইন কানুন করিয়াই কেহ প্রকৃতির গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া সদা অতিসাবধানী হইয়া উন্নতির কেহ চেষ্টা করিবে না—উচ্চ চিন্তার রাজ্যে, উচ্চ ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াস পাইবে না—একথা বলা বৃথা। সর্ব্বদা দুর্ব্বলতার সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। পেট খারাপ করিবে বলিয়া চিরকাল মাছের ঝোল ভাত খাইলে পেটের পরিপাক-শক্তির চির অবনতি সাধিত হয়।

উচ্চ ভাব আছে—উচ্চ লোক আছে, এ বিশ্বাস যত্নসহকারে অর্জ্জনীয়। যার এ বিশ্বাস নাই, তার কিছুই নাই, তার ভবসাগর পারের সম্বল মোটেই নাই। উন্নতির সম্ভবনীয়তায় যার বিশ্বাস নাই, সে উন্নতি করিবে কি করিয়া?

বিজ্ঞান যে সকল নব নব আবিষ্কার করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাহার মূলে কি এই প্রবল বিশ্বাস নাই? বৈজ্ঞানিক Quack অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই একজন এমন থাকিতে পারেন, যাঁহারা আজ উপহাসাস্পদ হইলেও শতবর্ষ পরে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চিরপূজ্য হইবেন।

এই কারণে যাঁহারা সকল বিষয়ে আপাত অসম্ভব বিষয়ের চর্চ্চায় রত, তাঁহারা উপহাসাস্পদ না হইয়া উৎসাহের যোগ্য। সমুচিত প্রণালী সহকারে তাঁহাদের অন্বেষণকে সংযত কর, তাঁহাদের অনুসন্ধানপ্রণালী সম্বন্ধেও তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ সৎপরামর্শ দাও, কিন্তু উড়াইয়া দিও না।

অদ্বৈতবাদী এইরূপ এক মহা অসম্ভব বিষযে প্রয়াসী। তিনি মানুষে ভগবানে এক করিতে চান। তাঁর বড় আশা। কে জানে—তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইবে কি না? কে জানে, তাঁহার সোঽহং কেবল কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে অথবা একদিন সত্যে পরিণত হইবে? বলিতে না পারিলেও তিনি উৎসাহযোগ্য, কারণ, তিনি মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল বাসনার চরম তৃপ্তি করিতে চাহিতেছেন—তাঁহাকে তাঁহার অনুসন্ধানে সহায়তা কর, তাঁহার ভাবগুলি ধারণার চেষ্টা কর—বাধা দিও না।

যোগী যোগবলে প্রকৃতি বিজয় করিতে চান। কেন না তিনি আমাদের সম্মানাস্পদ হইবেন? তাঁহার উদ্ভাবিত সাধন প্রণালী সকল নিজ নিজ তর্ক-শোধিত করিয়া অনুষ্ঠান করুক, Experiment করিতে থাকুক—বংশানুক্রমে পুরুষপরম্পরায় চলুক যোগানুষ্ঠান। দেখ, তাহাতে প্রকৃতি বিজয় হউক না হউক, অন্ততঃ দেহ মনের উপর ক্রমশঃ কিছু কিছু আধিপত্য হয় কি না।

ভক্ত ভাবে মাতুক না—দেখ না কতদূর মাতিতে পারে, কতদূর সমাধিস্থ হইতে পারে। তোমরাও ত নানা বিষয়ে মাতিয়া বিহ্বল হইতেছ; তাহার এই নিরবলম্ব নিরীহ মাতামাতিতে তুমি এত বিরক্ত কেন? দেখ, ভাবাবেশে মন কতদূর মজে।

আর সন্ন্যাসী? দাও, তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে; দেখ, তাহারা কামকাঞ্চন কতদূর জয় করিতে পারে। কামের উচ্ছেদ কতদূর সম্ভব, দেখ, তুমিও না হয়, তাহার পথে একটু একটু চেষ্টা কর। সে ভোগবিলাস ত্যাগ করুক, সব জিনিষের অবলম্বন একটু একটু করিয়া ছাড়ুক। তাহাকে আরো ত্যাগ করিতে উপদেশ দাও। কোন বিষয়ে বিফল হইয়াছে বলিয়া তাহাকে নিজ ভূমিতে টানিয়া আনিবার অন্যায় চেষ্টা করিও না।

দুর্ব্বলতা দূর কর—ভরসায় বুক বাঁধ। দুর্ব্বল যে, সে কি পারে? সে যে কিছু পারে না। তার কি জগতে স্থান আছে? যে যোগ্যতম, সেই জগতে স্থান পাইবে। অতএব হে সাধু, আদর্শের ভান করিয়া অনেককে দেহপুষ্টি করিতে দেখিলে তুমি বিরক্ত না হইয়া এই টুকু মনে করিয়া মনকে প্রবোধ

দাও—জগতে এখনও আদর্শের নামটাও আছে। ভেকটা দেখিয়া কাহারও না কাহারও আসলে রুচি ও চেষ্টা হইলে হইতে পারে। আর তুমি তোমার সাধ্যমত সেই সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় লোকের মন ফিরাও। ভুল দেখাইয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করিও না। ভুল ভ্রান্তি আছে—সকলে জানে। পেটের দায়ে অনেকে ভণ্ডামী করিয়াও থাকে। তোমার পেটের দায় না থাকে, একবার সাহসে বুক বাঁধিয়া সত্যের জ্যোতি প্রকাশ কর—দুর্ব্বল জগতে শক্তি সঞ্চার কর।

সাধকের স্বগতোক্তি।

ভগবানের নাম করিতে করিতে এ দেহ যায় যাক্, থাকে থাক। ছাই, তাই ভগবানের নামই বা কই হচ্চে? আবল তাবল নানা রকম যে ভাব্‌চি। না, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—এই আসনে মনকে লইয়া বসিলাম—দেখি, জয় করিতে পারি কি না। জয় করিতে পারিলে ত আনন্দের সীমাই নাই—না করিতে পারিলেও দেখিয়া গেলাম ত, যত্নদ্বারা কতদূর হইতে পারে—মনের আক্ষেপ ত মিটিবে। যাক সকল সংসার আমার মন থেকে ভেসে—পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রীপুত্র তোমরা একেবারে চিরকালের জন্য বিদায় হও। দয়াময়—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—হরিঃ ওঁ হরি ওঁ সর্ব্বব্যাপী, বিরাট, আকাশস্বরূপ—নিরাকার, নিরঞ্জন—তুমিই একমাত্র উদিত থাক।

মনটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্চে যে। প্রভু, তুমি এসে পূর্ণ কর—পূর্ণ কর দয়াময়। আমার শূন্য হৃদয়কুটীর পূর্ণ কর আমার আঁধার ঘরে আলো জ্বাল। তুমি আমায় পিতা হয়ে শাসন কর—মা হয়ে আমার আবদার সহ্য কর, আমার সব অভাব পূরণ কর, পূরণ কর।

এ্যাঁ, পাগল হব নাকি? এ শূন্যে কার সঙ্গে কথা কচ্চি—এ ত ক্রমশঃ কল্পনাসাগরে ভেসে ভেসে চলেছি। না, না, সত্য দেখি—চোখ খুলে দেখি সত্যের জগৎ। ঐ যে নীল নীল নীলাকাশ—অনন্ত অনন্ত পানে চলেছে—কোথা ওর অন্ত কে জানে, অন্ত নিয়ে ত থাকতে পারিনি, প্রাণ যে অনন্তের দিকে দৌড়ুচ্চে। অনন্তকে জান্‌তে পার্‌বো না জানি, কিন্তু যা জানি, তাতে ত তৃপ্তি বোধ হয় না। জান্‌লেই যেন মনটা খাটো হয়ে যায়। প্রাণ জান্‌তে চায় না, প্রাণ বিহ্বল হতে চায়। তবে চল্ মন—চল্- এ ক্ষুদ্র আকাশকে জেনে

কি হবে-চল্ আকাশের মূলে। ওই যে সোনার বরণ পাখী উড়ছে, ও ওই আকাশের কোলে কোলে চলেছে—ওই ওই আর ত দেখা যায় না, কোথায় মিশিয়ে গেল। ওই হাওয়া বইচে—ও ত অনুভব কর্‌ছি, ওত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভিতরে আস্‌চে বাইরে যাচ্চে—ও যেন ভেতরে গিয়ে আমার হৃদয়ে মিশে যাচ্চে—ওও বুঝি অনন্তে মিশে যাচ্চে। এই অনন্তই ভগবানের নাম—এই অনন্তই সত্য। কল্পনা হতে যাবে কেন?

এই ত জ্ঞান—এই ত সুখ, যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। মন, এই সচ্চিদানন্দ। মজ মজ এই প্রাণারামেতে মজ—মজে বিভোর হয়ে থাক আনন্দ আনন্দ আনন্দ—মাতোয়ারা, এই ত তাঁকে পেয়েছি। আর ছেড়ে দোব না—বুকের ভিতর ধরে রেখে দোব। এই আনন্দ নিয়ে—এই কেবলানন্দ—এই স্বরূপানন্দ—নিয়ে মেতে থাক্‌বো। দেহ যাক, ক্ষতি নেই। এ আনন্দ নিত্য—এ আনন্দের ধ্বংস নাই, মরেও আনন্দ পাব।

ঐ যা, আবার যেন স্বপন ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে গেল যে। একি লুকোচুরী খেলা প্রভু? এই রকম করে কি কষ্ট দিতে হয়? না, না, নিজের দোষেই হারিয়েছি। সাধনা ক্রমাগত কত্তে হবে—ক্রমাগত নাম কোত্তে হবে, তবেই হবে। হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ—আবার প্রাণ জুড়িয়ে আস্‌ছে। ছাড়া হবে না নাম—নাম কোত্তে কোত্তেই মোর্ব্বো—পাই না পাই। আর কোর্ব্বো কি? কোন্ দিকে যাব? মিথ্যার সংসার—কপট সংসার, এসকলের ছলনায় ভুল্‌বে—মজ্‌বো? না, তা হতে পারে না। যখন একবার লেগেছি, তখন ছাড়্‌চি না।

ইতি জনৈক সাধকস্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া গ্রামের ধর্ম্মাশ্রমে বিগত ১০ই চৈত্র দোলের দিন সপ্তম বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। সমস্ত দিবস সঙ্কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা তস্মাদব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ ব্যজ্যন্তে ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গম-লক্ষণাঃ প্রভবন্তি অভিব্যজ্যন্তে অহ্নআগমঃ অহরাগমঃ তস্মিন্ অহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্ব্বাব্যক্তয়ঃ তত্রৈব পূর্ব্বোক্তে অব্যক্তসংজ্ঞকে। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতির দিবসে ও রাত্রিতে যে কার্য্য হয়, তাহাই বলা হইতেছে—প্রজাপতির নিদ্রাবস্থাকে অব্যক্ত বলা যায়, সেই অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্তি অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমস্বরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দিবসের আগমনে অর্থাৎ প্রজাপতির জাগরণ কালে, এইরূপ রাত্রির আগমনে অর্থাৎ প্রজাপতির নিদ্রাকালে, সেই সকল স্থাবরজঙ্গমলক্ষণ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু, পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তসংজ্ঞক প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। ১৮।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে। ১৯।

অন্বয়। স এবায়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা অবশঃ (সন) রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে, হে পার্থ! (পুনঃ) অহরাগমে প্রভবতি। ১৯।

মূলানুবাদ। সেই এই প্রাণিসমূহ (কর্ম্মবশে) বারম্বার জন্মলাভ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রিকাল আসিলে অবশ হইয়া আবার সেই অব্যক্তে লীন হইয়া থাকে। আবার হে পার্থ, ব্রহ্মার দিন আসিলে পুনর্ব্বার উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৯।

ভাষ্য। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্রপ্রবৃত্তি-সাফল্যপ্রদর্শনার্থং অবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাৎ চ অবশো ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ইত্যতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থঞ্চেদমাহ। ভূতগ্রামঃ ভূতসমুদায়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ স এবায়ং নান্যো ভূত্বা ভূত্বা অহরাগমে প্রলীয়তে পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমে, অহ্নঃ ক্ষয়ে অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ এব প্রভবতি অবশ এবাহরাগমে। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। যে কর্ম্ম করিল না, তাহার ফল লাভ হইল আর যে কর্ম্ম করিল, তাহার কোন লাভ হইল না, এইরূপ দোষ পরিহার করিবার জন্য, বন্ধ ও মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে লোকের প্রবৃত্তি হয় সেই প্রবৃত্তির সাফল্য প্রদর্শন করিবার জন্য, এবং অবিদ্যাদি ক্লেশনিমিত্ত কর্ম্মা-শয়ের বশে অস্বতন্ত্র প্রাণিনিচয় পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া মরিয়া যায়,

এই কারণে সংসারে বৈরাগ্য হয়, ইহাও প্রদর্শন করাইবার জন্য (ভগবান্) বলিতেছেন যে—"ভূতগ্রাম' প্রাণিসমুদায়, স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয়বিধ, যাহা পূর্ব্ব কল্পে ছিল, তাহাই আবার এই পরিদৃশ্যমানরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য নহে। দিনের আগমন হইলে এইরূপে ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়া রাত্রির আগমনে পুনঃ পুনঃ বিলীন হইয়া যায়। "অবশ" অস্বতন্ত্র, আবার দিবসের আগমনে সেইরূপ অবশ হইয়াই উৎপত্তি লাভ করে। ১৯।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

অন্বয়। তস্মাৎ অব্যক্তাৎ তু অন্যঃ যোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ ভাবঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

মূলানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণস্বরূপ যে অব্যক্ত সনাতন সত্তারূপ ভাব বিদ্যমান আছে, এই ভূতনিচয় বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না। ২০।

ভাষ্য। যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনা অথইদানীং অক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়া ইদমুচ্যতে অনেন যোগমার্গেণ ইদং গন্তব্যমিতি পরোব্যতিরিক্তঃ ভিন্নঃ। কুতঃ? তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ তুশব্দোঽক্ষরস্য বিবক্ষিতস্য অব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ। ভাবোঽক্ষরাখ্যং পরংব্রহ্ম। ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহঅন্য ইতি অন্যো বিলক্ষণঃ স চাব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ পরস্তস্মাদিত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ পরঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ ভূতগ্রমবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাৎ। সনাতনশ্চিরন্তনঃ যঃ স ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু—ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

ভাষ্যানুবাদ।—যে অক্ষরের বিষয় বলা হইয়াছে, "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা, তাহার প্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যে প্রকার যোগমার্গ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিতেছেন যে—"পর" ব্যতিরিক্ত,—ভিন্ন, কাহা হইতে? সেই পূর্ব্বোক্ত (অব্যক্ত) হইতে। যাহার বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করা হইযাছে, সেই ব্রহ্ম যে অব্যক্ত হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ তাহাই তু শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। "ভাব" অক্ষরাখ্য পর ব্রহ্ম অব্যক্ত

হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহার সহিত অব্যক্তের সাধর্ম্ম্য থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন,—"অন্য" অন্য (শব্দের অর্থ) বিলক্ষণ, সেইব্রহ্মও "অব্যক্ত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, তাহা হইতে পর, ইহা বলা হইয়াছে। কাহা হইতে পর? সেই পূর্ব্বোক্ত ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যালক্ষণ অব্যক্ত হইতে। "সনাতন" চিরন্তন। এই প্রকার যে "ভাব", তাহা ব্রহ্মাদি সকল জগৎ নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না। ২০।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ২১।

অন্বয়।—অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (যঃ ভাবঃ) উক্তঃ তং পরমাং গতিং আহুঃ। যং (ভাবং) প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ২১।

মূলানুবাদ।—যে ভাব, অব্যক্ত ও অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকেই পরম গতি বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। ২১।

ভাষ্য।—অব্যক্ত ইতি যোঽসৌ অব্যক্তঃ অক্ষর ইত্যুক্তঃ তমেবাক্ষরসংজ্ঞকং অব্যক্তং ভাবং আহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্। যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায় তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ। ২১।

ভাষ্যানুবাদ।—অব্যক্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে "পরম" প্রকৃষ্ট গতি বলিয়া (শাস্ত্রকারগণ) উল্লেখ করিয়াছেন। যে ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া আর সংসারভোগ করিতে লোক পুনরাগমন করে না, সেই "পরম' প্রকৃষ্ট স্থানই আমার ধাম অর্থাৎ তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ইহাই অর্থ। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ২২।

অন্বয়।—হে পার্থ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং স পরঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ। ২২।

মূলানুবাদ।—হে পার্থ, ভূতসমূহ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, যিনি এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম পুরুষ (কেবল) অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য। ২২।

ভাষ্য। তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে—পুরুষঃ পুরিশয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্বা, স পরঃ পার্থ পরোনিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়া অনন্যয়া আত্মবিষয়যা। যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি কার্য্যভূতানি ভূতানি। কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্বর্ত্তি ভবতি। তেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং আকাশেন ইব ঘটাদি। ২২।

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহাকে পাইবার উপায় বলা হইতেছে। "পুরুষ" (দেহরূপ) পুরে শয়ন করেন বলিয়া অথবা স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া (তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়) হে পার্থ, সেই "পর" নিরতিশয় "যেহেতু তাঁহা হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুই নাই সেই" পুরুষ, সেই কেবল অনন্য ভক্তি (এই ভক্তি শব্দের অর্থ জ্ঞান) দ্বারাই লভ্য (হইয়া থাকেন)। (এখানে যে অনন্য শব্দ আছে, তাহার অর্থ আত্মবিষয়) এই কার্য্যস্বরূপ ভূতনিচয় যাহার "অন্তঃস্থ" মধ্যবর্ত্তী। কার্য্য কারণেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। যে পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ, ঘটাদি যেমন আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ২২।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ২৩।

অন্বয়।—হে ভরতর্ষভ! যোগিনঃ যত্র কালে প্রযাতাঃ আবৃত্তিং অনাবৃত্তিং চ গচ্ছন্তি তং কালং বক্ষ্যামি। ২৩।

মূলানুবাদ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগিগণ যে কালে মৃত্যুলাভ করিলে এসংসারে পুনরাবৃত্তি করেন অথবা অপুনরাবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই কালের বর্ণন করিতেছি। ২৩।

ভাষ্য।—প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গঃ বক্তব্যঃ। ইতি যত্র কালে ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থমুচ্যতে। আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ—যত্র কালে প্রযাতা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। যত্র যস্মিন্ কালে তু অনাবৃত্তিং অপুনর্জন্ম আবৃত্তিং তদ্বিপরীতাং চৈব। যোগিন ইতি যোগিনঃ কর্ম্মিণশ্চ উচ্যন্তে, কর্ম্মিণস্তু গুণতঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ইতি বিশেষণাৎ যোগিনঃ যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনঃ অনাবৃত্তিং যান্তি যত্র চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ।— প্রণবে যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল যোগি-

গণই এখানে প্রকৃত, তাহাদের দেহপাতের পর কালান্তরে মুক্তি হইয়া থাকে। তাহাদের এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ উত্তর মার্গ এক্ষণে বলিতে হইবে। এই কারণেই যত্র কালে ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বিবক্ষিত অর্থ প্রতিপাদন করিবার অনুকূল বস্তুর বর্ণন করা হইতেছে। আবৃত্তি মার্গের উপন্যাস দ্বারা ইতরমার্গেরই স্তুতি করা হইয়াছে। "যে কালে" ইহার "প্রয়াত" এই দূরস্থিত পদের সহিত সম্বন্ধ। "যত্র" যে কালে "অনাবৃত্তি" অপুনর্জন্ম "আবৃত্তি" তাহার বিপরীত অর্থাৎ পুনর্জন্ম, "যোগী" এইশব্দের দ্বারা যোগী ও কর্মী এই উভয়ই প্রতিপাদিত হইতেছে। কর্মিগণই গুণযোগে যোগী হইয়া থাকে। "কর্মযোগের দ্বারা যোগিগণের" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্মিগণই যোগী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। (তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে) যে কালে "প্রয়াত" মৃত হইয়া যোগিগণ অনাবৃত্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যে কালে মৃত হইয়া আবৃত্তিকে প্রাপ্ত হন, হে ভরতর্ষভ, আমি তোমাকে সেই কালের বিষয়ে এক্ষণে বলিতে উদ্যত হইতেছি। ২৩।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ২৪।

অন্বয়। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং (চ) ব্রহ্মবিদোজনা প্রয়াতাঃ (সন্তঃ) তত্র ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ২৪।

মূলানুবাদ।—সগুণব্রহ্মের উপাসকগণ মৃত হইলে, যথাক্রমে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল পক্ষ, ষণ্মাস ও উত্তরায়ন এই কয়জন কালাভিমানিনী দেবতাগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত পথ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪।

ভাষ্য।—তৎকালমাহ। অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা তথা জ্যোতির্দেবতৈব কালাভিমানিনী। অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ভূয়সাং তুনির্দ্দেশঃ যত্র কালে তৎকালমিতি আম্রবণবৎ। তথা অহর্দেবতা অহঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা উত্তরায়ণং তত্রাপি দেবতা এব মার্গভূতা। ইতি স্থিতোঽন্যত্র্যায়ঃ তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতাগচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসনপরাজনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা কচিদস্তি। ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মসংলীনপ্রাণাএব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতাএব তে। কর্মণা তু গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই কাল বলিতেছেন। "অগ্নি" অগ্নিতে অভিমান যাহার আছে, সেই দেবতাই (অগ্নিশব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছেন) এই প্রকার "জ্যোতি" ও কালাভিমানিনী দেবতা। অথবা অগ্নি ও জ্যোতিঃ ইহাঁরা যথাশ্রুত দেবতাই। যাহা বেশী, তাহা দ্বারাই নির্দ্দেশ হয়, এই প্রকার ন্যায় আছে বলিয়া অগ্নি ও জ্যোতিঃ ইহারা কালাভিমানিনী দেবতা না হইলেও, "সেই কাল বলিতেছি" এই উপক্রমে পঠিত কতকগুলি কালাভিমানিনী দেবতার মধ্যে অগ্নি ও জ্যোতির নাম করা হইয়াছে বলিয়া এই দুই দেবতাও কালশব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। কালাভিমানিনী দেবতাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির মার্গভূত হইয়া থাকেন, এই নিয়ম অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন আমের গাছ অধিক থাকিলে অন্য গাছ থাকিলেও লোকে আম্রবণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করে, এইখানেও কালশব্দের উল্লেখও তদ্রূপ। সেইরূপ অহঃ এইশব্দের অর্থ দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্ল শব্দের অর্থ শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, ষণ্মাস ও উত্তরায়ণ শব্দের অর্থও তদভিমানিনী দেবতা। সেই এই মার্গে ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর যোগিগণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ক্রমেই হয়, ইহাই বাক্যের শেষাংশ। যাহারা সদ্যোমুক্তিভাক্ অর্থাৎ যাহারা সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ তাহাদের কোন স্থানে গমন বা আগমন সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাদের বিষয়ে শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না"। তাহাদের প্রাণ ব্রহ্মে সংলীন হয়, তাহারা ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মময়ই হইয়া যায়। যাহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক, তাহারাই ক্রমে কর্ম্মের ফলে অগ্নি প্রভৃতি মার্গানুসারে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। ২৪।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। ২৫।

অন্বয়। ধূমঃ রাত্রি তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্—তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য যোগী নিবর্ত্ততে। ২৫।

মূলানুবাদ। ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিদেবতা কৃষ্ণদেবতা ষণ্মাস দক্ষিণায়ন দেবতা এই প্রকার যে মার্গক্রম আছে, সেই পথে যাইয়া কেবল কর্ম্মপর যোগী চন্দ্রলোকের ভোগ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ২৫।

ভাষ্য। ধূম ইতি ধূমো রাত্রির্ধূমাভিমানিনী রাত্র্যাভিমানিনী চ দেবতা তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ ফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ।—ধূম ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। ধূম ও রাত্রি (শব্দের অর্থ) ধূমাভিমানিনী ও রাত্র্যভিমানিনী দেবতা। সেইরূপ কৃষ্ণ এই শব্দের অর্থ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা। এইরূপ ষণ্মাস ও দক্ষিণায়ন শব্দেরও অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা। সেই এইপথে কেবল কর্ম্মপর যোগী (অর্থাৎ) "যাগাদির অনুষ্ঠানকর্ত্তা" চান্দ্রমস জ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রলোকোদ্ভব কর্ম্মফলসুখভোগ করিয়া সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার (এই সংসারে) প্রত্যাবর্ত্তন করে। ২৫।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ। ২৬।

অন্বয়।—জগত এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে একয়া অনাবৃত্তিং যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে। ২৬।

মূলানুবাদ।—জগতের এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দ্বিবিধ গতি চিরন্তন আছে বলিয়া সম্মত, এই দুইটী গতির মধ্যে একটী গতির দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করা যায়, আর অন্য গতিটীর দ্বারা পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। ২৬।

ভাষ্য।—শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা চ কৃষ্ণা চ, শুক্লকৃষ্ণে, জ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ শুক্লা তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইতি অধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈতে সম্ভবতঃ। শাশ্বতে নিত্যে সংসারস্য নিত্যত্বান্মতে অভিপ্রেতে। তত্র একয়া শুক্লয়া যাতি অনাবৃত্তিমন্যয়া ইতরয়া আবর্ত্ততে পুনর্ভূয়ঃ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ।—শুক্ল ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। শুক্ল এবং কৃষ্ণ (এই অর্থে) শুক্লকৃষ্ণে (এই শব্দটী) ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া প্রথম গতিটীকে শুক্লগতি বলা যায়, তাহা না থাকায় দ্বিতীয় গতিটীকে কৃষ্ণ বলা যায়। এই শুক্ল ও কৃষ্ণনামক গতিদ্বয় জগতের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ও কর্ম্মমার্গে অধিকারী জীবগণের পক্ষে "শাশ্বত," নিত্য বলিয়া "মত" অভিপ্রেত, জগতে সকল জীবেরই ত আর দুই প্রকার গতি সম্ভবপর নহে। সংসার নিত্য, এই জন্য এই দুইটী গতিও নিত্য। এই দুইটী গতির মধ্যে একটী অর্থাৎ শুক্লগতির

দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করে, ইতর গতিটীর দ্বারা পুনঃ আবৃত্তি (অর্থাৎ পুনর্জন্ম) লাভ করিয়া থাকে। ২৬।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন। ২৭।

অন্বয়।—হে পার্থ এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি তস্মাৎ হে অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভব। ২৭।

মূলানুবাদ।—হে পার্থ, যে কোন যোগী এই দুইটী গতির বিষয় অবগত আছে, সে কখনও মোহলাভ করে না, সেই কারণ, হে অর্জ্জুন, তুমি সকল সময়েই যোগযুক্ত হও। ২৭।

ভাষ্য—নৈতে ইতি নৈতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্ সংসারায় একা অন্যা মোক্ষায় চেতি যোগী মুহ্যতি কশ্চন কশ্চিদপি তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবার্জ্জুন। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ।—নৈতে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এই যথোক্ত "সৃতি" মার্গদ্বয়কে জানিয়া—একটী মার্গ সংসারে ফিরিয়া আসিবার আর অন্যটী মোক্ষলাভের জন্য এই প্রকার জানিয়া কোন যোগী মোহপ্রাপ্ত হয় না। সেই কারণে হে অর্জ্জুন, তুমি সকল সময়েই "যোগযুক্ত" সমাহিত হও। ২৭।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্। ২৮।

অন্বয়।—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং যোগী ইদং বিদিত্বা তৎসর্ব্বমত্যেতি (তথা) আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি চ। ২৮।

মূলানুবাদ।—সমুদায় বেদপাঠে, সকল যজ্ঞের সম্পাদনে, সকল তপস্যার অনুষ্ঠানে এবং সকল প্রকার দান করিলে যে পুণ্যফল হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী জানিলে যোগী ঐ সকল পুণ্যফলেরও অতিক্রমণ করে এবং সেই আদ্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ২৮।

ভাষ্য। শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদ্গুণ্যো-নানুষ্ঠিতেষু তপঃসু চ সুতপ্তেষু সম্যগ্ দত্তেষু চ যদেতেষু পুণ্যফলং পুণ্যস্য ফলং পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি তৎসর্ব্বংফলজাতং ইদং

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি।

আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি।

কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে, আমাদের পূজ্যপাদ স্বামীজি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ যে দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি ইচ্ছা রহিল, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব।

বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তিনি ইদানীং মাস কতক হইল, তাঁহার ভীষণ "এলবুমেন্থুরিয়া" (এক প্রকার প্রস্রাবের ব্যায়রাম) রোগে ভুগিতেছিলেন। কবিরাজি চিকিৎসায় সে রোগ হইতে এক প্রকার মুক্তিলাভ করেন। দেহত্যাগের মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে তিনি ভালই ছিলেন, বলিতে পারা যায়। যে দিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন প্রাতঃকালে যজুর্ব্বেদের একটী মন্ত্র ("সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মি" ইত্যাদি) ও উহার টীকা একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, যে, টীকাতে 'সুষুম্নঃ' শব্দের যাহাই অর্থ থাক, পরবর্ত্তী ষট্‌চক্রবাদিগণ সুষুম্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহার বীজ (অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে দেখ।

ইহাতে বোধ হয়, সে দিন তাঁহার মনে ষট্‌চক্রের ভাব ও সাধনা বিশেষ জাগরূক ছিল।

পরে বেলা আটটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া করিতে পারিতেন না। সে দিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন।

ধ্যানান্তে একটী সুন্দর শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটী এই—'মা কি আমার কালো,

কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।' সে দিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে প্রায় ২॥০ঘন্টা ধরিয়া শিষ্য-গণকে 'লঘুকৌমুদী' ব্যাকরণ পড়াইলেন। পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০মাইল বেড়াইয়া আসিলেন। অনেক দিন এত বেশী বেড়া-ইতে পারেন নাই। সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর খুব ভাল ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটী বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা বিশেষ-রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব হালকা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটীকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন।

তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় শ্যামাপূজা করিবেন, স্থির করিয়া-ছিলেন। এই সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথাবার্ত্তা কহেন। ঘন্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু বাতাস করিতে বলিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মালা ছিল। শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাঁহার নিদ্রার আবেশের মত আসিল। ঘন্টাখানেক পরে তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। পরে দুইবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাঁহার সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া লইয়া যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজির নাড়ী নাই ও নিশ্বাস বন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন মতে সমাধি ভঙ্গ আর হইল না। সেই রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহত্যাগ হইয়াছে।

তাহার পরদিন সকালে দেখা গেল, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ এবং নাসিকা ও মুখ দিয়া অল্প রক্ত পড়িয়াছে। অপরাপর ডাক্তারগণ বলিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কোন স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। ইহাতে বেশ বোধ হয়, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া দেহাবসান হয়।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [২৯৬ পৃষ্ঠার পর।

দ্বাদশ অধ্যায়। সন্ন্যাস।

এইরূপে ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিবস মহাপূর্ণ ও রামানুজ উভয়েই গৃহ হইতে কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন। গৃহে জমাম্বা স্নান করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। সমুদয় আয়োজন করিয়া কলসকক্ষে নিকটবর্ত্তী কূপে জল আনয়ন করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মহাপূর্ণকুটুম্বিনীও রন্ধনের জল আনিবার জন্য কলস লইয়া সেই কূপেই গিয়াছিলেন। উভয়েই সমকালে স্ব স্ব কলস কূপে নিক্ষেপ করিলেন এবং পূর্ণ হইলে রজ্জু সহযোগে উত্তোলন করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে গিয়া মহাপূর্ণজায়ার কলস হইতে দুই চারি বিন্দু জল জমাম্বার কলসে পতিত হইল। তাহাতে জমাম্বা ক্রোধে অধীরা হইয়া রূঢ়বাক্যে গুরুপত্নীকে কহিলেন, "তুমি কি চোখের মাথা খাইয়াছ? দেখ দেখি, তোমার অসাবধানতায় এক কলস জল নষ্ট হইয়া গেল। গুরুপত্নী বলিয়া বুঝি একবারে স্কন্ধের উপর উঠিতে হয়? তুমি কি জাননা, তোমার পিতার অপেক্ষা আমার পিতা কত শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভূত? তোমার স্পৃষ্টজল কি করিয়া আমি ব্যবহার করি? মূর্খ ভর্ত্তার হস্তে পড়িয়া জাতিকুল সকলই হারাইলাম।" এই দুরুক্তি শুনিয়া মহাপূর্ণকুটুম্বিনী অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় শান্তস্বভাবা এবং সুশীলা। যদিও তাঁহার মনে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল,তথাপি তিনি তাহা গোপন করিয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন, এবং কলস ভূমিতে স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণপরে মহাপূর্ণ গৃহে আসিলেন। তিনি জায়াকে রোদন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করতঃ সকলই অবগত হইলেন, এবং কহিলেন, "নারায়ণের আর ইচ্ছা নয় যে, আমরা এখানে অবস্থান করি। তাই তিনি জমাম্বার মুখ দিয়া তোমায় রূঢ় কথা শুনাইয়াছেন। দুঃখিত হইও না। প্রভু যাহা করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য। চল, আমরা কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে গমন করি। অনেক দিবস তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করি নাই। সেই জন্যই তিনি দুরুক্তি করিয়াছেন।" ইহা কহিয়া সেই ক্রোধহীন মহাপুরুষ পত্নীর সহিত

তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। রামানুজের জন্য অপেক্ষা করিলেন না, কারণ, শ্রীরঙ্গনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তিনি সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

দীক্ষিত হইবার পর হইতে রামানুজের যাবতীয় মানসিক কষ্ট অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি যজ্ঞ, অঙ্কন, উর্দ্ধপুণ্ড্র, মন্ত্র, এবং দাস্যনাম, এই পঞ্চ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণের প্রসাদে তিনি পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় জগতে আর তাঁহার কে হিতকারী আছেন? ইহা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার গুরু-ভক্তির তুলনা ছিল না। গুরুর ভুক্তাবশিষ্ট না গ্রহণ করিয়া কখনও ভোজন করিতেন না। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই অগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক তামিল প্রবন্ধমালা অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ছয় মাসের মধ্যে পোইহে রচিত একশত, পূদত্ত রচিত একশত, পে রচিত একশত, পেরিয়া আলোয়ার রচিত ত্রিসপ্তত্যুত্তর চতুঃশত (৪৭৩), অণ্ডাল্ রচিত ত্রিচত্বারিংশদুত্তর শত (১৪৩), কুলশেখর-রচিত পঞ্চোত্তর শত (১৪৫), তিরুমড়িশি-রচিত ষোড়শোত্তর দ্বিশত (২১৬) তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি-রচিত পঞ্চ পঞ্চাশৎ (৫৫), তিরুপ্পান্-রচিত দশ, মধুর কবিরচিত একাদশ, তিরুমঙ্গই-রচিত ষষ্ট্যুত্তর ত্রয়োদশশত (১৩৬০) নম্মাআলোয়ার রচিত ষণ্নবত্যুত্তর দ্বাদশ-শত (১২৯৬), সমুদয়ে প্রায় চারি সহস্র সুমধুর ভক্তিরসপরিপ্লুত, সন্তাপনাশক, পরম পবিত্র শ্লোক, মহাপূর্ণের নিকট পাঠ করিলেন। এই সকল শ্লোকমালা তিরুবাই মুড়ি নামে প্রসিদ্ধ।

অদ্য তিনি তিরুবাই মুড়ি সমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য আপণে গিয়া ফল, তাম্বুল, পুষ্প, নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। অদ্য গুরুদম্পতিকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গৃহে আসিয়াছেন। কিন্তু গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তথায় কেহই নাই। তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোনও তত্ত্ব না পাইয়া, সম্মুখস্থ এক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মহাপূর্ণ স্ত্রীর সহিত শ্রীরঙ্গমে গমন করিয়াছেন। সহসা এরূপ গমনের কারণ কি, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্নীর নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে, তিনি কহি-লেন, "অদ্য প্রাতঃকালে কূপে জল আনিতে গিয়া তোমার গুরুপত্নীর সহিত

আমার কলহ হইয়াছিল। আমি কোনও বিশেষ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তাহাতেই মহাপুরুষের এত ক্রোধ যে, সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, সাধু হইলে অক্রোধ হয়েন। ইনি এক নূতন প্রকারের সাধু। তোমার সাধুর পদে কোটি কোটি নমস্কার।" তিনি ইহা শুনিয়া আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "অয়ি পাপিনি, তোর মুখদর্শন করিলেও মহাপাপ হয়।" ইহা কহিয়া ফল, তাম্বুল, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা আনিয়াছিলেন, তৎসমুদয় লইয়া শ্রীবরদরাজের অর্চনা করিবার জন্য তদীয় মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

রামানুজ গমন করিবার কিয়ৎকাল পরে এক জন শীর্ণকলেবর ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ দ্বারদেশ হইতে গৃহিণীর নিকট কিঞ্চিৎ অন্ন ভিক্ষা করিলেন। একে জমাম্বা পতির রূঢ়বাক্যে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহার উপর চুল্লির উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বশরীরকে স্বেদযুক্ত করিয়াছিল, সুতরাং ভিক্ষুকের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতিভাত হইল। তিনি রোষকষায়িতলোচনে, তারস্বরে কহিলেন, "যাও, যাও, অন্যত্র গমন কর। এখানে কে তোমায় অন্ন দিবে?" ব্রাহ্মণ দুঃখিতহৃদয়ে মৃদুপদসঞ্চারে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মন্দির হইতে প্রত্যাগত রামানুজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ব্রাহ্মণের শীর্ণকলেবর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্র, আপনার অদ্য আহার হয় নাই বোধ হয়।" বিপ্র কহিলেন, "আমি আপনার গৃহেই অতিথি হইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার ব্রাহ্মণী আমায় অন্ন দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।" রামানুজ কহিলেন, "না, আপনাকে ফিরিতে হইবে না। আপনি আমার সহিত অনুগ্রহ করিয়া আপণে আসুন; আপনার হস্তে আমি এক পত্র, হরিদ্রা, ফল, তাম্বুল, এবং একখানি নূতন বস্ত্র দিব। তাহা লইয়া আমার পত্নীকে দিবেন, এবং কহিবেন যে, আপনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে আসিয়াছেন। তাহা হইলেই আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করাইয়া ভোজন করাইবেন।" ইহা কহিয়া তিনি আপণ হইতে ঐসকল দ্রব্যক্রয় করতঃ বিপ্রের হস্তে দিলেন। এবং স্বীয় শ্বশুরের নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপে একখানি পত্র লিখিলেন।

বৎস, আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সেইজন্য তুমি জমাম্বাকে এই লোকের সহিত মদীয় ভবনে প্রেরণ করিও। যদি কার্য্যগৌরব

না থাকে, তাঁহা হইলে তুমিও এখানে আগমন করিলে আমি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিব। জমাম্বা না আসিলে আমায় অতিশয় কষ্টে পড়িতে হইবে, কারণ, বহুকুটুম্ব সমাগত হইলে তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ করা তোমার শ্বশ্রূর পক্ষে অতীব দুরূহ হইবে। ইতি।

পত্রখানি বিপ্রের হস্তে দিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন। বিপ্র গিয়া তাঁহাকে সেই সমস্ত দ্রব্য ও পত্র দিয়া কহিলেন, "আপনার পিতা আমায় প্রেরণ করিয়াছেন।" জমাম্বা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, এবং অতি সমাদরে বিপ্রকে স্নানার্থ উদক আনিয়া দিলেন। ইত্যবসরে রামানুজ গৃহে আসিলেন। অতি বিনীতভাবে পত্রখানি জমাম্বা রামানুজ হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "পিতা তোমায় এই পত্র দিয়াছেন।" রামানুজ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন, এবং কহিলেন, "আমার কোনও বিশেষ কার্য্য আছে। গমনে অনেক ক্ষতি হইবে। সুতরাং তুমিই আহারাদি করিয়া এই বিপ্রের সহিত পিত্রালয়ে গমন কর। কার্য্য শেষ হইলে আমিও পশ্চাৎ যাইতে চেষ্টা করিব। শ্বশুর শ্বশ্রূর পদে আমার প্রণাম জানাইও।" জমাম্বা স্বীকৃতা হইলেন।

আহারান্তে পতিপদে প্রণাম করিয়া বিপ্রের সহিত রামানুজপত্নী পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, এবং রামানুজও গৃহত্যাগ করিয়া বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে রামানুজ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "পাপানাং আকরাঃ স্ত্রিয়ঃ। বহুকষ্টে পিশাচিনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। হে নারায়ণ, দাসকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে হস্তিগিরিপতির (বরদরাজ) সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং কহিলেন, "হে নাথ, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার হইলাম। আমায় গ্রহণ কর।" ইহা কহিয়া কাষায় বস্ত্র ও দণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বরদরাজের শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করাইয়া, মন্দিরসম্মুখস্থ অনন্তসরোবর তীরে গমন করিলেন। স্নানান্তে তথায় আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে চিত্তৈষণা, দারৈষণা প্রভৃতি যাবতীয় এষণা আহুতি দিলেন। বরদাবিষ্ট শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে সেই সময় "যতিরাজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইরূপে সর্ব্ববিধ এষণা দগ্ধ করিয়া কায়মন ও বাক্যকে সর্ব্বদা বশে রাখিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সেই অরুণবসনধারী যতিরাজ সেই সময় নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণ মিশন, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

শাস্ত্রে কর্ম্ম শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ, মানুষ যাহা কিছু করে, তাহাকেই কর্ম্ম বলা হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্র যেখানে বলিতেছেন, কর্ম্ম হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, কর্ম্ম হইতে সূর্য্য চন্দ্র হইয়াছে, সেখানে কর্ম্ম শব্দ, যে অচিন্তনীয় কার্য্যকারণপ্রবাহ সমগ্র জগৎকে বীজাবস্থা হইতে বিশিষ্ট নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত করিতেছে, সেই কার্য্যকারণপ্রবাহকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। অদৃষ্ট অবস্থা হইতে দৃষ্ট অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই কর্ম্ম বলা হইয়াছে, অতএব গতিশক্তিই কর্ম্মের প্রধান লক্ষণ।

কর্ম্ম দ্বিবিধ;—সকাম ও নিষ্কাম। শাস্ত্র কোন কর্ম্মকেই মিথ্যা বলেন নাই। অনেকে বলেন, 'সংসারে থাকিয়া ভগবান পাওয়া যায় না। সংসারে মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করিতেছে, সব মিথ্যা। তাহা দ্বারা কখনও ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।' কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শাস্ত্র অবস্থাবিশেষে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। সংসারকে ছোট ও সন্ন্যাসকে বড় করেন নাই। অবস্থাবিশেষে সংসার কাহারও পক্ষে ঠিক আবার সন্ন্যাস কাহারও পক্ষে ঠিক, এই কথা বলিয়াছেন। সকল কর্ম্মই আমাদিগকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইতেছে। কোন কর্ম্মই মিথ্যা নয়। যাহা অত্যন্ত স্বার্থপর কর্ম্ম, তাহা করিতে করিতে লোকে বহুদর্শিতা লাভ করে ও অবশেষে নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়। নিষ্কাম ভাব কালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে স্বভাবতঃ সন্ন্যাস আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই যথার্থ সন্ন্যাস। ইহা ভোগ ও ত্যাগ, এই দুই লক্ষণের অধিকারভুক্ত নয়। ইহা ঐ দুয়ের বাহিরে। একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে মানুষ অগ্রসর হইতেই পারিবে না। পরমহংসদেব বলিতেন, শরীরের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইলে শুষ্ক চর্ম্ম আপনিই খসিয়া পড়ে। কিন্তু আরোগ্যলাভ হইবার পূর্ব্বে চর্ম্ম উঠাইতে প্রয়াস পাইলে যন্ত্রণা, রক্তপাত ও ক্ষতবৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

তিনি আরো বলিতেন, সংসার, সন্ন্যাস, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই মনুষ্যের উন্নতির মাত্রায় সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই জন্য যাহার যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা, তাহার পক্ষে সেইরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ছেলের

যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহা বুঝিয়া মা তাহার জন্ম উপযোগী পথ্য ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম ছাড়া নয়, তবে যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার পক্ষে সেইরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। কোন এক ধর্ম্ম সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না।

শাস্ত্রে দুটী মার্গের বর্ণনা আছে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যাহার সুখভোগের ইচ্ছা প্রবল, সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গেলে স্বভাবতঃ যাগযজ্ঞাদিলক্ষণ সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সুখাদি ভোগের পর যখন সে দেখিবে, কালে তাহার প্রাণ অন্য কিছু উচ্চ বস্তু চাহিতেছে, তখন সে আপনিই ইহা ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিবে। রাজা যযাতি পুরুর নিকট হইতে তাহার যৌবন গ্রহণ করিয়া সহস্র বৎসর ভোগ করতঃ যখন আবার তাহাকে ঐ যৌবন ফিরাইয়া দিতেছেন, তখন বলিতেছেন, কামের উপভোগে কাম কখন পরিতৃপ্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যযাতির এই বৈরাগ্য তাঁহার সহস্র বৎসর বিষয়োপভোগ ও সকাম কর্ম্মের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছিল।

পরমহংসদেব বলিতেন, এই প্রবৃত্তিমার্গ ছাতের সিঁড়িস্বরূপ, ইহা অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তিমার্গে—ছাতের উপরে—উঠিতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কাহার কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? ইহা নির্দ্ধারণ করিতে একমাত্র সদ্‌গুরুই সক্ষম। যাহার যেরূপ মানসিক অবস্থা, গুরু তাহার জন্ম সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন।

গুরুকরণ করিতে হইলে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের মত। গুরুর পুত্রকেই গুরু করিতে হইবে, ইহা প্রামাণিক সৎশাস্ত্রানুমোদিত নহে। গুরুকে বিশেষ দেখিয়া তবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। কিন্তু একবার বিশ্বাস করিলে আর কোনরূপ সন্দেহ করিবে না। পরমহংসদেব তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, খুব বাজিয়ে নে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি শাস্ত্র ছাড়া কোন কায করিতেন না। তাঁহার জীবন বেদবেদান্তের টীকাস্বরূপ। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই আসেন। হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষগণই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র ও ধর্ম্মের রক্ষণের জন্ম আসিয়াছেন, কোনও শাস্ত্র বা ধর্ম্ম ধ্বংসের জন্ম তাঁহাদের শরীর পরিগ্রহ নহে।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ—স্বার্থশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—আপনাকে ভুলিয়া নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ভগবানের জন্য কায করা। যাহার যেরূপ অবস্থা, সে সেইরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া কায করিতে পারে। এই স্বার্থশূন্য হইয়া কায করার নাম কর্ম্মযোগ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, স্বার্থপরতা কখনও কাহারও কি নিঃশেষে ত্যাগ হইতে পারে? আমরা দেখিতে পাই, কাহারও স্বার্থ নিজের উপর আবদ্ধ, কাহারও নিজের পরিবারের উপর, কাহারও দেশের উপর, আবার কাহারও বা সমুদয় জগতে বিস্তৃত। বুদ্ধদেব একটা ছাগলের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন। তাহাতেও কি স্বার্থপরতা নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, স্বার্থবিস্তৃতি ও নিঃস্বার্থতা একই বস্তু। যাহার মন বুদ্ধি নিজের শরীর মনের উপর আবদ্ধ,সেই যথার্থ স্বার্থপর ও কৃপাপাত্র। নিজের শরীর মন ছাড়িয়া অপরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া রূপ স্বার্থই নিঃস্বার্থতা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, সে স্বার্থ বন্ধনের কারণ না হইয়া মনুষ্যকে মনুষ্যনামের উপযুক্ত করে ও ভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নত হইতে থাকে, তাহার দৃষ্টি সেই পরিমাণে শরীর মন প্রভৃতির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইতে থাকে। পরিশেষে ক্ষুদ্র আমি এককালে চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে এক মহান্ আমির সমাবেশ হয়,যাহার ঘাত প্রতিঘাত সমগ্র জগৎ জুড়িয়া হইতে থাকে। ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থা বা মুক্তি বলে।

আমরা তিন প্রকারে অপরের উপকার করিতে পারি। কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইলে অন্ন দিয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারি। কিন্তু এই উপকার শরীরসম্বন্ধীয় ও ক্ষণস্থায়ী। ছয় ঘণ্টা পরে আবার তাহার ক্ষুধার উদ্রেক ও অভাব বোধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিতে পারি, যাহাতে সে নিজের জীবনোপায় নিজে করিয়া লইতে পারে। এই উপকার অনেক দিন স্থায়ী ও মানসিক। তৃতীয়,—আধ্যাত্মিক উপকার; ইহার ফল আরো বিস্তৃত। ইহার প্রভাবে তাহার অভাব চিরজীবনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই উপকার—ধর্ম্মোন্নত মহাপুরুষেরাই কেবল করিতে পারেন।

একদিন খ্রীষ্ট রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া একটী কূপের নিকট বসিয়া আছেন। একজন নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক জল লইতে আসিল। খ্রীষ্ট তাহার নিকট জল চাহিলে সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমার হাতে আপনি জল পান করিবেন? খ্রীষ্ট বলিলেন, বলিব, তুমি দাও। জল পান করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে

যে জল দিব, তাহাতে তোমার চিরজীবনের মত তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রে ও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারদের চরিত্রে এবং পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের জীবনে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যে কাযই করি না কেন, ভগবানের জন্য করিতেছি, নিজের জন্য নয়, এইরূপ ভাবিয়া করিতে হইবে। সামান্য রাস্তা ঝাঁট যে দেয়, সে যদি ভাবে যে, সাধুলোকের যাইবার জন্য বা সকল লোককে ভগবানের অংশবোধে তাহাদের সেবার জন্য রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, তাহা হইলে তাহার কোন কষ্ট থাকে না। এরূপ কোন কর্ম্মই নাই, যাহা সম্পূর্ণ ভাল, যাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। আমরা যে ভগবচ্চর্চ্চা করিতেছি, তাহাতেও সকলে উপকৃত হইতেছে না, মুখনিঃসৃত উষ্ণ বায়ুতে বায়ুসাগরে ভাসমান কত কীটাণুর মৃত্যু হইতেছে। সকল কাযই এইরূপ ভালমন্দমিশ্রিত হইলেও যদি নিঃস্বার্থভাবে করা যায়, তাহার দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। শরীর রক্ষার উপযোগী আহারশয়নাদি সম্বন্ধেও যদি ভাবা যায় যে, আহারশয়নাদির উদ্দেশ্য শরীররক্ষা, শরীর থাকিলে তবে ভগবৎসাধনা হইবে, অতএব আহারশয়নাদিও ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্যই করিতেছি, তবে ঐগুলিও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইল। এরূপ করিলে আর কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না ও তজ্জনিত সুখদুঃখে আক্রান্ত হইতে হইবে না এবং কর্ম্মও বন্ধনের কারণ হইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্ম অনাদি। এই কর্ম্মের দ্বারাই শাস্ত্র জগতের বৈষম্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্মের জন্যই এই বৈষম্য হইয়াছে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে সেইরূপ অবস্থা পাইয়াছে। কেহ কেহ এই বৈষম্যের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। ১ম, কেহ বলেন, জন্মসময়ে গ্রহাদি যেরূপ থাকে, মানুষ সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুভগ্রহ থাকিলে উত্তম জন্ম হয়, অশুভগ্রহ থাকিলে কুৎসিৎ জন্ম হয়। ইহার উত্তরে এই তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, আমারই বা অশুভগ্রহে জন্ম হইল কেন, অপরেরই বা শুভগ্রহে কেন জন্ম হইল? এই শুভাশুভ গ্রহ আমার জন্মগতির নির্দ্দেশক হইতে পারে, কিন্তু কারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ অবশ্য আর কিছু আছে, যাহার জন্য আমার অশুভ জন্ম হইতেছে ও অপরের শুভ জন্ম হইতেছে। ইহাকেই শাস্ত্র পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বলেন। ২য়, কেহ কেহ বলেন, পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সন্তানে গিয়া বর্ত্তে। পিতামাতার

রোগাদি সন্তানে প্রাপ্ত হয়, অতএব পিতামাতাই এই বৈষম্যের কারণ (Hrediitary Transmission)। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে পিতামাতার মানসিক শক্তির ক্ষয় হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না আর সামান্যশক্তিশালী পিতামাতা হইতেই বা অদ্ভুতগুণ-সম্পন্ন সন্তান কিরূপে উৎপন্ন হয়? শুদ্ধোদনের ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধদেবের ন্যায় সন্তান কিরূপে উৎপন্ন হইল, যিনি বাল্যকালেই সমাধিমগ্ন হইতেন? এইরূপ খ্রীষ্টের বিষয় বলা যাইতে পারে। পরমহংসদেবের বিষয় অনেকেই জানেন। ইহা কোথা হইতে হয়? কার্য্য কারণ হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন কখন হইতে পারে না। আমরা এই কর্ম্ম-বাদে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি, কিন্তু বংশানুক্রমিকসংস্কারবাদে তাহা করা যায় না। আর আমাদের এইরূপ প্রকৃতি যে, অন্যের উপর দোষারোপ করিতে পারিলে নিজে দোষ গ্রহণ করিতে চাই না। আমার এই কষ্টের কারণ কে? হয় ভগবান, নয় গ্রহনক্ষত্র, নয় পিতামাতা ইত্যাদি, কিন্তু আমি স্বয়ং যে আমার কষ্টের কারণ, তাহা একবারও বলি না। যে শক্তিদ্বারা আমি এই কষ্ট পাইতেছি, আবার তাহারই দ্বারা আমি উন্নত হইতে পারি। পাপ করিয়াছি, তাহাতে ভয় কি? আবার চেষ্টা কর, অনন্ত শক্তি তোমার ভিতর আবার জাগরিত হইবে। সাহস চাই, তেজ চাই; নির্জ্জীব মনের, নির্জ্জীব শরীরের ধর্ম্মলাভ হয় না। নির্ভয় হও, আবার চেষ্টা কর, কষ্ট কর, আবার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য।

(স্বামী ত্রিগুণাতীত।)

[প্রথম যে বৎসর কলিকাতায় প্লেগ প্রবেশ করে, সেই বৎসর ইহা কলি-কাতা, বাগবাজার, রামকৃষ্ণ মিশন সভায় পঠিত হয়।]

কম বেশ এক হাজার বৎসর গত হইল, কলির মানবের অবস্থা মলিন দেখিয়া, অতি ক্ষোভভরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

হায় ! বালককাল খেলায় কাটিয়া গেল, যৌবনে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত, যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন নানাপ্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন, জীবনে আর কখন পরমব্রহ্মে মন লাগাইতে পারিলেন না।

মানবের আরও শোচনীয় অবস্থা শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিতেছেন—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥

উঃ। কি দুর্ব্বিপাক ! বৃদ্ধ হইল, শরীরে জরা আসিল, দেহ কুব্জ হইয়া যাইল, দন্ত সমস্ত পড়িয়া গেল, ক্রমশঃ অতিবৃদ্ধ হইল,—এমন কি, যষ্টি-ভরে চলিতেও কলেবর কম্পিত হইতে থাকে—মৃত্যু যখন শিয়রে উপস্থিত, তখনও সে বৃদ্ধ, ভোগ-আশা ছাড়িতে পারিল না !! ইহা অপেক্ষা মানবের আর অধিক দুর্দ্দশা কি হইতে পারে !! শঙ্করাচার্য্য এক স্থলে বলিতে-ছেন,—

জন্তুনাং নরজন্মদুর্লভম্।

যত প্রকার সৃষ্ট জীব আছে, তাহার মধ্যে মনুষ্যজন্ম সুদুর্লভ। কেন সুদুর্লভ ? তাহার কারণ কি ?—

যল্লাভান্নাপরো লাভো—যাহা লাভ করিলে, আর কিছু লাভ করিবার অবশিষ্ট থাকে না, যজ্‌জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং—যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বাকি থাকে না, যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং—যাহা দর্শন করিলে আর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ—যাহা হইতে পারিলে আর পুনর্জন্ম হয় না ;—এমন যে পদার্থ, তাহা কেবল একমাত্র মানবজাতিতেই লাভ করিতে পারে, অন্য প্রাণীতে পারে না, এই জন্যই নরজন্ম এত দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়। এমন যে দুর্লভ নর-জন্ম আমরা হেলায় হারাইতেছি ; এমন যে অমূল্য মানব-জন্ম, তাহার সার্থকতা ও দায়িত্ব আমরা কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া, কেবল বিপরীত আচরণ দ্বারা নিজেদের যথেষ্ট অমঙ্গল নিজেরাই করিতেছি—ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি হইতে পারে !! শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা, যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং, প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষং॥

দুর্লভ নরদেহ, বিশেষ পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি মোক্ষ লাভের চেষ্টা না করিয়া পার্থিব অভীষ্ট-সাধনে তৎপর হয়, তাহার অপেক্ষা মূঢ় ব্যক্তি আর কে আছে? মোক্ষ-লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, আমরা বরং ক্রমশঃ অধিকতর মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। আজ মানবের এত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার কারণ কি? তাহাই সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করাই অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয়। যে মানব এক সময়ে রোগশূন্য ছিলেন, তিনি আজ কেন মারীভয়ে ভীত হয়েন? যে মানব এক কালে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, তিনি আজ কেন পীড়নভয়ে পলায়ন করেন? যে মানব পূর্ব্বে একমনে "ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ" প্রভৃতি গাথা নিয়ত গাইতেন এবং তদনুরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, তিনি আজ কেন নানা-প্রকার ভয়ে, নানাপ্রকার চিন্তায়, নিজের মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া মহা অশান্তিসাগরে নিমগ্ন করাইতেছেন? কেন? ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। আজ সেই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

একদিন যে জন-সমাজে একটী শিশুসন্তান নিজ জ্ঞান-গর্ভ উত্তরের দ্বারা প্রশ্নকারী অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী মহাত্মাকেও স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন; যে জন-সমাজের মাঝে একদিন, নচিকেতাসম তেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মানবের ঔরসে এক সময়ে শুকদেব প্রভৃতি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে মানবের দুর্দ্দশা আজ এরূপ হইল কেন? সে মানব আজ মূঢ় হইয়া নিজেকে নানাপ্রকার সঙ্কটাপন্ন মনে করে কেন?—ইহার কারণ, আমাদের সেই সনাতন তেজস্বিতার অভাব, সেই সনাতন বীর্য্যের অভাব, ইহার কারণ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। বিনা ব্রহ্মচর্য্য কোনও বিষয়েই উন্নতি করা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, "ব্রহ্মচর্য্যে"র অর্থ কি? এবং ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমরা কি বুঝি? পতঞ্জলির যোগ-সূত্রের ভাষ্যে এক স্থলে দেখিতে পাই— "ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিরমো বীর্য্যধারণঞ্চ"। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ এবং প্রধান লক্ষণ হইতেছে বীর্য্যধারণ। ঐহিক, পারত্রিক বা পারমার্থিক সকল প্রকার ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়েতেই হউক উন্নতি সাধন করিতে গেলে, বীর্য্য-ধারণ একমাত্র আবশ্যক। শরীর পালন বলুন, মন্ত্রসাধন বলুন, পরের উপকার করা বলুন, আত্মার উপকার করা বলুন, সকল কার্য্যই বিনা বীর্য্য বা তেজ

সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিকল্‌স্‌ ঠিক ঐ রূপই কথা বলিয়াছেন,—যথা "The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual life." অর্থাৎ বীর্য্যধারণ করিলে শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিরও বৃদ্ধি হয়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাই বলি, বিনা ব্রহ্মচর্য্য মানবের কোনও জীবনেই, পার্থিব জীবনেই বলুন, আর ধর্ম্মজীবনেই বলুন, কোনও জীবনেই প্রকৃত মঙ্গলের আশা নাই। পরমহংসদেব বলিতেন, যেমন কাচের পৃষ্ঠে পারদ দিলে সেই কাচে প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি যিনি রেত ধারণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি ঊর্দ্ধরেতা, তাঁহার বুদ্ধিতে ব্রহ্মের ছায়া পড়ে। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী, তাঁহাতে ব্রহ্মের ছায়া পড়ে। যে মানবের হৃদয়ে ব্রহ্মের ছায়া পড়ে, সে মানব যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারিবেন, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাই বলি, বিনা ব্রহ্মচর্য্য, আমাদিগের জীবনই বৃথা।

'ব্রহ্মচর্য্য' এই কথার আভিধানিক অর্থ হইতেছে "ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং" এখানে "ব্রহ্ম" অর্থ "বেদ'। অর্থাৎ বেদ পাঠের জন্য যে আশ্রম আচরণীয়। বেদপাঠ সাধারণতঃ বালক কালেই করিয়া থাকে, এই জন্য চার আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রমের নাম "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম"। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলকার পক্ষে, বিশেষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের, অবশ্য অবলম্বনীয়। "ব্রহ্মচারী" এই কথাটী 'ব্রহ্মচর' শব্দের উত্তর আবশ্যকে ণিনি প্রত্যয় করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অবশ্য আচরণীয়। কেন? তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যাবতীয় মহৎ মহৎ গুণ অভ্যাস করান হয়, এবং অতি সহজেই অভ্যাস করিতে পারাও যায়। আজকাল অনেক দেশেরই প্রথা হইয়া পড়িয়াছে যে, বাল্যকালে কেবল অর্থকরী বিদ্যাই অভ্যাস করিতে দেওয়া। ব্রহ্মবিদ্যা তো দেওয়াই হয় না, আর চরিত্রগঠনের দিকেও বড় একটা বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না। পূর্ব্বে কিন্তু, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা ছিল না। প্রথমেই চরিত্রগঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, পরে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইত, এবং অবশেষে কেহ কেহ অর্থকরী বিদ্যার উপদেশ দিতেন বটে। কিন্তু তখন সকলে জানিতেন যে, চরিত্র এবং জ্ঞানই বিশেষ

আবশ্যকীয়। চরিত্র এবং জ্ঞান যাহার আছে, তাহার অর্থ প্রভৃতি সমস্তই আপনা হইতেই আসিয়া যায়; চরিত্র ও জ্ঞান অর্থের অনুগামী নহে, অর্থ ইহাদিগের অনুগামী।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যাবতীয় মহৎ মহৎ গুণ গুলি অভ্যাস করা যায় বলিয়াই, ইহা অবশ্য আচরণীয়। মনু বলিতেছেন—

> সেবেতেমাংস্ত নিয়মান্, ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
> সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং, তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী নিজের তপস্যাবৃদ্ধির জন্য গুরুগৃহে বাস করতঃ এবং ইন্দ্রিয় সমস্ত সংযমন করিয়া এই এই নিয়ম পালন করিবে। যথা গুরুশুশ্রূষা, জপ তপাদি, অহিংসা কঠোরতা প্রভৃতি।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকল আশ্রমের মূল ভিত্তি। গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস তিন আশ্রমই, এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন কোন অট্টালিকার ভিত্তিমূল কাঁচা থাকিলে, সেই অট্টালিকা বৃহৎ ও সুন্দর হইলেও অস্থায়ী হয়; তেমনি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ভাল করিয়া পালন না করিলে, কোনও আশ্রমই সুসম্পন্ন হয় না—এমন কি, কোনও আশ্রমেরই অধিকারী পর্য্যন্তও হইতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিতেছেন ;—

> এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
> মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ॥
> অথানন্তরমাবেক্ষন্ যথাজিজ্ঞাসিতাগমঃ।
> গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্ব্বনুমোদিতঃ।
> গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ॥

ব্রহ্মচারী যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের তীব্র তপস্যা হেতু ব্রহ্মতেজে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবেন, এবং যখন তাঁহার সমস্ত বাসনা দগ্ধীভূত হইলে তিনি বিশুদ্ধচেতা হইবেন, তখন গুরু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবেন; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি যে আশ্রমে ইচ্ছা সেই আশ্রমে যাইতে পারেন—গৃহস্থও হইতে পারেন, বানপ্রস্থীও হইতে পারেন, অথবা সন্ন্যাসীও হইতে পারেন। ফলকথা, বিনা ব্রহ্মচর্য্য কোন আশ্রমেই অধিকার নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলেরই অবশ্য আচরণীয়।

ব্রহ্মচর্য্য এত উচ্চ, এত মহৎ ও এত আবশ্যকীয় যে, ইহা কেবল প্রথম আশ্রমের নাম নহে; ব্রহ্মচর্য্য যে কেবল বাল্যকালেই পালন করিতে হইবে, তাহা নহে। ব্রহ্মচর্য্য যে, কেবল মানবজীবনের ভিত্তিমূল অর্থাৎ বোনেদ্ প্রস্তুত করিয়া দিয়াই নিষ্কৃতি পান, তাহা নহে। ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্য যে কেবল মানবজীবনের প্রথম সোপানেই শেষ হইয়া যায়, তাহা নহে। ইহার কার্য্য মনুষ্যের যাবজ্জীবন ব্যাপিয়া থাকে। বিনা চুন্ সুরকী যেমন অট্টালিকা নির্ম্মাণ অসম্ভব, তেমনি ব্রহ্মচর্য্য বিনা মনুষ্যজীবনের গঠন বিড়ম্বনা মাত্র। ইমারতের কোন স্থানে চুন্ সুরকীর জোর কমিয়া যাইলে ইমারত যেমন সেই স্থলে ভগ্নপ্রায় হয়; সেইরূপ মানবজীবনের কোনও অংশে যদি ব্রহ্মচর্য্যের জোর হ্রাস হয়, সেই স্থলেই সে জীবনের পতন বলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যে সকল গুণ, প্রায় সে সমস্তই সকল আশ্রমেই প্রয়োজন হয়। প্রথম আশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের তো কথাই নাই. এমন কি, গার্হস্থ্য আশ্রমেও ব্রহ্মচর্য্য অত্যন্ত আবশ্যক। বিনা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য আশ্রম শাস্ত্র অনুসারে যাজন করা একেবারেই অসম্ভব। বিনা সংযমন, বিনা জিতেন্দ্রিয়তা, যাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই ব্যভিচার দোষে দূষিত হন, বেশ্যাগমন পাপে মগ্ন হন। যাহাতে যাঁহার অধিকার নাই, তাহা যদি তিনি গ্রহণ করেন বা ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যভিচার দোষ হয়। পরমহংসদেব গৃহস্থ প্রভৃতি সকল ব্যক্তিকেই বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সমস্ত কার্য্য কর,", আরও, খুঁটী ধরিয়া ঘোরা, চিঁড়ে কোটা, হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের জল আনা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন যে, কিরূপে ও কি ভাবে গৃহস্থ আশ্রম পালন করিতে হয়। তাঁহার উপদেশ অনুসারে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে গেলেই অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ অভ্যাস চাই, অগ্রে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করা চাই: সংযমন বিদ্যা অভ্যাস করা চাই। এক কথায়, অগ্রে সাধু হইতে হয়। সেই জন্যই কোন কোন মতে গার্হস্থ্য আশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে। গার্হস্থ্য আশ্রম অতি পবিত্র আশ্রম। গার্হস্থ্য আশ্রম পশুদিগের জন্য নয়; ইহা অতি পবিত্র—ইহা শুদ্ধচেতা ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত। ঈশ্বর, পশুদিগের জন্য কোনও আশ্রম সৃষ্টি করেন নাই। কোনও শাস্ত্রে এরূপ নাই যে, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া গৃহস্থ-আশ্রম পালন করিবে। যে আশ্রমে সাধু, সন্ন্যাসী, এমন কি, স্বয়ং নারায়ণ আসিয়া দ্বারস্থ হইতেছেন, সে আশ্রম কত পবিত্র, মনে করুন, সে আশ্রমে কত সাবধানে থাকিতে হয়, ভাবুন। বিনা ব্রহ্মচর্য্য, কি ব্রহ্মচারী,

কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থী বা কি সন্ন্যাসী, কাহারও মঙ্গল নাই; দেশেরও মঙ্গল নাই; এবং জগতেরও শান্তি নাই।

শুধু যে আমাদের দেশে ও আমাদের ধর্ম্মেই ব্রহ্মচর্য্যের এত আধিপত্য এবং এত আবশ্যকতা, তাহা নয়। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে ও যাবতীয় ধর্ম্মে, এই ব্রহ্মচর্য্যের গুণ সেই এক তানেই গাইতেছে। যে ব্রহ্মচর্য্য এই দেশে, সেই ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্রেই এক স্বরে বলিতেছে। পূর্ব্বে, পৃথিবীর আর কোথাও ব্রহ্মচর্য্য ছিল না, বৈদিক ঋষিরাই ভারতবর্ষে প্রথম ব্রহ্মচর্য্য স্থাপন করেন। প্রশ্নোপনিষদে আছে, সুকেশা ভারদ্বাজ প্রভৃতি ছয়জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন পিপ্পলাদ ঋষির নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতে আসেন, ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পুনর্বার এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা করিয়া আইস, পরে তোমাদিগকে জ্ঞান-উপদেশ দিব।" তদ্ব্যতীত ছান্দোগ্যের ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে কথিত আছে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া তবে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন।

এই ভারতবর্ষ হইতে সেই ব্রহ্মচর্য্যের বীজ ইজীপ্ট্ দেশে নিও-প্লেটোনিষ্টদিগের নিকট এবং গ্রীসদেশে পিথাগোরাস প্রভৃতির নিকট যায়। তাহার পরে ক্রমশঃ ইউরোপে স্থানে স্থানে কিছু কিছু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই তো গেল ইউরোপ আফ্রিকার কথা। এ দিকে এসিয়ার চারিদিকেও, এই ভারতবর্ষই, ব্রহ্মচর্য্যবীজ প্রেরণ করেন। পারস্য দেশে পার্সীগণ এখান হইতেই গ্রহণ করেন। পরে, বৌদ্ধগণ নানাদেশদেশান্তরে প্রেরণ করেন। বৌদ্ধগণের নিকট হইতে এসেনিসগণ গ্রহণ করেন। অবশেষে খ্রীষ্টানগণ কতক নিওপ্লেটোনিষ্টদিগের নিকট হইতে লয়েন, আর কতক এসেনিস্‌দিগের নিকট হইতে পান। পরে, খ্রীষ্টিয়ানগণও আর আর অনেক দেশে ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, যে যে দেশে এই ব্রহ্মচর্য্যের বীজ পরোক্ষে বা অপরোক্ষে যাইয়াছে, সেই সেই দেশ হইতে মহৎ মহৎ ব্যক্তি উদ্ভূত হইয়াছেন; এবং তাঁহারা স্ব স্ব দেশের ও জগতের যত হিতসাধন করিয়াছেন, তত তথাকার আর কেহ করিতে পারেন নাই। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেণ্ট পল্ ও সার আইজাক নিউটন্ প্রভৃতি মহাত্মাগণকে দেখুন। তাই বলি, যদি কেহ নিজের ও দেশের মঙ্গল চান তো, তিনি, যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, যেন ব্রহ্মচর্য্য চরণ করিতে না ছাড়েন।

ব্রহ্মচর্য্য শুধু ধার্ম্মিকের নিকটই যে আদরণীয়, তাহা নহে। যিনি ধর্ম্ম না

মানেন; যিনি ঈশ্বরবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি না মানেন; যিনি বেদ না মানেন, তাঁহার নিকটেও ব্রহ্মচর্য্য সমধিক ফলপ্রদ। কেন না, ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভূত শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী সম্পত্তি, পরলোকতত্ত্ব বা মুক্তিতত্ত্ব না মানিলেও, যাঁহারা জড়জ্ঞানবাদী এবং নিজের ও দেশের হিতৈষী, তাঁহাদিগের পক্ষেও সাতিশয় উপকারক। জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক এবং গুণী ও বড় লোক, তাঁহারাও এ ছয়টী সম্পত্তির সম্মাননা যথেষ্ট করেন। শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী সম্পত্তির কোন না কোন সম্পত্তিসম্পন্ন না হইলে কেহ কখনও কোনও মহৎ কার্য্য করিতে পারেন না। এই ছয়টী গুণ যথার্থই ছয়টী সম্পত্তি। শম দম যাহার অন্তরে আছে, তাহার আর ভাবনা কি? মহারাজাই হউন আর সম্রাটই হউন, তাঁহার ঘরে শম দম প্রভৃতি ছয়টী সম্পত্তি যদি না থাকে, তবে তো তিনি ভিখারী, তিনি অতি দরিদ্র। যাঁহার ঘরে টাকা আছে, যাঁহার বিষয় আছে, তাঁহাকে অহোরাত্র নানাপ্রকার চিন্তায়, নানাপ্রকার ভয়ে থাকিতে হয়; কিন্তু যাঁহার ঘরে শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি আছে, তিনি সম্রাটের অপেক্ষাও বড়; এমন কি, তিনি দেবগণেরও পূজ্য। প্রফুল্লতা ও সন্তোষ তাঁহার ঘরে আর ধরে না। বরং তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সেই ছয়টী সম্পত্তি অপর পাঁচ জনকে দুই হাত তুলিয়া দান করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? এই মহামারীর ভয়ে কত রাজা মহারাজা প্রভৃতি ধনিব্যক্তি প্রাণভয়ে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবর্গকে নিরাশ্রয়ে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন, যাঁহাদের অন্তরে ব্রহ্মচর্য্যের বীজ নিহিত আছে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে রহিয়াছেন, এবং আর দশজনকে অভয় প্রদান করিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য যাঁহাদিগের ভিতরে আছে, তাঁহারাই যথার্থ দেশহিতৈষী, তাঁহারাই যথার্থ ধন্য।

এক্ষণে কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে, "ব্রহ্মচারী" বলিতে কেবল ত্যাগী পুরুষকেই বুঝাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্য চার আশ্রমেতেই আছে। কিন্তু প্রধানতঃ ব্রহ্মচারী তিন রকমের হইতে পারে। যথা, উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ব্রহ্মচারী এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী কাহাকে বলি?—(ক) যিনি উপনয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদ-অধ্যয়ন করেন, সন্ধ্যাকর্ম্ম, অগ্নিকার্য্য, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষাচর্য্যা করেন, অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে যিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেন।

(২) গৃহস্থ ব্রহ্মচারী কাহাকে বলে,—

(না) ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া, যে যে কর্ম্ম করিবেন, সে সমস্ত ব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং ॥

অর্থাৎ যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যাহা হোম করিবে, দান করিবে, তপস্যা করিবে, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। ভগবান আরও এক স্থলে বলিতেছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি ॥

অর্থাৎ একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, তাহার ফলে কোনও অধিকার নাই, তোমার যেন কর্ম্মফলে বাসনা না থাকে এবং অকর্ম্মে তোমার যেন কখন আসক্তি না হয়। পরমহংসদেব বলিতেন যে, ধনীদের কার্য্য যেমন চাকরাণী লোকদেখানে আপনার বোধে করে, সেইরূপ ভাবে গৃহস্থের সংসার-কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এবং ইহাকেই গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য বলে।

(৩) সন্ন্যাসীদিগের মতন যাবজ্জীবন ত্যাগী পুরুষকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে।

এক্ষণে, এই ত্যাগী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিবাহ না করিলে বা গৃহস্থ আশ্রম পালন না করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। ইহার উত্তর এই যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই প্রধানতঃ দুইটী মার্গ চলিয়া আসিতেছে—প্রবৃত্তিমার্গ, আর নিবৃত্তিমার্গ। ইহা ঈশ্বর অভিপ্রেত। শ্রুতি বলিতেছেন, বৈরাগ্য যখনই আসিবে, তখনই ত্যাগ করিবে, তখনই সন্ন্যাস লইবে। তা বিবাহ করিবার আগেই হউক বা পরেই হউক। যথা, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বা বনাৎ বা, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, শুক প্রভৃতি ইঁহারা আজন্ম সন্ন্যাসী।

কেহ বলিতে পারেন যে, বিবাহ এবং সন্তানাদি উৎপন্ন না করিয়া, সংসার ত্যাগ করিলে নানাপ্রকার ঋণে বদ্ধ থাকিতে হয়, আর মুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে ভাগবতে আছে (১১৷৫৷৩৭) (রাজর্ষি জনককে ঋষভদেবের পুত্র শ্রীকরভাজন বলিতেছেন)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দদেবের শরণাগত হন, তাঁহার আর দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও নিকট ঋণ থাকে না।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে (১৬৭ । ২৬) নারদ ঋষি শুকদেবকে বলিতেছেন,—

পরিগ্রহং পরিত্যজ্য, ভব তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ। অর্থাৎ বিবাহ না করিয়া জিতেন্দ্রিয় হও।

Jesus ও বলিতেছেন :—And there be eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdon of heaven's sake. Mathew XIX. 12.

ব্রহ্মচারী বলিতে আমরা আরও কি বুঝি ?—ব্রহ্মচারী বলিতে বুঝিব, যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে। যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি অবশ্যই দয়াবান হইবেন। পরমহংসদেবের জীবনে শুনিয়াছি যে, তিনি একদা ঘাসের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, যাইতে যাইতে পশ্চাদ্দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলেন যে, যে ঘাস গুলির উপর হইতে পা তুলিযা লইয়াছেন, সেই দলিত ঘাসগুলি অতি কষ্টে খাড়া হইয়া উঠিতেছিল। ইহা দেখিয়া পরমহংসদেব কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন যে, উহাদিগেরও প্রাণ আছে, উহারা কতই কষ্ট পাইয়াছে। সেই অবধি আর তিনি ঘাসের উপর দিয়া যাইতে পারিতেন না।

আর এক সময় তাঁহার সম্মুখে, একটী লোক এক খানি নূতন থান ফাড়িয়া ফেলিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া চোমৃকে উঠিয়া বলিলেন, "ওরে, আমার বুক যেন ছিঁড়ে ফেল্লি ; আহা ! আস্তো ছিলো, আলাহিদা কোরে দিলি"।

প্রকৃত ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে এইরূপ দয়া আসা চাই। ব্রহ্মচারিগণের আর আব গুণ বলিতেছি,—তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষমাশীল হন, এবং সত্যভাষণ, মিষ্টভাষণ ও অহিংসা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হন। তাঁহারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ বিবেকী, বৈরাগ্যবান, মুমুক্ষু ও পূর্ব্বকথিত শমদমাদি-সম্পন্ন হন, এবং কাম ও ক্রোধকে সংযত করিতে থাকেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, অবিবাহিত জীবন কাটাইতে গেলে নানা-প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা ভুল। Dr. Nichols বলিতেছেন—"It is a medical—a physiological fact that the best blood in the body goes to from the elements of reproduction, in both sexes. In a pure and orderly life this matter is absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effiminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated, and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wretched nervous system, epilepsy, insanity and death." অর্থাৎ রক্তের সারাংশ হইতে শুক্র প্রস্তুত হয়। যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহাদিগের শরীরে এই পদার্থ পুনরায় রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে এবং শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া সেই মানবকে উদ্যমশীল, সাহসী ও বীর্য্যশালী করে। আর যিনি এই শুক্র নষ্ট করেন, তিনি ক্রমশঃ হতবীর্য্য হইয়া মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত, উন্মত্ত এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভগবান শিব বলিতেছেন ;—

ন তপস্তপ ইত্যাহু, ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু, সদেবো নতু মানুষঃ।
(জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)।

অর্থাৎ তপস্যাকে তপস্যা বলি না। ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধরেতা হন, তিনি দেবতা।

আমরাও সকলেই প্রায়, সচরাচর চাক্ষুস দেখিতে পাই যে, যাহারা ইন্দ্রিয়-

পরতন্ত্র, যাহারা কুকর্ম্মী, তাহারা কতই শক্তিবিহীন, ক্ষীণচেতা ও ক্ষুদ্রমনা হইয়া পড়ে; এবং কতই তাহারা দুঃখভাক্ ও নিরানন্দময় হইয়া পড়ে! আর দেখুন, যাঁহারা পুণ্যবান,যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা কেমন নীরোগ, তাঁহাদিগের কত তেজ, কত বল, কত সাহস, কতই বা তাঁহাদিগের আনন্দ।

পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি স্ত্রীত্যাগ করিতে পারেন, তিনি জগৎ ত্যাগ করিতে পারেন। অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর জগতে ত্যাগ করিতে বাকি কি আছে? যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় পথে যাঁহার মন আর ধাবিত হয় না, যাঁহার হৃদয়ে মহামায়া আর তরঙ্গ উঠাইতে পারেন না, জানিবেন, সেই শান্ত হৃদয়ে ব্রহ্মের ছায়া পড়িতে আর দেরি নাই; জানিবেন, সেই অকিঞ্চনের নিকট হইতে ভগবান আর দূরে থাকেন না, ভক্তবৎসল হরি তাঁহার সম্মুখে আর প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারেন না। তখন সেই ভক্তের প্রত্যেক লোম-কূপে পরমানন্দের অনুভূতি হইতে থাকে। এত অভাবনীয় সুখের উদয় হয় যে, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। তিনি সমাধিস্থ হন, অবিরত তৈল-ধারার ন্যায় সেই নিত্য সুখ ভোগ করিতে থাকেন। সেই পরমসুখের আশা করিতে গেলে—সেই নিত্য সুখ লাভ করিতে গেলে, মহদ্দুঃখের আকর স্বরূপ যে এই অনিত্য ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ, তাহার লিপ্সা ত্যাগ করিতে হয়—একে-বারে ত্যাগ করিতে হয়,—দু এক দিনের জন্য কপট সংযম করিলে হয় না—হৃদয় হইতে একেবারে বাসনার মূল উচ্ছেদ করিবা ফেলিতে হয়,—ফেলিলে, দেখিবেন—পূর্ব্বে সামান্য একটী ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখভোগ করিতেছিলেন, এখন দেখিবেন যে, সর্ব্বাঙ্গে কোটি ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছেন,—প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া সেই পরম নিত্যসুখ শরীরের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিতেছে—সেই পরমসুখ, আপনার শরীরকে ওত-প্রোতঃ ভাবে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে,—আপনার শরীর তখন সুখময় হইয়া যাইবে—সুখময় শরীর তখন সুখসাগরে ভাসিতে থাকিবে। তখন এই লৌহময় অপকৃষ্ট দেহ সেই পরশ-মণির স্পর্শে কাঞ্চনময় দেবশরীর হইয়া যাইবে,—আপনি তখন দেবতা হইয়া যাইবেন, দেবপূজ্য হইবেন।

হায়! ভ্রান্ত মানব এমন নিত্যসুখ হেলায় ছাড়িয়া এক ক্ষণিক জঘন্য পৈশাচিক সুখের আশায় মত্ত হইয়া বেড়াইতেছে, নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে না।

কতবার, কতপ্রকারের জন্ম গ্রহণ করিলাম। কত কোটি জন্ম জন্মাই-লাম। কৈ! কোনও জন্মেই ত জন্মাইবার মতন জন্মাইলাম না। কোনও জন্মে পশ্চাদ্ভাগে একবারের তরেও নিজের মঙ্গলের জন্য ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম না!

অনন্ত কালের সঙ্গে তুলনায়, একজন্ম তো কিছুই নয়। সেই অনন্ত জন্মের মধ্যে একটা জন্মও তো ঈশ্বরপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত করিলাম না! এতবার জন্মাইলাম, কৈ! কোন জন্মেও তো জগদীশ্বরের শরণাগত হইলাম না।

শরণ লইতে কিছু এত দীর্ঘ কাল লাগে না, তাঁহার পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিতে তো এক জন্মও লাগে না—এমন কি, এক মুহূর্ত্ত মাত্রও লাগে না—কেবল ইচ্ছা মাত্র আবশ্যক। এত সহজ—তাহাও পারি না!

উঃ! কি বিপরীত গতি! অল্প অল্প করিয়া কতদূর গহন অরণ্যের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি! বিপরীত অন্যায় গতি! রোধ করুন! বিপরীত গতি রোধ করুন!

এখনও সময় আছে, এখনও উপায় আছে। ফিরুন, ফিরুন; আর বিপরীত অন্যায় গতিতে অগ্রসর হইবেন না। আত্মহত্যা করিবেন না, ও আর আর সকলকেও মারিবেন না। নিজেকে রক্ষা করুন, জগতের হিত-কামনা করুন।

ঐ দেখুন, শিয়রে শ্মশান রাবণের চুলির ন্যায় অনবরত ধু ধু. শব্দে জ্বলিতেছে। পিতাকে রাখিয়া আসিলাম, স্নেহময়ী মাতাকেও লইয়া যাইলাম; ভার্য্যা যাইল, বন্ধু বান্ধব গেল; প্রিয়তম পুত্রকেও জ্বালাইয়া আসিলাম! তবু চেতন নাই! এখনও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ছাড়িলাম না! নিজে তো ছাড়িতে পারিলাম না; আবার, কচি কচি বাচ্ছা কন্যা পুত্রদিগকেও সেই ইন্দ্রিয়পর-তন্ত্রতায় মুগ্ধ করাইয়া দিতেছি। অতি শৈশব অবস্থাতেই বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া দিতেছি! আবার কি না যদি না যায়, তো, বাপ মায় জোর করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে!

উঃ। নিজের শিশু কন্যা পুত্রকে রাক্ষস রাক্ষসীর গ্রাসে ফেলিয়া দিতেছে! কি বীভৎস ব্যাপার! ইহা অপেক্ষা আর পৈশাচিকতা কি হইতে পারে?

ক্রমশঃ পাপ-সংসার বৃদ্ধি হইতেছে। পাপে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। মা বসুন্ধরা, বোধ হয়, পিশাচদিগের ভার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত

ভয়ঙ্কর কাঁপিয়া উঠিতেছেন। নিজের বক্ষে এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়াই বোধ হয় এক দীর্ঘনিঃশ্বাসে চট্টগ্রামকে উড়াইয়া দিলেন। বক্ষঃস্থলে আর আমাদিগকে স্থান দিতেছেন না, দেশ ছেড়ে সকলকে পালাইতে হইতেছে! আরও না জানি, আমাদিগের অদৃষ্টে কত আছে!

এখনও সময় আছে, এখনও উপায় আছে। এখনও ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন। এক মাত্র ব্রহ্মবীর্য্য এক মাত্র ব্রহ্মতেজ বিনা আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে বিবেক বৈরাগ্যের সহিত ইন্দ্রিয় সংযমন। যাঁহাদিগের অন্তরে ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযমন বেশী কঠিন নয়।

স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানই ইন্দ্রিয়দমনের একমাত্র প্রধান উপায়। আপনারা ছেলে বেলা হইতেই স্ত্রীলোককে অন্য চোখে দেখিতে শিখিয়া আসিতেছেন। স্ত্রীমাত্রকেই কখনও অন্তরের সহিত মা বলে ডাকেন নাই, তাই ইন্দ্রিয়দমন এত কঠিন। নিজেরা তো অধঃপথে গেছেন; ছেলেগুলোকে আর অধঃপথে ঠেলে পাঠাইবেন না। পুত্রের জনক হওয়া অতি সহজ, কিন্তু তাহাকে মানুষ করা অতি দায়িত্বের কায। ছেলে যদি খারাপ হয়, জানিবেন, নিশ্চয় জানিবেন, বাপ মাকেই আগে মহাপাপে মগ্ন হইতে হইবে। এ সমস্তের দায়িত্ব বাপ মার।

মানবের কর্ত্তব্য পূর্ব্বে নিজেকে তোয়ের করা এবং ছেলেকে কি কোরে শিক্ষা দিতে হয়, কি কোরে তোয়ের করিতে হয়, এ সমস্ত ভালরূপে শিক্ষা করা; তাহার পরে সন্তানাদি উৎপন্ন করিলে কোনও দোষের হয় না। সেই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকল আশ্রমের প্রথম আশ্রম, এবং অবশ্য আচরণীয়। ছেলে-দিগকে তো কত প্রকারের বিদ্যা শেখান। তাহার মধ্যে না হয়, ইন্দ্রিয় দমন আর একটা বিদ্যা শেখাইলেন—তাহাতে মহৎ উপকার বই তিলমাত্রও ক্ষতি নাই। যত বিদ্যা আছে, তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয় দমন এক মহাবিদ্যা।

নিজেরাই এখন ইন্দ্রিয় দমন করিতে শেখেন নাই, তা আর, ছেলেদের শেখাইবেন কি? তাই বলি, নিজেরা প্রথমে এই মহাবিদ্যা শিখুন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদিগকেও প্রাণপণে শেখান। এই বেলা থেকে প্রাণপণে শেখান। এই বেলা থেকে সব বীর প্রস্তুত করিতে থাকুন। Spartan motherরা—Sparta দেশের মায়েরা যেমন নিজ নিজ পুত্রদিগকে বীরত্ব শেখাইতেন, আপনারাও সেইরূপ শেখান। ভারতমাতা হইতেছেন বীর-

প্রসবিনী। সেই ভারত এখন বীরশূন্য—সেই জন্যই এত দুর্দ্দশা কিন্তু ভয় নাই। আবার ব্রহ্মচর্য্যকে পুনর্জ্জীবিত করুন। আবার সেই সনাতন ব্রহ্মতেজকে পুনরুদ্দীপিত করুন। এ সঙ্কট সময়ে ব্রহ্মতেজ বিনা গতি নাই।

সব নীচবৃত্তি ছাড়িয়া দিন। মনকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখুন। মনকে মূলাধার হইতে—নিম্নদেশ হইতে অনাহত বা সহস্রারে টানিয়া লউন। স্ত্রীমূর্ত্তিমাত্রেই দেবীমূর্ত্তি—সাক্ষাৎ দেবী মূর্ত্তি—ইট কাট মাটীর নয়—সাক্ষাৎ চৈতন্যময়ী ভাবুন। মা আমাদের সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী। এখনও চোখ ফুট্‌লো না? দেখুন দেখুন, মা আমাদের সাক্ষাৎ জগদম্বা। প্রাণভরে দেখিয়া লউন—দেখুন, বাহিরে দেখুন, আর ভিতরে দেখুন; বাহিরে দেখুন আর হৃদয়ে দেখুন;—দেখিয়া মস্তকে তুলিয়া রাখুন, সহস্রারে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অতি যতনে রাখিয়া দিন।

কিন্তু খবরদার! মনকে মূলাধারে নাবিতে দিবেন না, মনকে নিম্নগামী কদাচ করিবেন না। তা হলেই জানিবেন সর্ব্বনাশ—অনন্ত নরক। পতঙ্গ হইয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন না। মা আমাদের সাক্ষাৎ দেবী। সকল স্ত্রীমূর্ত্তিই আমাদের মা। খবরদার; অনন্ত নরক; নিজের মাকে অন্য চোখে দেখিবেন না, তাহা হইলেই অনন্ত নরক। দেবী মূর্ত্তি দেখিলেই যেমন প্রণাম করিতে ইচ্ছা যায়, পূজা করিতে ইচ্ছা যায়, মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা যায়; সেইরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেই যেন আমাদের ভক্তির উদ্রেক হয়, অগ্রেই যেন ভিতর থেকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা যায়। স্ত্রীলোককে কখন রমণী বা কামিনী বলিয়া জানিবেন না; দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানুন। পূর্ব্বেকার সমস্ত সংস্কার দূর করিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিন। জানিবেন, পূর্ব্বের সংস্কার সয়তানপ্রসূত এবং আসুরিক। এক্ষণে হৃদয়কন্দরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তথায় নূতন সংস্কারের আয়োজন করুন। শঙ্করাচার্য্য বলিতেন, "দ্বারং কিমেকং নরকস্য"—নরকের এক দ্বার কি?—(না) নারী। দেখিবেন যেন, স্ত্রীলোককে এরূপ চোখে না দেখেন, যাহাতে হৃদয় একটী নরককুণ্ড হইয়া যায়। স্ত্রীলোককে এরূপ চোখে দেখুন, যাহাতে হৃদয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, তথায় দেবমন্দির স্থাপনা করিতে পারেন। আসুরিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে শমদমাদি দৈবী সম্পত্তি লইয়া সেই হৃদয়কন্দরস্থ দেবমন্দিরে পূজার্থ গমন করুন। যিনি পিশাচীর উপাসনা করিতে চাহেন, যিনি পিশাচসিদ্ধ হইতে চাহেন, তিনি নরকে গমন করুন। এখানে তাঁর স্থান নাই। ভারত হইতে তাঁকে অবিলম্বেই পলায়ন করিতে হইবে জানিবেন। ভারতে দেবগণের বাস চিরকালই

থাকিবে। ভারত পিশাচগণকে বিনাশ করিয়া আবার নূতন সৃষ্টি করিয়া লইবেন। তাই বলি, পৈশাচিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সদ্বৃত্তির উপাসনা করুন। ব্রহ্মচর্য্যের বায়ু অহরহ সেবন করিতে থাকুন ; সে বায়ু আপনাদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় যাইয়া শরীরকে শোধন করিয়া যাবতীয় সাত্বিক বৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিক। যদি হিন্দু হন, যদি শাস্ত্র মানেন, যদি ঈশ্বর অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, এবং যদি স্বদেশের হিত সাধন করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

রামকৃষ্ণমিশন (নিউইয়র্ক।)

৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কোন সংবাদদাতা নিউ ইয়র্ক হইতে লিখিতেছেন,—"এখানে রামকৃষ্ণমিশনের কার্য্য বেশ চলিতেছে। স্বামী অভেদানন্দের প্রাণপণ যত্নে বেদান্ত সভাব দিন দিন উন্নতি হইতেছে। তিনি গত তিন মাস ধরিয়া প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে অগ্রসর ছাত্রগণের উপযোগী, উপনিষদ্ হইতে 'মৃত্যুরহস্য' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। বিষয় কঠিন হইলেও সভাস্থল প্রতিবারেই পূর্ণ হইয়া যায়। কার্ণেগি লিসিয়মে প্রতি রবিবার সময়ে সময়ে ৬০০ শ্রোতার সমক্ষে সাধারণোপযোগী বক্তৃতা হয়। বালক বালিকাগণের জন্য প্রতি শনিবার যে আর একটী ক্লাস হয়, তাহাতে তাহাদের এত উপকার হইতেছে যে, দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে। গত জানুয়ারি হইতে আগামী এপ্রিল পর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের নাম দেওয়া গেল—বেদান্ত ও প্যানৃথিয়িজ্‌ম, প্রাণায়াম, খ্রীশ্চিয়ান সায়েন্স নামক আমেরিকার প্রচলিত নব্যমতটীতে কতটুকু সত্য আছে, একাগ্রতার শক্তি, খ্রীষ্ট কি যোগী ছিলেন, আত্মসংযমের উপায়, প্রাচীন ও আধুনিক স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম, ব্রহ্মযোগ ; কর্ম্মরহস্য, কর্ত্তব্য বা কার্য্যের অভিসন্ধি, বংশানুক্রমিকতা (Heredity) ও পুনর্জ্জন্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্ত, জগন্মাতার উপাসনা, প্রার্থনা সফল হয় কি না, খ্রীষ্ট কি যোগী ছিলেন (পুনর্ব্বার), প্রেমবলে মুক্তিলাভ, ঈশ্বরের অবতার।"

এবং 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র অপবাদ হওয়াতে, 'উৎসর্গে' এবং 'অপবাদে' বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলবিরোধ) ই অসঙ্গত।

ভাষ্যমূল।—অথাপি কথঞ্চিদিকো গুণবৃদ্ধী ইত্যস্যাবকাশঃ স্যাৎ। এবমপি যথেহ বিপ্রতিষেধাদিকো গুণোভবতি মেদ্যতি মেদ্যতঃ মেদ্যন্তি ইতি। এবমিহাপি প্রাপ্নোতি। অনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুবিতি।

এবং তর্হি বৃদ্ধির্ভবতি গুণোভবতীতি যত্র ব্রূয়াদিক ইতি তত্র উপস্থিতং দ্রষ্টব্যম্। কিং কৃতং ভবতি। দ্বিতীয়া ষষ্ঠী প্রাদুর্ভাব্যতে। তত্র কামচারঃ। গৃহ্যমাণেন বেকং বিশেষয়িতুম্। ইকা বা গৃহ্যমাণম্।

যাবতা কামচারঃ। ইহ তাবন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্রক্ষুদ্রেষু গৃহ্যমাণেনেকং বিশেষয়িষ্যামঃ। এতেষাং য ইগিতি। ইহেদানীং জুসি সার্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোগুণেষ্বিকা গৃহ্যমাণং বিশেষয়িষ্যামঃ। এতেষাং গুণোভবতি ইকঃ। ইগন্তানামিতি।

অথবা সর্ব্বত্রৈবাত্র স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। ইহ তাবন্মিদেরিত্যবিভক্তিকো নির্দ্দেশঃ। মিদ এঃ মিদেঃ মিদেরিতি। অথবা ষষ্ঠী সমাসো ভবিষ্যতি মিদইঃ মিদিঃ মিদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।- যদিও 'চয়নং' 'লবণং' ইত্যাদি স্থলে 'চি' ধাতু বা 'লূ' ধাতুর মধ্যে কেবল একটী মাত্র 'ইক্' থাকাতে, তাহাও আবার অন্ত্য বর্ণই হওয়াতে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে বটে; তথাপি কোনও প্রকারে 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রেরও ত অবকাশ আছে? অর্থাৎ 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র যখন, পূর্ব্বাপর যাবতীয় 'ইক্' এরই 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' করে, তখন 'চি' এবং 'লূ' ধাতুর 'ইক্' অন্ত্য বিশিষ্ট হইলে, তাহারও ত 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রানুসারেই করিবে?

এইরূপ করিলেও যেইস্থলে, তুল্যবলবিরোধে পরকার্য্য হয়, বলিয়া পর (ইষ্ট) কার্য্য, 'ইক্' এর গুণ হইবে, যেমন, 'মিদ্' ধাতুর 'সার্বধাতুক' বা 'আর্দ্ধধাতুক' পরে থাকিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইক্' এর গুণ হয় বলিয়া, 'ই'কারের গুণ হইয়া, 'মেদ্যতি' 'মেদ্যতঃ' 'মেদ্যন্তি' প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়াছে; সেরূপ 'অনেনিজুঃ,' 'পর্য্যবেবিষুঃ' এস্থলে 'নিজ' ধাতু 'বিষ' ধাতুর ও, 'নি'বা 'বি'র উত্তরবর্ত্তী 'ই'কারেরও গুণপ্রাপ্তি হইবে?

এরূপ দোষ হইলে, তবে যেখানে 'বৃদ্ধি হয়' 'গুণ হয়' এইরূপ আদেশ করা হইবে, সেখানে 'ইকঃ' এইরূপ একটী ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি দেখিতে (জানিতে) হইবে।

কি হইবে ?

দ্বিতীয় একটী ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) করিতে হইবে। তাহা হইলেই 'অঙ্গস্য' প্রভৃতি অধিকারবোধক সূত্রের উত্তর যেখানে 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হইবে, সেখানে 'ইকঃ' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হইবে। আর সেস্থলেও উহা (ইকঃ) স্বকীয় ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। তাহা হইলেই গৃহ্যমান ('মিদেগুর্ণঃ' প্রভৃতি) সূত্রের সহিত 'ইক্' এর বিশেষণ করিতে পারিব, অথবা 'ইক্'এর সহিত গৃহ্যমান সূত্রসমূহের বিশেষণ করিতে সমর্থ হইব। আর যেহেতু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইব ; সেই হেতু, "মিদ্ ধাতু, মৃজ্ ধাতু, পুগন্তলঘূপধকধাতু, ঋচ্ছধাতু, দৃশ্ ধাতু, ক্ষিপ্র শব্দ" এই সকল স্থলে, 'মিদেগুর্ণঃ' প্রভৃতি গৃহ্যমাণ সূত্রসমূহের সহিত 'ইক্'এর বিশেষণ করিবে ; তাহা হইলেই এরূপ অর্থ হইবে যে, "এই সকল স্থলের যে 'ইক্,' তাহাদের 'গুণ' এবং বৃদ্ধি হয়।" আর, 'জুস্' পরে থাকিলে, 'সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যাহাদের গুণ হয়, অথবা 'হ্রস্বাদি'র যেখানে গুণ হয়, সেখানে, এক্ষণে 'ইক্' এর সহিত এই সকল গৃহ্যমাণ ('জুসি চ' প্রভৃতি) সূত্রসমূহের বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই ইহাদিগের যে 'গুণ' হইবে, তাহা 'ইক্'এর স্থানেই হইবে। সুতরাং 'জুসি চ' প্রভৃতি সূত্রে গুণ হইতে, 'ইক্' অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদেরই হইবে। তবেই 'নিজ্' ধাতুর অন্ত্যবর্ণ 'ইক্' না হওয়াতে, 'অনেনিজুঃ' প্রভৃতি স্থানে কোন দোষও হইবে না।

অথবা এই সর্ব্বত্রই 'স্থানী'র নির্দ্দেশ করা হইবে। তাহা হইলে, 'মিদেগুর্ণঃ' এই সূত্রের বিভক্তিবিহীন নির্দ্দেশ করা হইবে। যেমন,—মিদ এঃ ('ই' ষষ্ঠীর একবচনে 'এঃ') 'মিদেঃ' অর্থাৎ ইহাতে সূত্রেই 'মিদ্' ধাতুর ইকারের গুণ 'গুণ' উল্লিখিত হইল, অতএব 'মিদেঃ' সূত্রে এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অথবা 'মিদেগুর্ণঃ' সূত্রে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা হইবে। যেমন, —'মিদঃ' 'ইঃ' 'মিদিঃ' অর্থাৎ 'মিদ্' ধাতুর স্থিত যে ইকার, (মিদির ষষ্ঠীর এক বচনে) মিদেঃ অর্থাৎ সেই 'ই'কার স্থানে গুণ হয় ; এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—পুগন্তলঘূপধস্যেতি নৈবং বিজ্ঞায়তে পুগন্তাঙ্গস্য লঘূপধস্য চেতি। কথং তর্হি পুকি অন্তঃ পুগন্তঃ লঘ্বী উপধা লঘূপধা পুগন্তশ্চ লঘূপধা চ পুগন্তলঘূপধং পুগন্তলঘূপধস্যেতি। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। অঙ্গবিশেষণে সতীহপ্রসজ্যেত। ভিনত্তি ছিনত্তীতি।

ভ ষ্যানুবাদ।—'পুগন্তলঘুপধস্য' এই সূত্রের দ্বারা এইরূপ অর্থ জানা যাইতেছেনা যে —'পুক্' অন্তে আছে যার এমন যে অঙ্গ, সে 'পুগন্ত' এবং লঘু উপধা অন্তে আছে যার সে 'লঘূপধ'; এবম্ভূত পুগন্তাঙ্গের এবং লঘূপধার।

তবে কিরূপ?

পুক্ পরে আছে এমন যে অন্ত, সে পুগন্ত, লঘু যে উপধা, সে লঘূপধা; পুগন্ত এবং লঘূপধা, সে পুগন্তলঘূপধ, তাহার, পুগন্তলঘূপধের। ইহা (এইসূত্র) এইরূপ (অর্থবিশিষ্ট) অবশ্য জানিতে হইবে। অন্যথা, অঙ্গের বিশেষণ করিলে 'ভিনত্তি' 'ছিনত্তি' প্রভৃতি শব্দে, 'ভি' এবং 'ছি'র 'ই'কারের, উপধাবিহীন হইলেও গুণপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে।

ভাষ্যমূল।—ঋচ্ছে-পি পশ্লিষ্টনির্দ্দেশোয়ং ঋ ঋ ঋতাম্। ঋচ্ছত্যৄতামিতি।

দৃশেরপি যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। উরঙি গুণঃ। উঃ অঙি গুণোভবতি। ততো দৃশঃ। দৃশেশ্চাঙি গুণো ভবতি। উরিত্যেব।

ক্ষিপ্রক্ষুদ্রয়োরপি যণাদিপরং গুণ ইত্যেয়তাসিদ্ধম্। সোঽয়মেবং সিদ্ধে সতি যৎপূর্ব্বগ্রহণং করোতি তস্যৈতৎ প্রয়োজনম্। ইকো যথা স্যাদনিকো মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ঋচ্ছত্যৄতাম্' (১) সূত্রে, ঋচ্ছের উত্তর ও প্রশ্লিষ্ট (আক্ষিপ্ত বা উহ্য) নির্দ্দেশ—'ঋ ঋ ঋতাম্' এইরূপ জানিতে হইবে। তৎপরে ঐ 'ঋতাম্' শব্দ, ঋচ্ছতি শব্দের সহিত সমাস করিয়া 'ঋচ্ছত্যৄতাম্' এইরূপ পদ সিদ্ধ হইবে।

'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' (২) এই সূত্রে, 'দৃশের্'ও যোগবিভাগ করা হইবে। তাব এক ভাগ করা হইবে, 'উঃ অঙি গুণঃ'; ঋকারের, অঙ্ পরে থাকিলে গুণ হয়। পর 'দৃশঃ' এইরূপ আর একভাগ করিব; অর্থ হইবে—অঙ্ পরে থাকিলে, দৃশ্ ধাতুরও গুণ হয়। আর পূর্ব্বোক্ত 'উরঙি গুণঃ' সূত্রের অনুবৃত্তি আনিয়া অর্থ এইরূপ হইবে যে, 'দৃশ্' ধাতুর গুণ, ঋকারেরই হয়।

স্থূলদূরযুব হ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ৬।৪।১৫৬। (এই সকল শব্দের উত্তর ইষ্ঠাদি প্রত্যয় হইলে, যণাদি পরে থাকিলে, তাহাদের লোপ হয় এবং পূর্ব্বের গুণ হয় যথা,—'স্থেপিষ্ঠঃ' 'ক্ষোদিষ্ঠঃ' ইত্যাদি) এই সূত্রে, 'ক্ষিপ্র এবং ক্ষুদ্র শব্দেরও যণাদি পরে থাকিলে গুণ হয়' এইরূপ বলিলেই গুণ সিদ্ধ হইত। সুতরাং তাহা এইরূপে সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন সূত্রে, 'পূর্ব্বস্য চ গুণঃ' এইরূপ পূর্ব্বশব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইহাই প্রয়োজন

(১) (২) এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যে,—পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছে যে 'ইক্', তাহারই যাহাতে 'গুণ' হয়, এবং 'ইক্' ভিন্ন অন্য বর্ণের গুণ না হয়। এইরূপে সর্ব্বত্রই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথ বৃদ্ধিগ্রহণং কিমর্থম্। কিং বিশেষণ বৃদ্ধিগ্রহণং চোদ্যতে ন পুনর্গুণগ্রহণমপি। যদি কিঞ্চিদ্‌গুণগ্রহণস্য প্রয়োজনমস্তি বৃদ্ধিগ্রহণস্যাপি তদ্ভবিতুমর্হতি। কো বা বিশেষঃ।

অয়মস্তি বিশেষঃ। গুণবিধৌ ন ক্বচিৎ স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। তত্রাবশ্যং স্থানি নির্দ্দেশার্থং গুণগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। বৃদ্ধিবিধৌ পুনঃ সর্ব্বত্রৈব স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। অচোঞ্ণিতি। অত উপধায়াঃ। তদ্ধিতেষ্বচামাদেরিতি।

অত উত্তরং পঠতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে,—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি?

'বৃদ্ধি' শব্দে, 'গুণ' শব্দাপেক্ষা কি বিশেষ দেখিয়া, 'বৃদ্ধি' গ্রহণেরই উল্লেখ হইল, কিন্তু পুনঃ 'গুণ' গ্রহণেরও উল্লেখ হইল না? যদি 'গুণ' শব্দ গ্রহণের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হয়, তবে 'বৃদ্ধি' শব্দ গ্রহণেরও তাহাই প্রয়োজন হইতে সমর্থ হইতে পারে? ইহাতে আর বিশেষ কি আছে?

বিশেষ এই আছে যে,—গুণ বিধিতে কোথাও স্থানীর নির্দ্দেশ নাই, (যেমন,—'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' এই সূত্রে, সার্ব্বধাতুক বা আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, কাহার স্থানে গুণ হইবে, এমন কোন স্থানীর উল্লেখ হয় নাই) অতএব সেই স্থলে স্থানীর নির্দ্দেশের জন্য, এইসূত্রে গুণ শব্দের গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধি বিধানে সর্ব্বত্রই স্থানীর নির্দ্দেশ হইয়াছে। যেমন,—অচোঞ্ণিতি। ৭।২।১১৫। (ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ পরে থাকিলে অজন্তাঙ্গের বৃদ্ধি হয়) সূত্রে 'অচ্' এর স্থানে বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থানীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অত উপধায়াঃ। ৭।২।১১৬। (উপধাভূত যে অকার তাহার বৃদ্ধি হয়, ঞিৎ এবং ণিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রেও স্থানী 'অ'কারের উল্লেখ আছে।

তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ।৭।২।১১৭। ('ঞ') ইৎ এবং 'ণ'ইৎ বিশিষ্ট তদ্ধিত পরে থাকিলে, অচ্ সমূহের মধ্যে যে আদি 'অচ্', তাহার বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রেও স্থানী অচের উল্লেখ আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি?

অনন্তর ইহার উত্তর (বার্ত্তিককার) পাঠ করিতেছেন।

বার্ত্তিকমূল। বৃদ্ধিগ্রহণমুত্তরার্থম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রে, অনুবৃত্তি হওয়ার জন্যই বৃদ্ধি গ্রহণ করা হইয়াছে।*

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধিগ্রহণং ক্রিয়তে উত্তরার্থম্। ক্ক্ঙিতিপ্রতিষেধং বক্ষ্যতি স বৃদ্ধেরপি যথা স্যাৎ। কশ্চেদানীং ক্ঙিৎপ্রত্যয়েষু বৃদ্ধেঃ প্রসঙ্গঃ। যাবতা ঞ্ণিতীত্যুচ্যতে। তচ্চ মৃজার্থম্। মৃজের্বৃদ্ধিরবিশেষেণোচ্যতে সেহপি যথা স্যাৎ। মৃষ্টঃ মৃষ্টবানিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের যে গ্রহণ করা হইয়াছে, উত্তর (পর) সূত্রে প্রয়োজন হইবার জন্য। ক্ক্ঙিতি চ ।১।১।৫ (গ ইৎ, ক ইৎ এবং ঙ ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না) এই সূত্রানুসারে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা হইবে, সেই নিষেধ যাহাতে কেবলমাত্র গুণের না হইয়া, বৃদ্ধিরও হয়, এজন্যই 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ প্রয়োজনীয়।

এখন কোথায় গ, ক্ বা ঙ্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে,বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে? (যে জন্য নিষেধ করিতে পারে?) যাবতীয় স্থলে ত, 'ঞ' বা 'ণ' ইৎ হইলেই বৃদ্ধি বলা হইয়াছে?

বার্ত্তিকমূল।—মৃজার্থমিতি চেদ্‌যোগবিভাগাৎ সিদ্ধম্ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'মৃজ্' ধাতুর জন্য, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা যোগবিভাগ দ্বারাই সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূল।—মৃজার্থমিতি চেদ্ যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। মৃজের্বৃদ্ধিরচঃ। ততো ঞ্ণিতি। ঞ্ণিতি চ বৃদ্ধির্ভবতি। অচইত্যেব। যস্যচো বৃদ্ধিরুচ্যতে। ন্যমার্ট্ অটোহপি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি 'মৃজ' ধাতুর জন্যই 'বৃদ্ধি' শব্দগ্রহণের প্রয়োজন হয়; তবে যোগ বিভাগ করা হইবে। তাহা হইলে, এক ভাগ করা হইবে,— 'মৃজের্বৃদ্ধিরচঃ' (অর্থ হইবে,—'মৃজ' ধাতুর অচ্ এর বৃদ্ধি হয়), তার পরে, পরভাগ করা হইবে,—ঞ্ণিতি, অর্থ হইবে,—ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ পরে থাকিলে, বৃদ্ধি হয়, আর সেই 'বৃদ্ধি' ও 'অচ্'এর স্থানেই হইবে।

যদি 'অচ্' বলিতে, যাবতীয় 'অচ্'এরই 'বৃদ্ধি' হয়; তবে 'ন্যমার্ট্' (নি+অমার্ট্, 'মৃজ' ধাতুর 'লুঙ্' এতে যেখানে, 'লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ। ৬।৪।৭১।' সূত্রানুসারে, 'অট্' আগম করা হইয়াছে, সেখানেও) 'অট্' এর বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

বার্ত্তিকমূল।—অটি চোক্তম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অট্' আগমেও যে কোন দোষ হইবে না, তাহা উক্ত হইয়াছে। *

ভাষ্যমূল।—কিমুক্তম্। অনন্ত্যবিকারেঽন্ত্যসদেশস্য কার্য্যং ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।– কি বলা হইয়াছে?

যে স্থলে অন্ত্যবর্ণের বিকার হয় নাই, সে স্থলে, অন্ত্যবর্ণের সদেশ অর্থাৎ অধিকতর নিকটবর্ত্তী বর্ণেরই কার্য্য হইয়া থাকে। (এজন্য 'ন্যমার্ট্'এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'অট্' আগমের 'অ'কার অন্ত্যবর্ণের নিকটবর্ত্তী না হইয়া অনেক দূরবর্ত্তী হওয়াতে, 'বৃদ্ধি'র প্রাপ্তি হইবে না)।

বার্ত্তিকমূল। বৃদ্ধিপ্রতিষেধানুপপত্তিস্ত্বিক্‌প্রকরণাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'অচ্'এর বৃদ্ধি বলা যায়, তবে 'ইক্' প্রকরণোল্লিখিত বৃদ্ধিরই নিষেধ হওয়াতে, অচ্ স্থানীক বৃদ্ধির নিষেধ প্রতিপন্ন হইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধেস্তু প্রতিষেধো নোপপদ্যতে। কিং কারণম্। ইক্‌প্রকরণাৎ। ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈবং সতি মৃজেরিগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধির্ভবতি। তস্মান্মৃজেরিগ্‌লক্ষণাবৃদ্ধিরেষ্টব্যা। এবং তর্হি। ইহান্যে বৈয়াকরণা মৃজেরজাদৌ সংক্রমে বিভাষা বৃদ্ধিমারভন্তে। পরিমৃজন্তি। পরিমার্জন্তি। পরিমমৃজতুঃ। পরিমমার্জতুরিত্যাদ্যর্থম্। তদিহাপি সাধ্যম্। তস্মিন্ সাধ্যে যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। মৃজের্বৃদ্ধিরচো ভবতি। ততোঽচি ক্ঙিতি। অচি ক্ঙিতি মৃজের্বৃদ্ধির্ভবতি। পরিমার্জন্তি। পরিমমার্জতুঃ। কিমর্থমিদম্। নিয়মার্থম্। অজাদাবেব ক্ঙিতি নান্যত্র। কান্যত্র। মাভূৎ। মৃষ্টঃ। মৃষ্টবানিতি। ততো বা। বাচি ক্ঙিতি মৃজের্বৃদ্ধির্ভবতি। পরিমৃজন্তি। পরিমার্জন্তি পরিমমৃজতুঃ। পরিমমার্জতুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।– (কগ্‌ঙ্‌ ইৎ নিমিত্ত) বৃদ্ধি উপপন্ন হইবে না।

কারণ কি?

'ইক্' প্রকরণ হেতু। কারণ, ক, গ, বা ঙকার ইৎনিমিত্তক যে নিষেধ; তাহা, কেবল 'ইক্' লক্ষণক গুণ বা বৃদ্ধিরই হইয়া থাকে। যদি এইরূপ হয়, অর্থাৎ 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' সূত্রে 'অচ্'এর বৃদ্ধি হয়, তবে 'মৃজ্' ধাতুর, 'ইক্'-লক্ষণসম্পন্ন বৃদ্ধি হইবে না। সেই হেতুই 'মৃজ্' ধাতুর, 'ইক্' লক্ষণ সম্পন্ন বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ হইলে অর্থাৎ 'অচ্'এর গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ না হইয়া 'ইক্'এর নিষেধপ্রাপ্তি হইতে পারে; এজন্যই যদি 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' সূত্রে, 'ইক্'এর বৃদ্ধি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন; তবে এই পক্ষ গ্রহণ করিব যে, এইস্থলে অন্যান্য বৈয়াকরণগণ, অজাদির সহিত মৃজ্' ধাতুর সংক্রমণে (সংযোজনে) বিকল্পে বৃদ্ধির আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন,—(বৃদ্ধ্যভাব পক্ষে) পরিমৃজন্তি। (বৃদ্ধি পক্ষে) পরিমার্জন্তি। এইরূপ, পরিমমৃজতুঃ, পরিমমার্জতুঃ, ইত্যাদি প্রয়োগের জন্য। তাহা (বিকল্প) এইস্থলেও সাধনীয়। সুতরাং তাহা সাধনীয় প্রতিপন্ন হইলে, যোগ বিভাগ করা হইবে। তাহার একাংশ হইবে;—'মৃজের্বৃদ্ধিরচোভবতি' অর্থাৎ 'মৃজ্' ধাতুর অচেরই বৃদ্ধি হয়। তৎপরে অপরাংশ করিব—'অচিক্ঙিতি,' সমুদায় মিলিয়া অর্থ এই হইবে যে, ক, গ, এবং ঙ ইৎবিশিষ্ট অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'মৃজ' ধাতুর বৃদ্ধি হয়। যেমন,—'পরি'পূর্ব্বক 'মৃজ' লট্ এর 'ঝি' (অন্তি) করিয়া 'পরিমার্জন্তি' এবং 'লিট্'এর 'অতুস্' করিয়া 'পরিমমার্জতুঃ' প্রয়োগ হইবে।

ইহা কি জন্য?

ইহা এই নিয়ম করিবার জন্য যে, 'অচ্' আদিতে আছে যার, এমন 'ক' 'গ' এবং 'ঙ' ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, তৎপ্রযুক্ত গুণ বা বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু অন্যত্র নহে।

অচ্ আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় ভিন্ন অন্যত্র কোথায় প্রাপ্তি সম্ভব আছে?

'মৃষ্টঃ' 'মৃষ্টবান্,' (মৃজ ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু' প্রত্যয় করিয়া 'মৃষ্টঃ' 'মৃষ্টবান্' হইয়াছে) এই সকল হলাদি প্রত্যয় স্থলে যাহাতে বৃদ্ধি না হয়।

তদনন্তর 'বা' শব্দ সংলগ্ন করিব। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে, অচ্ পরে আছে এমন কিৎ, গিৎ বা ঙিৎ পরে থাকিলে, মৃজ্ ধাতুর বৃদ্ধি হয় বিকল্পে। তাহা হইলেই লট্এর ঝিতে) 'পরিমৃজন্তি', 'পরিমার্জন্তি'। 'পরিমমৃজতুঃ' 'পরিমমার্জতুঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ বিকল্পে সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইহার্থমেব তর্হি নিয়মার্থং বৃদ্ধিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। নিচিবৃদ্ধির-বিশেষেণোচ্যতে সেকো যথাস্যাদনিকোমাভূদিতি। কস্য পুনরনিকঃ প্রাপ্নোতি। অকারস্য। অচিকীর্ষীৎ। অজিহীর্ষীৎ। নৈতদস্তি। লোপোত্র বাধকো ভবিষ্যতি।

আকারস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। অয়াসীৎ। অবাসীৎ। নাস্ত্যত্র বিশেষঃ। সত্যাবসন্যাং বা।

সন্ধ্যক্ষরস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। নৈব সংধ্যক্ষরমন্ত্যমস্তি। ননু চেদমস্তি ঢ-লোপে কৃতে উদবোঢাম্। উদবোঢম্। উদবোঢেতি। অসিদ্ধো ঢলোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বান্নৈতদন্ত্যং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই স্থানের জন্য তবে সিজর্থে 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ, সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু ৮।২।১। (ইগন্তাঙ্গের বৃদ্ধি হয় পরস্মৈপদ পরে থাকিলে, লুঙ এর 'সিচ'এ) সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ, কাহার স্থানে বৃদ্ধি হয়, এরূপ কিছু উল্লেখ না করিয়া অবিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সেখানে যাহাতে 'ইক্' বিশিষ্টেরই বৃদ্ধি হয়, এবং 'ইক্' রহিত বর্ণের যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, এজন্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণ কর্তব্য।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ 'ইক্' রহিত বর্ণের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল?

অকারের। 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'সন' প্রত্যয় করিয়া 'লুঙ্' এর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'সন'এর অন্ত 'ন'কার ইৎ হইবার পর, অকারের বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং 'অচিকীর্ষীৎ,' 'অজিহীর্ষীৎ ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না?

ইহা হইতে পারে না। কারণ, এই স্থলে, 'অতোলোপঃ' ।৬।৪।৪৮। (আর্ধধাতুককালে যে 'অ'কারান্ত, সেই 'অ'কারের লোপ হয়, আর্ধ-ধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'সন্' প্রত্যয়ের 'অ'কার লোপ হইলে, লোপ বিধি সকলবিধি অপেক্ষা বলবান্ হয় বলিয়া, লোপ, বৃদ্ধির বাধক হইবে। তাহা হইলে প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

তবে আকারের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যেমন,—আকারান্ত যা' ধাতু এবং 'বা' ধাতুর উত্তর, 'লুঙ্'এর 'সিচ্' এ অকারের বৃদ্ধি হইয়া,'অয়াসীৎ' 'অবাসীৎ' প্রভৃতি স্থলে দোষ হইবে?

এই স্থলে কি দোষ হইবে? কারণ, এখানে 'বৃদ্ধি' হইলে, অথবা না হইলে, কোনও বিশেষ ত নাই। অর্থাৎ 'আ'কারের বৃদ্ধি করিলেও আবার 'আ'কারই হইবে। তবে সন্ধ্যক্ষরের (এ, ও, ঐ ঔ র) বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ, সন্ধ্যক্ষর কাহারও (কোনও ধাতুর) অন্ত নাই।

যদি বল যে, 'বহ্' ধাতুর 'হ'কার স্থানে 'ঢ'কার করিবার পর লুঙ্ 'তিপ্'-

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ

(রামকৃষ্ণ মিশন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

নিঃস্বার্থ হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। একটী কর্ম্মফল আবার অন্য কর্ম্ম উৎপাদন করিবে। এইরূপে কর্ম্মফল নিয়ত চলিতে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে কি মুক্তির সম্ভাবনা নাই? শাস্ত্র বলেন, আছে। নিষ্কাম হইয়া, নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম্ম কর; কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম কর। তাহা হইলে আর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হইবে না। বলিতে পার, বাসনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম কি করা যায়? কোন না কোন বাসনা হইতেই কর্ম্মের জন্ম। ভগবদ্দর্শন করিব, ইহাও একটী বাসনা। পরমহংসদেব বলিতেন, ভগবদ্দর্শনবাসনা বাসনার মধ্যে নহে। যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নহে। অর্থাৎ মিষ্টান্ন ভক্ষণের যে অপকারিতা, তাহা মিছরিতে নাই বলিলেই হয়। তবে কি কর্ম্ম করাই দোষ? কর্ম্ম কি তবে বন্ধনের উপর বন্ধন আনিয়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম জীবনোদ্দেশ্যের পথে নিয়ত বিঘ্ন বাধাই লইয়া আসে? শাস্ত্র বলেন, 'না', কর্ম্মে কোন দোষ নাই। তবে আমরা যে ভাবে কর্ম্ম করি, সেই ভাবানুযায়ী উহা গুণ ও দোষবিশিষ্ট হয়। কর্ম্মে স্বভাবতই যদি দোষ থাকিত, তবে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য নরহত্যা করিয়াও মানুষ বীরাগ্রণী বলিয়া পরিচিত হইত না। নিরাশ্রয় পথিকের প্রাণরক্ষা এবং অবলার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার জন্য দস্যু ও লম্পটকে হত্যা করিয়াও মানুষ আমাদের পূজনীয় হইত না। দরিদ্রদুঃখকাতর সহৃদয় পুরুষেরাও নিজ জনদিগের সুখে উপেক্ষা করিয়া সমাজে যশোভাগী হইতেন না। ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়া আপন ও অপর জীবনের চরম সার্থকতা শিখিবার ও শিখাইবার জন্য আত্মীয় সমাজ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিবর্গও আমাদের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিতেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, মানুষ খুন করারূপ কর্ম্মও যখন নিজ স্বার্থের জন্য কৃত না হইয়া কোন এক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হয়, তখন তাহাতে দোষ হয় না।

অতএব কর্ম্মে কোন দোষ নাই। আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্ম্ম ভাল

মন্দ হইয়া থাকে—কর্ম্মস্বরূপে কোন দোষ নাই। অগ্নিতে রন্ধন ও গৃহ-দাহাদি উভয় কার্য্যই হইতেছে, তাহাতে অগ্নির কোন দোষ নাই। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, সকল জলে পড়িতেছে, কিন্তু জলের নির্ম্মলতা অনুসারে প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হইযা থাকে, ইহাতে সূর্য্যের কোন দোষ নাই। তবে কিরূপে কর্ম্ম করিলে আর দোষভাগী হইতে হইবে না? শাস্ত্র বলেন, যদি স্বার্থ না থাকে এবং কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকে। কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকিলে সুখ বা দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হইলে মন বিচলিত হইবে না। সুতরাং তাহা আর বন্ধনের কারণ হইবে না।

দেখা গিয়াছে, বাসনা হইতেই কর্ম্মের জন্ম। নিজ নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করিলে মনে নানা বাসনা রহিয়াছে দেখা যায়। এমন কি, মনটীকেই বাসনাময়, নানা বাসনার সমষ্টি বলিয়াই বোধ হয়। সমুদয় বাসনা দূর হইলে মনের অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ উপস্থিত হয়। আবার বাসনার সকলগুলিই সমান তীব্র নয়। কোনটী 'এখনই সম্পন্ন হউক', মনে এইরূপ হয; কোনটী হইলে ভাল, না হইলেও ভাল—অপর একটী না হয় তো ভাল হয়। এই প্রকার মন ভিন্ন ভিন্ন বাসনাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত, দেখা যায়। বাসনাটী মনে উঠিলেই আবার কার্য্য হয় না। এক দিন, দুই দিন, দশ দিন উঠিতে উঠিতে একদিন মন বলে, এটী না হইলেই নয় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহকে উহা যাহাতে সফল হয়, তদ্বিষয়ে নিয়োগ করে। ইহাকেই আমরা কর্ম্ম বলিয়া থাকি। অতএব ঘনীভূত বাসনাই কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে সুখদুঃখরূপ ফল আনিয়া দেয এবং সেই সুখ দুঃখময় কর্ম্ম আবার অপর একটী সংস্কারের জনক হয়। মনে সঞ্চিত এই সূক্ষ্ম বাসনাই সংস্কার। সংস্কার সকলের সমান নহে। কাহারও কোনটী বাল্যকাল হইতে প্রবল। কাহারও কোন কোন সংস্কার আদৌ নাই। কেহবা সুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন সৎকার্য্যই করিয়া যাইল। আবার অন্য কেহ কুসংস্কার-চালিত হইয়া কুকার্য্যকরতঃ লোকের নিন্দাভাজন হইয়া গেল। কেহ বা বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, যশস্বী, কেহ বা তাহার ঠিক বিপরীত হইল।

কোথা হইতে সংস্কার এত ভিন্ন ভিন্ন হইল? বাল্যকাল হইতেই যখন কাহাকেও সৎ, কাহাকেও অসৎ দেখিতেছি, তখন বাসনা ঘনীভূত হইয়া সেই সৎ বা অসৎ সংস্কাররূপে পরিণত হইবারই বা সময় কোথায়? অথবা কর্ম্ম ও সংস্কার যদি বৃক্ষবীজসম্বন্ধেই গ্রথিত ও প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে সে

কর্ম্মই বা কোথায়, যাহা শৈশবেও সংস্কাররূপে দেখা দিতে পারে? শাস্ত্র বলেন, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই বাল্যসংস্কাররূপে দেখা দেয়। পূর্ব্ব জন্মের সৎ বা অসৎ অভ্যাস ইহজন্মের ভালমন্দ সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। এই বাল্যসংস্কারসমূহকে আমরা 'স্বভাব' বলিয়া থাকি এবং 'স্বভাব' কথার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া কখন ভগবানে, কখন সৃষ্টিকার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকি। কখন স্বভাবশব্দ কারণহীন অর্থে প্রয়োগ করি এবং কখনও বা কোন এক অদৃষ্ট অননুভূত কারণ, যাহার হস্তে মানুষ যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ অর্থে প্রয়োগ করি। এইরূপ কুসংস্কারভারবাহী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী বা কার্য্যকারণপ্রবাহের মূলোচ্ছেদ করিয়া নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করিয়া যথার্থ সত্য হইতে বহুদূরে অপনীত হই।

কর্ম্মবাদ সত্য হইলে পুনর্জ্জন্মবাদও তাহার সঙ্গে অবশ্য সত্যরূপে উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে আত্মা এক দেহ হইতে দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সেই জন্মের সমুদয় সংস্কার লইয়া তদুপযোগী দেহ গঠন করেন। সেই দেহে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল আবার পরিস্ফুট হয়। আমরা দেখিয়াছি, পিতা মাতার দোষগুণ সন্তানের দেহ ও মন আশ্রয় করে। তাহার কারণ, সন্তানের কার্য্যফল, যে পিতামাতা তাহাকে সেইরূপ দোষ বা গুণযুক্ত সংস্কারসমূহ পরিস্ফুট হইবার উপযোগী দেহ দিতে পারেন, সেই খানেই তাহাকে আকর্ষণ করে। শাস্ত্র বলিতেছেন, জোঁকে যেমন এক পাতা হইতে অন্য পাতা আশ্রয় করে, আমরা সেইরূপ এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর আশ্রয় করিয়া থাকি। অতএব কর্ম্ম এরূপে করিতে হইবে, যাহাতে ক্রমে নিম্নতর হইতে উচ্চতর কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারা যায়। যেমন অপর একটী অবলম্বন ত্যাগ না করিয়া পূর্ব্ব অবলম্বন ত্যাগ করা যায় না; সেইরূপ এক কর্ম্ম আশ্রয় না করিয়া অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না।

নীচ হইতে উচ্চ কর্ম্ম কিরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে? মহৎ হইতে মহত্তর উদ্দেশ্য অবলম্বন কর; দেখিবে, তোমার কর্ম্মও উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে প্রবাহিত হইতেছে। একেবারে সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিতেছ না বলিয়া হতাশ হইও না। ধীর কিন্তু দৃঢ়পদে, অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের প্রসাদ ও সাক্ষাৎকার লাভরূপ জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, সংসারে থাকিলে ধর্ম্ম

হয় না, ভগবান লাভ হয় না। সংসার কাহাকে বলে ? যে বস্তু আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না, তাহাই সংসার নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল সংস্কার আমাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, সর্ব্বদা সত্যোদ্দেশ্য হইতে বিচলিত করিতেছে, তাহাই আমার সংসার। এই-রূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংসার বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাহারো কাম, কাহারো ক্রোধ, কাহারও ধনচিন্তা ঈশ্বরপথের কণ্টক। এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংসার হইতে মনের গতি ফিরাইতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। করিলেই, যে কর্ম্মস্রোত নীচের দিকে যাইতেছিল, তাহার বেগ ফিরিয়া সে অন্য দিকে চালিত হইবে এবং যাহা পূর্ব্বে ঈশ্বরপথের প্রতি-বন্ধক ছিল, তাহাই আবার ঈশ্বরপথের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। এই সংসারে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। আমাদের সকলেরই ভিতর মহাশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা অজ্ঞানে আবৃত বলিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সেই শক্তির অপব্যয় না করিয়া উচ্চতর পথে চালিত করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। দেখা গিয়াছে, কর্ম্মে কোন দোষ নাই , দোষ কেবল যে উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কর্ম্ম করি। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম কর, কর্ম্মকে ভাল বাসিয়া কর্ম্ম কর, ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিও না। তাহা হইলে কর্ম্ম আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবেই যাইবে। ঈশ্বরের এই সৃষ্টিরচনা যদিও তাঁহার খেলা বটে, কিন্তু সেই খেলার ভিতর এই প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রূপেই তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

এইরূপে কর্ম্ম করিলে যথার্থ নিঃস্বার্থতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইলে আর কি সে কোন কর্ম্ম করিতে পারে বা করিয়া থাকে ? শাস্ত্র বলেন, সমুদ্রগম্ভীর, সুমেরুস্থির নিঃস্বার্থ পুরুষ কেবল জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম্ম করেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সাক্ষাৎ ভগবান জানিয়া তিনি সেই বিরাট পুরুষের সেবা করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কর্ম্মই আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ পিতা মাতার দ্বারা দেহ ধারণ করায়, তাহা হইলে অবতারাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের সহধর্ম্মিণীই পুনরায় তাঁহাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এই নিত্যসম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হয় ? ইহা কি সৃষ্টিপ্রণালীর একটী

বিশেষ নিয়ম? কার্য্যকারণময় কম্মপ্রবাহের বেগ জগতের সর্ব্বত্র ধাবিত রহিয়াছে, ইহার মধ্যে বিশেষ নিয়ম কিরূপেই বা সম্ভবে? আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ভগবান যখন মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেই অবতীর্ণ হন, তখন নিজের সম্বন্ধে একটী বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তনা করিলে তাঁহার শিক্ষারই বা সার্থকতা থাকে কোথায়? স্বল্পশক্তি ভিন্ননিয়মাধীন মানবই বা সে শিক্ষা লইতে পারিবে কিরূপে? আমাদের পিতামাতার স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ত নিত্যসম্বন্ধ বর্ত্ত-মান নাই। অবতারাদি সম্বন্ধে এরূপ হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর, অব-তারাদির সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা তাঁহার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ। আমরা স্বার্থের জন্য ভালবাসি। পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলেই আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসিয়া থাকি। স্ত্রীর সুখের জন্য যদি তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য হইত। কিন্তু আমরা কি তাহা করি? ভালবাসার স্বরূপ স্বাধীনতা—দাসত্ব নহে। নিঃস্বার্থতা, সুখলালসা নহে। যখনি কাহাকেও যথার্থ ভাল বাসিবে, তখনি তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। তাহার সুখ দেখিতে হইবে, নিজের সুখ দেখিলে চলিবে না। কিন্তু আমরা কি করিয়া থাকি? যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগকে আপনার অধীন করিতে যাই। আমার কথা শুনিবে, আমি যাহা ভাল বুঝি, তাহাকে তাহাই ভাল বুঝিতে হইবে। এইরূপে তাহাদিগকে ঘোরতর বন্ধনে বদ্ধ করিতে যাই। এই জন্যই আমাদের সম্বন্ধবন্ধন নিয়ত ছিন্ন হইতেছে এবং আমরা পরস্পর বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হইতেছি। বিদ্যুতাদি জড়শক্তিকে আয়ত্ত করিতে গেলেও যখন তাহার স্বভাব কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিয়া সেই উপায়ে অগ্রসর হইতে হয়, তখন অনন্ত স্বাধীনতাস্বভাব মনুষ্যমনকে কি তাহার স্বভাববিরুদ্ধ প্রণালীতে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারা যায়? কোনও না কোন দিন তাহার সেই বন্ধন অসহ্য হইয়া উঠিবে এবং স্বভাবনিহিত নিদ্রিত শক্তি জাগরিত হইয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।

আমাদের দেশে এইরূপ ভালবাসা এখন অত্যন্ত প্রবল। দাসত্ববন্ধনই ইহার অপর নাম। সেই জন্য দেশেরও এত দুরবস্থা। শাস্ত্র বলেন, সমগ্র জগৎ এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সেই জন্যই একের অপকারে অপরের অপকার হইতেছে। একের দোষে অপরে কষ্ট পাইতেছে। অন্যের অমঙ্গল হইলে আমাকেও তাহার জন্য কষ্ট পাইতে হয়। এরূপ নিয়ম